সংস্করণ
ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি
ভূমিকা : শাইখুল হাদীস সালিমুল্লাহ খান
ইসলামের ইতিহাস
নববী যুগ থেকে বর্তমান
অনুবাদ
কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
সম্পাদনা
শাইখ মীযান হারুন

ইসলামের ইতিহাস

নববী যুগ থেকে বর্তমান

ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

সূচি

উমাইয়া খিলাফত ১১৯

ইতিহাসশাস্ত্রের ইতিকথা

সকল বিষয়ে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য নিবেদিত। কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের পক্ষ হতে সালাত ও সালাম নিবেদিত হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি—যিনি আজীবন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন; তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবীদের প্রতিও সালাত ও বরকত নাযিল হোক মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে।

সংজ্ঞা

ইতিহাসকে আরবিতে বলা হয় تاريخ—'তারীখ'; 'তারীখ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ: সময়ের পরিচয়দান, সময়-সংক্রান্ত তথ্য প্রদান। আরবি প্রচলনে বলা হয়: أرخت الكتاب—অর্থাৎ আমি বইটি গ্রন্থনার সময়কালের বর্ণনা দিয়েছি।

ইমাম আসমায়ি ﷺ বলেন, বনু তামিমের লোকেরা বলে: ورخت الكتاب تاريخا; আর কায়েস গোত্রের লোকেরা বলে: أرخته تاريخا। এর দ্বারা এই শব্দটির মৌলিক আরবি হওয়া প্রমাণিত হয়।

পরিভাষায় এটি এমন একটি শাস্ত্র, যেখানে বিভিন্ন গোত্র, বংশ, ভূখণ্ড ও ব্যক্তিদের ঘটনাসমূহের বিবরণী ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। অন্য ভাষায় বলা যায়, এটি এমন একটি বিষয়, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলি দিনকাল নির্ধারণ করে বিবৃত হয়।

আলোচ্য বিষয়

সময়ের সাথে সাথে আবর্তিত মানবকেন্দ্রিক ঘটনাবলি।

উপকারিতাসমূহ

ইতিহাসের নানাবিধ ঘটনার প্রকার, বিস্তার ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

ইবনুল আসির বলেন,

> ইতিহাসের বহুবিদ ইহকালীন ও পরকালীন উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি। অন্যগুলো গবেষকগণ নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অনুধাবন করে নেবেন।

➦ ইহকালীন উপকারিতা হলো, ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষেরা পূর্ববর্তী লোকদের স্মৃতিচারণ করে থাকেন। ইতিহাসের উপকারী বিষয়সমূহ গ্রহণ করে ক্ষতিকর দিকসমূহ থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করেন। পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনাবলি হতে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করতে পারেন ভালো-মন্দের অভিজ্ঞতার ঝুলি। ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। এর মাধ্যমে মাতিয়ে রাখা যায় বিভিন্ন বৈঠক ও সমাবেশ।

➦ পরকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যখন পার্থিব ঘটনাবলি ও এর অধিবাসীদের উত্থান-পতনের ইতিহাস অনুধাবন করবে, দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য তার মনে ছাপ ফেলতে পারবে না। ধীরে ধীরে সে দুনিয়াবিমুখ হয়ে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে প্রবৃত্ত হবে। ইতিহাসের এ-উপকারী দিকটির বিবেচনা করেই কুরআনে কারীমে বিভিন্ন ঘটনাবলির আলোচনা করা হয়েছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

> এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।

ঐতিহাসিক হামাবি বলেন,

> ইসলামের ইতিহাস বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে অনন্য হওয়ার পাশাপাশি এতে আরও রয়েছ উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রণিধানযোগ্য আলেমগণের আলোচনা। তাদের জ্ঞান-চর্চা, উপদেশাবলি ও গুণাবলির আলোচনা। এতে রয়েছ তাদের জীবনী, যা তাদের অনুসরণকারীদের জন্য পাথেয় হতে পারে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। আর সকল কাজের ফলাফল নির্ধারিত হয় নিয়তের ভিত্তিতে।

ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ-কামনায় পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনাবলি ও যুগ বিবর্তনের ইতিহাস থেকে উপদেশ গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ
فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

> আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলেছি, যদ্দ্বারা তোমার অন্তরকে করেছি মজবুত। আর এভাবেই তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।

ইতিহাস শিক্ষার বিধান

এককথায় এর কোনো বিধান দেওয়া যায় না। ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়সাপেক্ষে এর বিধানে ভিন্নতা আসবে। যেমন, তন্মধ্যে কিছু আছে, যার শিক্ষালাভ করা ওয়াজিব; যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত। আবার কিছু আছে, যার শিক্ষা লাভ করা হারাম; যেমন, বানানো গল্প-গুজব, ইসরাইলি রেওয়ায়েতে মজে থাকা, বিভিন্ন রাজা-বাদশা ও পাপাচারী ব্যক্তিদের অপছন্দনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাবলিতে ডুবে থাকা। আবার কিছু আছে, যা শিক্ষা লাভ করা মাকরুহ; যেমন কোনো সাধারণ বিষয়াবলি, যার উল্লেখ করা বা লেখালেখি করার চেয়ে তা এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম; উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ঘটে-যাওয়া বিরোধ ও যুদ্ধসমূহের অতিরিক্ত আলোচনা; হযরত আলি ইবনে আবি তালিব -এর সঙ্গে মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফইয়ান ও আয়েশা -এর মতবিরোধের আলোচনা ইত্যাদি।

তন্মধ্যে আবার কিছু আছে, যা শিক্ষা লাভ করা বৈধ; যে-সবে ইহকালীন ও পরকালীন কোনো উপকারিতা নেই; যেমন বিভিন্ন কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের ইতিহাস, বিভিন্ন রাজা-বাদশা-মন্ত্রী ও রাজন্যবর্গের এমন ঘটনাবলি, যে-সবে কোনো শিক্ষা নেই। ইমাম গাযালি তার বিখ্যাত ইহইয়াউল উলুম গ্রন্থে এ-ধরনের আলোচনা [illegible]

আল্লামা ইয আল কিনানি হাম্বলি ইতিহাসশিক্ষাকে এককথায় ফরযে কিফায়া বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

> নিশ্চয়ই ইতিহাসশাস্ত্রের মর্যাদা অনস্বীকার্য। ধর্মীয় ব্যাপারেও এর অবদান অপরিসীম। শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধানও এর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, ধর্মবিশ্বাস ও ইবাদত-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি-বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে সংগৃহীত। আমাদের মাঝে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বর্ণনাকারীগণের অবস্থার ওপর তার সত্যতা নির্ভরশীল। তাই সকল ইমামের মতে, তাদের অবস্থা জানাশোনা ও তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া অত্যাবশ্যক। আর ইতিহাসশাস্ত্র চর্চা ব্যতীত এর অর্জন সম্ভব নয়। আর এ-কারণেই ইতিহাসবিদ্যার অর্জন ফরযে কিফায়া।

প্রকারভেদ

- নবীগণের জীবনী।
- সীরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
- সাহাবীগণের ইতিহাস।
- রাষ্ট্রনেতা, সম্রাট ও মন্ত্রীগণের ইতিহাস।
- বিখ্যাত লেখকগণের ইতিহাস।
- কবি-সাহিত্যিকগণের ইতিহাস।
- মুহাদ্দিস, কারী ও ফকিহগণের ইতিহাস।
- রিজালশাস্ত্রের ইমামগণের ইতিহাস।
- মুফাসসিরগণের ইতিহাস।
- ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস।
- আরবি ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও প্রসিদ্ধ বক্তাগণের ইতিহাস।
- সাধু, সুফি-দরবেশ, বিচারক-গভর্নর ও বিজ্ঞজনদের ইতিহাস।
- ওয়ায়েজ-গল্পকার, মিউজিশিয়ান ও শিল্পীগণের ইতিহাস।

- দানবীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ইতিহাস।
- মেধাবী, বুদ্ধিমান, কৃপণ, বোকা, চিকিৎসক, দার্শনিক ও স্থাপত্যশিল্পীদের ইতিহাস।
- এমনিভাবে জাহমিয়া, মুতাযিলা, আশআরি, কাররামিয়া, মুজাসসিমা, শিয়া, খারিজি ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইতিহাস।
- পেটুক, বোবা, বধির ও নারীগণের ইতিহাস।
- পদার্থবিজ্ঞানীদের ইতিহাস।
- সাহসী, বীরপুরুষ, ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের ইতিহাস।
- চমৎকার ভ্রমণবৃত্তান্ত।
- খেলাধুলা ও বিভিন্ন পেশাজীবিগণের গল্প।
- রাজনীতিবিদ, গণক ও জ্যোতির্বিদদের ইতিহাস।
- ইসলামি বিশ্বের ইতিহাস।
- সংখ্যালঘু মুসলমান-অঞ্চলসমূহের ইতিহাস।
- বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা ও দলসমূহের ইতিহাস।
- বিভিন্ন পত্রিকা, প্রকাশনা ও মিডিয়ার ইতিবৃত্ত।
- প্রাচ্য ও প্রাচ্যবিদগণের ইতিহাস।

ইতিহাসবিদ্যার মর্যাদা ও গুরুত্ব

হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে ইতিহাসশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ইলমে রিজালের গুরুত্বের বিবেচনায় ইমাম আলি ইবনে মাদিনি তার মূল্যবান উক্তিতে বলেন, হাদীসের অর্থসংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা ইলমের অর্ধেক আর তার বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা বাকি অর্ধেক।

আল্লামা সুলাইমান নদভি বলেন,

> পৃথিবীর সকল ইলম ও সকল ঘটনার জন্যই তার বর্ণনা ও ইতিহাসের হেফাজত প্রয়োজন। কেননা সকল মানুষের জন্য প্রতিটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত

> হওয়া সম্ভব নয়। আর অনুপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য ইতিহাসশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তা জানা সম্ভব নয়।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মাসউদি তার ইতিহাসগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন,

> এই শাস্ত্রের মাধ্যমে জ্ঞানী মূর্খ নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হয়। সবাই এর স্বাদ উপলব্ধি করে। দুর্লভ ঘটনাসমূহ এর সাহায্যেই জানা যায়। আশ্চর্যজনক বিষয়াদির সংবাদও এর মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এখানে পাওয়া যায় উন্নত চরিত্র ও আখলাক সম্পর্কিত বিষয়সমূহ। রাষ্ট্রপরিচালনার বিধি-বিধান ও রাজন্যবর্গের ইতিহাসও এই শাস্ত্র থেকেই সংগৃহীত হয়। এই শাস্ত্রের মাধ্যমে গ্রাম-শহর, নিকট-দূরসহ অতীত-বর্তমানের তথ্যাবলি আমাদের সামনে চলে আসে। এর ওপর নির্ভরশীল থাকে শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান। ইতিহাসের জ্ঞানের মাধ্যমে বৈঠক ও সমাবেশসমূহকে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়।

ইমাম আবুল ফারাজ ইস্পাহানি তার *আগানি* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন,

> ইতিহাসের পাঠক তার প্রতিটি অনুচ্ছেদে বিপুল তথ্য-উপাত্ত পেয়ে থাকেন। আনন্দ নিতে থাকেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ও বিভিন্ন হাস্যরসের। অনুধাবন করতে থাকেন বিভিন্ন ঘটনার বাস্তবতা। জানতে পারেন বিভিন্নজনের জীবনী ও কবিতা। বিশেষত জ্ঞানলাভ করা যায় আরবদের প্রসিদ্ধ ইতিহাসসমূহ ও ঘটনাবলি। অন্ধকার-যুগের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের ইতিহাস, ইসলামি খলিফাগণের বৃত্তান্ত। জীবনাদর্শের গঠনে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ঘটনাবলির মোকাবেলায় ইতিহাসলব্ধ শিক্ষাসমূহ থেকে উপকৃত হওয়া যায়; যেমন আমরা বর্তমান যুগে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুদের চক্রান্তের মোকাবেলায় ইসলামের প্রাচীন যুগের সফল শাসকদের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

হযরত সুফিয়ান সাওরি ﷺ বলেন,

> যখন হাদীস বর্ণনাকারীগণ মিথ্যার আশ্রয় নিতে শুরু করেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে ইতিহাস ব্যবহার করতে শুরু করি।

ইমাম নববী ﷺ তার *তাবাকাতুল ফুকাহা* গ্রন্থের ভূমিকায় ইবনুস সালাহর কিতাব থেকে উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেন,

> নিশ্চয়ই মনীষীগণের জীবনবৃত্তান্ত-জ্ঞান অর্জন করা মর্যাদা ও সৌন্দর্যের বিষয়, আর এ-সম্পর্কে অজ্ঞতা লজ্জা ও দোষের কারণ।

খাযরাজি ﷺ তার *তারিখুল ইয়ামান* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন,

> ইতিহাসশাস্ত্রের প্রতি মানুষের অবহেলা আমাকে এ-সংকলন প্রস্তুতে উদ্বুদ্ধ করেছে; অথচ মানুষের জীবনে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বহু ক্ষেত্রে আমরা এর ওপর নির্ভরশীল। কেননা, এতে রয়েছে বিভিন্ন উপদেশাবলি, শিষ্টাচারের শিক্ষা; রয়েছে বংশপরম্পরার তথ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ইতিহাস। এ-কারণেই বলা হয়, যদি ইতিহাসবিদ্যার প্রচলন না-থাকতো, তা হলে পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তীদের কোনো সংবাদ জানতে পারতো না। মর্যাদাবানদের ব্যাপারে জানা যেতো না। খ্যাতিমানদের চেনা যেতো না। কবি কতইনা চমৎকার বলেছেন, যে-ব্যক্তি পূর্ববর্তীদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, সে যেন সুপ্রাচীনকাল থেকেই বেঁচে আছে। আর যে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রশংসনীয় কিছু রেখে যায়, সে যেন পৃথিবীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুখানুভূতি লাভ করে। জ্ঞানীমাত্রই সম্মান ও মর্যাদার সাথে প্রতিটি যুগেই জীবন্ত। তাই দীর্ঘজীবী হওয়ার সৌভাগ্য হাতছাড়া কোরো না।

ইতিহাসশাস্ত্রের নীতিমালা

আল্লামা সাখাবি ﷺ আবু মাশার হতে বর্ণনা করেন,

> ইতিহাস বহুলাংশেই সংযোজিত থাকে। প্রজন্ম ধরে একে অপরের থেকে বর্ণনা ও বিভিন্ন যুগের ঘটনাবলির দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এতে সহজেই ভ্রান্তি প্রবেশ করতে পারে। কেননা বর্ণনাকারীগণ যখন কোনো গ্রন্থ বা কারও আলোচনা থেকে উদ্ধৃতি দেন, তাতে সচরাচর অর্থগত ভুল হয়ে যায়; যেমন হযরত আদম ও নূহ আলাইহিমাস সালামসহ প্রাচীন ইতিহাসসমূহে বিভিন্ন বিকৃতি বা বেশ-কম পরিলক্ষিত হয়। ইহুদিরা এ-সব ব্যাপারে বহু মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিলো।

আবু মাশারের এ-বক্তব্যের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

> 'তোমরা আদনানের পর অতিক্রম কোরো না, বংশপরম্পরা বর্ণনাকারীরা তাতে বিভিন্ন মিথ্যা যুক্ত করেছে।'

ইবনে খালদুন বলেন,

> নিশ্চয়ই ইতিহাসশাস্ত্রের গুরুত্ব ও উপকারিতা অপরিসীম। এর মাধ্যমে আমরা অতীত কালের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে অবগত হতে পারি; নবী-রাসূল ও রাজা-বাদশাগণের জীবনী, ইতিহাস ও তাদের রাজনীতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারি।

তবে ইহকালীন ও পরকালীন বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অনুসরণ করে আমাদের উপকৃত হতে হলে নিঃসন্দেহে তা বিশুদ্ধ সূত্র ও সঠিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা আবশ্যক। এর পাশাপাশি প্রয়োজন সঠিক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা, যা দ্বারা সঠিক তথ্য উপলব্ধি করে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা যায়। কেননা, কোনো ঘটনায় যদি মানুষের অভিরুচি, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিবেচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ না-করে শুধু বর্ণনাকারীদের ওপর নির্ভর করা হয়, তা হলে এতে পদস্খলন হওয়া স্বাভাবিক—শিকার হতে হয় বিভিন্ন ধরনের ভুল-ত্রুটি ও সততার মাপকাঠি থেকে বিচ্যুতির।

ইতিহাসবিশারদগণ, মুফাসসিরিনে কিরাম ও বিভিন্ন বর্ণনাকারীগণ সচরাচর ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এ-ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্মুখীন হন—যারা তথ্যের সত্যতা-নিরূপণের মানদণ্ডের ওপর নির্ভর না-করে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সব কিছুই বর্ণনা করেন; বর্ণিত ঘটনাবলির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনা করে সত্যতার পরীক্ষা করেননি; সাহায্য নেননি প্রকৃতি আদর্শ ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে ঘটনার অনুধাবনের; তাই তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং ভ্রান্তির মরীচিকায় পথভ্রষ্ট হয়েছেন। বিশেষত ইতিহাস-বিবরণীতে সম্পদের হিসাব-নিকাশ ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা নিরূপণে প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের ভুল-ভ্রান্তির শিকার হতে হয়েছে।

আলী তানতাবি বলেন,

> নিশ্চয় ঐতিহাসিকগণের বর্ণনাসমূহ জনসাধারণের বক্তব্য আর মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য পরীক্ষিত মন্তব্য। এ-কারণেই আমাদের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উৎস মুহাদ্দিসিনে কেরামের বক্তব্যসমূহ। যারা

মুহাদ্দিসিনে কেরামের পরিভাষা ও তাদের ইলম সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ঐতিহাসিক বলে গণ্য করা যায় না।

ইতিহাসগুলোকে ইতিহাসশাস্ত্রের প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে এ-সবই ইতিহাস নয়। কেননা, আমাদের ইতিহাস যাচাই-বাছাই করে লেখা হয় না। সঠিক উৎস থেকে সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাই করে সুবিন্যস্তভাবে ইতিহাস সংকলন করতে হয়। আর তখনই এটি ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করবে। অন্যথায় এটি তো ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার সমাহারই থেকে যাবে।

এখান থেকেই আমরা স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারি, কোনো ইতিহাসের গবেষকের জন্য তার লেখার সত্যতা প্রমাণে ইতিহাসের কোনো উৎসগ্রন্থের পৃষ্ঠা-নাম্বার উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়; যেমন নিজ লেখার টীকায় *তারিখে তাবারির* পৃষ্ঠা-নাম্বার দিয়ে দেওয়া—এটি অন্ধকারের কাষ্ঠসংগ্রাহকের নামান্তর; সে জানে না, ইতিহাসের উৎসগ্রন্থসমূহ থেকে কতটুকু গ্রহণ করা যাবে আর কতটুকু বাদ দিতে হবে।

আমাদের আলেমগণ এ-ধরনের ব্যক্তিকে অন্ধ গবেষক বলেন—যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে শুধু তথ্য সন্নিবেশ করতে পারে; সে কখনোই ইসলামি ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের অধ্যাপক হতে পারে না। কেননা, এ-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে, বর্ণনাকারীগণের অবস্থা ও যাচাই-বাচাইয়ের সক্ষমতার পাশাপাশি হাদীসের পরিপূর্ণ তথ্য-জ্ঞান ও মুহাদ্দিসিনে কেরামের পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে হবে; আরবিভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে, যেন তাদের বর্ণনাসমূহের বাহ্যিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা যায়—অনুধাবন করা যায় ইঙ্গিতমূলক বাক্যসমূহের মর্মার্থ; এর জন্য অবশ্যই প্রান্তিকতা ও মনস্কামনার অনুসরণমুক্ত হতে হবে; গবেষণাকর্মটি একমাত্র সত্যানুসন্ধান ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় নিয়োজিত থাকতে হবে।

যার মধ্যে এ-সব গুনাবলি অনুপস্থিত থাকবে, সে যত বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই দায়িত্বরত থাকুক বা যত বড় সার্টিফিকেটের অধিকারীই হোক, ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ ও মিথ্যুক হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, রাষ্ট্র কোনো মানুষকে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষক পদে নিয়োগ দিতে পারে বা তাকে ডক্টরেট

> ডিগ্রিতে ভূষিত করতে পারে, সার্টিফিকেট মিথ্যা হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্র কোনো জাহেল বা মূর্খ ব্যক্তিকে জ্ঞানীর অভিধা দিতে পারে না; প্রান্তিকতার শিকার কোনো ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ বা কোনো মিথ্যুককে সত্যবাদীর মর্যাদা দিতে পারে না।

ইতিহাসবিশারদগণ কখনো কাউকে মর্যাদাবান হিসেবে চিত্রায়িত করেন, আবার কাউকে হীনভাবে উপস্থাপন করেন। কখনো তা প্রান্তিকতা ও মূর্খতার শিকার হয়ে করা হয়। কখনো বা অনির্ভরযোগ্য মতামতের অনুসরণ এর জন্য দায়ী। এ-ছাড়া আরও বিভিন্ন কারণও এর জন্য দায়ী হতে পারে। কেননা তারা বহুলাংশেই সাধারণ লেখকগণের মতো একজন লেখকের ভূমিকা পালন করেন। সত্য-মিথ্যা সব তথ্যই যাচাই-বাচাইবিহীন সন্নিবেশ করতে থাকেন। ফলে যাচাই-বাছাইয়ের কারিগর তথা জারহ-তা'দীলের আলেমগণের চাইতে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মূর্খতার প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাসবিশারদগণকে খুব কমই প্রান্তিকতামুক্ত দেখা যায়। তাই ইতিহাসবিদগণের কাছ থেকে কারও প্রশংসা বা দুর্নাম গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলি বিবেচনা করে নেওয়া জরুরি:

প্রথমত, বর্ণনা ও রেওয়ায়াত সংক্রান্ত শর্ত। যেমন, বর্ণনায় সত্যবাদিতা। মূল উৎস থেকে ভাবার্থে উদ্ধৃতির পরিবর্তে শাব্দিক উদ্ধৃতি। বর্ণনাকারী যে-বৈঠকে ঘটনার বিবরণ শুনেছিলেন, সেখানেই তা লিপিবদ্ধ করা। যার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। বর্ণিত ঘটনাসংক্রান্ত ব্যাপারে উম্মাহর গ্রহণযোগ্য আলেমগণের বিশ্লেষণসমূহ অবগত থাকা। যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণিত, তাদের ব্যাপারে সাধারণ সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ-কারণেই বলা হয়, বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনার বিপরীতে যে-কারও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায়-প্রাপ্ত মনীষীদের নামের ক্ষেত্রে আলোচিত ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, চিন্তাভাবনা ও ইলমি অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগতি থাকতে হবে। তাদের ব্যাপারে ব্যবহৃত উপাধি, শব্দাবলি, প্রশংসা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। তাদের ব্যাপারে ব্যবহৃত শব্দসমূহের

মর্ম অনুধাবন করা জরুরি। তাদের অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইনসাফের আচরণ করা সমীচীন। কারও প্রশংসা বা সমালোচনার ক্ষেত্রে অতি আবেগী বা বিদ্বেষী অবস্থান পরিত্যাগ করতে হবে। ইতিহাস বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি স্বীকৃত হতে হবে।

তৃতীয়ত, ইতিহাসের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়—লেখায় দৃঢ় বাক্য ব্যবহার করা, শব্দের মর্মার্থ অনুধাবনের সক্ষমতা, যথোপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা, সুন্দর বর্ণনাভঙ্গির ব্যবহার।

চতুর্থত, ইতিহাসের কোনো তথ্য যদি কোনোভাবে কুরআনে কারীম বা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তা হলে অবশ্যই ঐতিহাসিক বক্তব্যকে বাদ দিয়ে কুরআনে কারীম ও সুন্নাহকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা কুরআনে কারীম ও হাদীস সংরক্ষণে যতটা কঠোরতা, গবেষণা ও সূক্ষ্মতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এই ব্যাপারটি বিবেচনায় না-রাখায় বহু মানুষ ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ

ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম:

- ইবনে কুতাইবা প্রণীত *কিতাবুল মাআরিফ;*
- আহমাদ বিন আবু ইয়াকুব ইয়াকুবী প্রণীত *তারিখে ইয়াকুবি;*
- ইবনে জারির তাবারি প্রণীত *তারিখে তাবারি*
- আবুল হাসান মাসউদি প্রণীত *মুরাওয়াজুয যাহাব ও মাআদিনুল জাওহার*
- ইবনুল জাওযি প্রণীত *আল মুনতাযাম ফি তারিখিল উমাম*
- ইমাম যাহাবি প্রণীত *তারিখুল ইসলাম*
- ইমাম ইবনে কাসির প্রণীত *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*

- ইবনে খালদুন প্রণীত *তারিখুল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফি আইয়ামিল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বার্বার।*

আবার বিষয়ভিত্তিক কিছু ইতিহাসগ্রন্থও বেশ পরিচিত। যথা:

- ওয়াকেদি প্রণীত *কিতাবুল মাগাযি*
- ইবনে হিশাম প্রণীত *আস- সীরাতুন নববিয়্যাহ*
- ইবনে সাইয়্যেদিন নাস প্রণীত *উয়ুনুল আসর*
- সালেহি প্রণীত *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*
- ইবনে হাজার রচিত *আল ইসাবাহ*
- ইবনুল আসির প্রণীত *উসদুল গাবাহ*
- ওয়াকেদি প্রণীত *ফুতুহুশ শাম*
- বালাজুরি রচিত *ফুতুহুল বুলদান*
- মুহাম্মদ আলবাহা রচিত *আল-ফিকরুল ইসলামি আল হাদীস ওসিলাতুহু বিল ইসতিমারিল গারবি*
- হাবানাকা আল মায়দানি রচিত *আজনিহাতুল মাকরিস সালাসা*
- প্রফেসর মুহাম্মদ শাকির প্রণীত *সুককানুল আলমিল ইসলামি*
- আবদুর রহমান যাকি রচিত *আল-মুসলিমুন ফিল আলামিল ইয়াওম*
- হামাবি প্রণীত *মুজামুল বুলদান*
- খতীব প্রণীত *তারিখে বাগদাদ*
- যিরকলী প্রণীত *আল-আলাম*
- আবদুল হাই লখনভী রচিত *নুজহাতুল খাওয়াতির*
- আবুল হাসান আলী নদভী প্রণীত *মা যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমিন* ও *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ ফিল ইসলাম*
- ইমাম যাহাবি প্রণীত *সিয়ারু আলামিন নুবালা*
- ইমাম মিযযী প্রণীত *তাহযিবুল কামাল।*

এ-সংক্রান্ত আরও অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে।

ইসলামপূর্ব বর্ষ-গণনার ইতিহাস

ইমাম ইবনুল জাওযি আমের শাবি সূত্রে বর্ণনা করেন,

> আদম ﷺ-পরবর্তী যুগে যখন তার বংশধরেরা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, তারা প্রথম আদম ﷺ-এর অবতরণ-লগ্ন থেকে বছর-গণনা শুরু করে। এরপর নূহ ﷺ-এর প্লাবনের ঘটনা থেকে দিন-গণনা করা হয়। অতঃপর সাল-গণনা করা হয় হযরত ইবরাহিম ﷺ-এর অগ্নিকাণ্ড হতে। পরে ইউসুফ ﷺ-এর যুগ থেকে তারিখ-গণনা করা হয়। তারপর মিশরের বনি ইসরাইলে মূসা আলাইহিস সালাম-এর আবির্ভাব থেকে বর্ষপঞ্জির প্রচলন হয়। এরপর হযরত দাউদ ﷺ-এর হতে, এরপর হযরত সুলাইমান ﷺ হতে দিন-গণনার প্রচলন হয়। এরপর তা শুরু হয় ঈসা ﷺ-এর যুগ থেকে। মুহাম্মদ বিন ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস সূত্রে এ-বর্ণনা করেছেন।

এতে আবার ভিন্ন ভিন্ন মতামতও দেখা যায়; যেমন আরবরা তাদের স্থানীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমেও তারিখের প্রবর্তন করতো; যেমন বাসুস, দাহিস ও যিকার যুদ্ধের মতো ঘটনাবলির মাধ্যমে তাদের দিন-গণনার রীতি ছিলো।

মুহাম্মদ বিন সালেহ ও ইমাম শাবি বলেন,

> বনি ইসরাইলের লোকেরা ইবরাহিম ﷺ-এর অগ্নিকাণ্ড থেকে বছর-গণনা করতো। অতঃপর তারা ইবরাহিম ও ইসমাঈল ﷺ-এর বাইতুল্লাহ নির্মাণের সময় থেকে বছর-গণনা শুরু করেন। এরপর তারা বায়তুল্লাহর ওপর হস্তিবাহিনীর আক্রমণের সময় থেকে তারিখ-গণনা করতে থাকে। সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের সময় থেকে তারিখ-গণনার প্রচলন হয়। আর মুহাররম মাসকে হিজরি মাসের প্রথম হিসেবে ধার্য করা হয়।

হিজরি তারিখ-গণনার ইতিহাস

সকল জাতি ও ধর্মেরই ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ, উৎসব ও রীতি-নীতি রয়েছে; যেমন বিশেষ স্থানের সম্মান প্রদর্শন, ইবাদত হিসেবে বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ, আনন্দ-উৎসবের উপলক্ষ হিসেবে বিভিন্ন দিনের নির্ধারণ—এমনিভাবে ইহুদি, হিন্দু, খ্রিস্টান, রোমান ও ইরানিসহ পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ও গোষ্ঠীর রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দিন-তারিখ গণনাপদ্ধতি ও বর্ষপঞ্জি।

নীতি ও আদর্শের বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহ অন্য সকল জাতির চেয়ে উন্নত; তাদের রয়েছে উন্নত ঐতিহ্য, চরিত্র ও ইতিহাস। সর্বশেষ জাতি হিসেবে তাদের জন্য সঠিক পৃথকতা নিতান্তই স্বাভাবিক। আর এ-জন্যই হিজরি বর্ষপঞ্জি তাদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অংশ। নিজেদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ রক্ষায় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এ-বর্ষপঞ্জির অনুসরণ আবশ্যক।

ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাই ইসলামি বর্ষপঞ্জি গণনার উপলক্ষ হওয়ার যোগ্যতা রাখে; যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করার দিন, ওহি অবতীর্ণ হওয়ার দিন, বদর যুদ্ধ বা এ-জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনো দিন। কিন্তু এ-সব ঘটনার তুলনায় হিজরতের ঘটনা এক অন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বরিত। কেননা, উম্মাহর বিজয়-ইতিহাসে এটি ছিলো এক অনন্য ক্ষণ, যার মাধ্যমে এই উম্মাহ সাফল্য ও উচ্চতার এক উচ্চতর শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলো।

মক্কা মুকাররমায় মুসলমানরা অত্যন্ত অসহায় জীবন যাপন করছিলো। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কোনো ধরনের স্বাধীনতা ছিলো না। সব ধরনের শক্তি ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের হাতে কুক্ষিগত। দুর্ভাগ্যবশত এ-সব শত্রুরা ছিলো মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষভাবাপন্ন।

আর ইসলামের মাদানি যুগ ছিলো তাদের উৎকর্ষ ও উন্নতির প্রথম সোপান। যেখান থেকে মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি শুরু হয়। 'সংখ্যালঘু' তকমা ঘুচে যায়—এখানেই মুসলমানগণ নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়; নিজেরাই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শত্রুদের বিরুদ্ধে একের পর এক বিজয়গাথা রচনা করতে থাকে। স্বভাবতই বলা যায়, মুসলিম উম্মাহ মদীনা মুনাওয়ারায় নতুন জীবন লাভ করে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে থাকে। এ-কারণেই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। আর

এ-সনের বিবেচনাতেই ইসলামি বর্ষপঞ্জির দিন-গণনা হিজরতের দিনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়।

তবুও আছে, যখন বর্ষপঞ্জির শুরু নিয়ে মতবিরোধ হয়, কেউ একজন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হিজরত-পরবর্তী কুবা এলাকার অবস্থান থেকে হিজরি বর্ষ-গণনার আদেশ দিয়েছেন।

ইমাম হাকিম ইকলিল গ্রন্থে যুহরি সূত্রে বর্ণনা করেন,

> রাসূলুল্লাহ যখন মদিনায় আগমন করেন, তিনি বর্ষপঞ্জি গণনার নির্দেশ প্রদান করেন, এই রবিউল আউয়াল থেকেই বছর-গণনা শুরু করা হয়।

শাইখ হুসাইন দিয়ার বকরি বলেন,

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ষপঞ্জি গণনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই হিজরতের বছরের রবিউল আউয়াল মাস থেকে তা গণনা করা শুরু হয়। ইমামুল দিন সুহাইলি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত থেকে ইসলামের তারিখ-গণনা শুরু হয়।

ফাতহুল বারি গ্রন্থে ইমাম যুহরি আবু তাহের জিয়াদি সূত্রে বর্ণনা করেন,

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত থেকে বর্ষ-গণনা শুরু করেন। তিনি যখন নাজরানের খ্রিস্টানদের কাছে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন, সেখানে হিজরি তারিখ উল্লেখ করেছিলেন। তিনি হযরত আলিকে লিখতে বলেন, এ-পত্র হিজরতের পঞ্চম বর্ষে লেখা হয়েছে।

অনেক কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায়, হিজরতের ঘটনাকে ইসলামি বর্ষপঞ্জির প্রারম্ভিক হিসেবে গণনা করার প্রস্তাব ও সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেন আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুক রা.। এটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মত। এর পক্ষে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম শাবি বলেন,

> হযরত আবু মুসা আশআরি রা. হযরত উমর রা.-এর কাছে পত্র লিখেন, আপনার কাছ থেকে আমাদের কাছে বিভিন্ন নির্দেশনা-সম্বলিত বার্তা আসে, যাতে কোনো তারিখের উল্লেখ থাকে না। হযরত উমর বৈঠক ডাকেন। উপস্থিতদের কাছে এ-ব্যাপারে মতামত চাইলে কেউ কেউ মতামত দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতপ্রাপ্তির দিন থেকে

> তারিখ-গণনা করা হোক; আবার কেউ বলেন, হিজরতের ঘটনা থেকে তারিখ-গণনা করা হোক। এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে হযরত উমর ﵁ বলেন, হিজরতের ঘটনা যেহেতু হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছে, তাই তোমরা তা থেকেই তারিখ-গণনা করো আর মুহাররমকেই প্রথম মাস রাখো; কেননা এতেই মানুষেরা ঘর থেকে ফিরে আসে। আর এটি হিজরি ১৭ সালের ঘটনা। সেদিন থেকেই তারিখ-গণনা আরম্ভ হয়।

হযরত ইবনে আবি খাইসামাহ ইবনে সিরিন সূত্রে বর্ণনা করেন,

> এক ব্যক্তি ইয়ামান হতে আগমন করেন। তিনি বলেন, আমি সেখানকার লোকদের তারিখ-গণনা করার প্রথা দেখেছি। বিভিন্ন ঘটনার বিবরণে তারা বলে, এটি অমুক বছরের অমুক তারিখে সংঘটিত হয়েছে। হযরত উমর ﵁ এটি অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং তিনি হিজরি বর্ষপঞ্জির প্রচলন করেন। ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসি ও ইমাম সাখাবিও এ-ঘটনার আলোচনা করেছেন।

মায়মুন বিন মিহরান হতে বর্ণিত,

> একদা হযরত উমরের সামনে একটি চেক উপস্থাপন করা হলো, যা পরিশোধের সময় লেখা ছিলো শাবান মাস। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কি গত বছরের শাবান নাকি এ-বছরের না আগামী বছরের? তোমরা মানুষের জন্য এমন কিছু নির্ধারণ করে দাও, যার দ্বারা তারা বর্ষ-গণনা করতে পারে। কেউ কেউ পরামর্শ দিলো, রোমানদের বর্ষপঞ্জির অনুসরণ করা হোক; আবার কেউ বলেন, না, সেটি অত্যন্ত দীর্ঘ হবে—কেননা, তারা যুলকারনাইনের যুগ থেকে বর্ষ-গণনা করে; কেউ পরামর্শ দিলো, পারসিকদের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া হোক। অতঃপর হযরত উমর ﵁ হরমুজানকে ডেকে পাঠান। তিনি তার সাথে এ-ব্যাপারে দীর্ঘ আলেচনা করেন, হরমুজানও তাকে ইরানিদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।
>
> অতঃপর উমর ﵁-সহ কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তি থেকে বর্ষ-গণনা শুরু করতে বলেন। হযরত উমর ﵁ প্রথমে এ-ব্যাপারে মতপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে তা থেকে ফিরে আসেন। আবার কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল থেকে বর্ষ-গণনা করা হোক। হযরত আলী ﵁

> প্রস্তাব করেন, শিরকভূমি মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা অভিমুখে হিজরত থেকে হিজরিবর্ষ গণনা করা হোক। হযরত আলী ﵁-এর এই প্রস্তাবনার সাথে সবাই একমত পোষণ করেন। এভাবেই হিজরতের ঘটনা ইসলামি বর্ষপঞ্জির শুরু হিসেবে স্বীকৃত হয়।

সুহাইলি বলেন,

> সাহাবায়ে কেরাম হিজরতের মাধ্যমে ইসলামি বর্ষের ক্ষণ-গণনা শুরু করার পেছনে উদ্দীপক ছিলো কুরআনে কারীমের এ-আয়াতখানা:

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ

> যে-মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর—প্রথম দিন থেকে।

তার মতে—এই আয়াতে বর্ণিত 'প্রথম দিন' বলতে বোঝানো হয়েছে, যে-দিন থেকে ইসলাম সম্মানিত হতে শুরু করেছিলো; আর সে-দিনটি ছিলো হিজরতের দিন। এ-ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে আরও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

অতঃপর আবার হিজরিবর্ষের প্রথম মাস নির্ধারণ নিয়ে নতুন মতবিরোধ শুরু হয়। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন রমজান মাস; আবার কেউ পরামর্শ দিলেন রজব মাস; আবার কেউবা প্রবক্তা হন মুহাররমের। হযরত উসমান ﵁ প্রস্তাব দিলেন মুহাররম থেকেই বর্ষ-গণনা শুরু করা হোক—কেননা, এটি পবিত্র মাস, এ-মাস থেকেই বছর শুরু করার প্রচলন রয়েছে, এ-মাসেই মানুষ হজ থেকে ফিরে আসে।

হাফেজ ইবনে কাসির বর্ণনা করেন,

> হযরত উসমান তখন বলেছিলেন, নিশ্চয়ই মুহাররম মহান আল্লাহর পবিত্র মাস, এটিই বছরের শুরু, এ-মাসেই বাইতুল্লাহর গিলাফ পরানো হয় এবং এর মাধ্যমেই তারিখ গণনা করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵁ সুরা ফাজরের তাফসিরে বলেন, "এটি মুহাররম মাসের ফজর, যা বছরের প্রথম সকাল।"

হযরত কাতাদা র. বলেন, "এটি মুহাররমের প্রথম প্রভাত, যখন থেকে বছর-গণনা আরম্ভ হয়।"

[illegible] ইসলামপূর্ব যুগে মুহাররম থেকেই তাদের বর্ষ- [illegible] পরামর্শক্রমে এর বিবেচনা করেন। মহান [illegible]

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم [illegible]

> [illegible] তোমাদের ইমান আনার মতো,
> [illegible]

[illegible]

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [illegible]

> [illegible] তোমাদের জন্য যা এনেছেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ
> [illegible] থাকো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا [illegible]

> [illegible] নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যখন সৎপথে
> রয়েছো, তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> ‘তোমরা আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে, আরও অনুসরণ করবে সঠিক পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতের। তোমরা এর ওপর অবিচল থাকবে।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

> ‘যে আমার উম্মতের ফিতনার যুগে একটি সুন্নাতকে জীবিত করবে, সে শত শহিদের মর্যাদা লাভ করবে।’

তাই হিজরি বর্ষপঞ্জি—হোক তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত, হোক হযরত উমর ফারুক থেকে—নিঃসন্দেহে ইসলামের একটি অনুসরণীয় সুন্নাহ ও ধর্মীয় রীতি। কুরআনে কারীম ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী যার অনুসরণ করা সবার জন্য আবশ্যক।

আর ইসলামি বর্ষপঞ্জি ব্যতীত অন্যান্য বর্ষপঞ্জি—যেমন খ্রিস্টাব্দ, সৌরবর্ষ বা হিন্দুয়ানি ক্যালেন্ডারের অনুসরণ বিধর্মীদের অনুসরণের পর্যায়ভুক্ত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'যে কোনো গোত্রের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।'

তাই মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও দলীয় সকল ক্ষেত্রেই হিজরিবর্ষের অনুসরণ করা উচিত। তাদের জন্য হিজরি মাস-বছরের প্রচলন করা ও দিন-মাস-বছরের আরবি নামের প্রচলন করা আবশ্যক—যেন এর মাধ্যমে উম্মাহ তাদের অতীত-আলোকিত ইতিহাসের প্রতিবিম্ব লাভ করতে পারে; যাতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান-করে-নেওয়া অতীত-ইতিহাসের ইসলামি ব্যক্তিত্বদের প্রেরণা লাভ করতে পারে; যেন পৃথিবীর নজিরবিহীন ইতিহাসবিরল ইসলামি সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারে।

সালিমুল্লাহ খান

শাইখুল হাদীস, জামিয়া ফারুকিয়া করাচি

চেয়ারম্যান, বেফাকুল মাদারিসিল
আরাবিয়া, পাকিস্তান

১২.১২.১৩২৪ হিজরি

ভূমিকা

প্রতিটি জীবন্ত জাতি আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, জ্ঞানমূলক এবং ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে—যে-উপাদানসমূহ রচনা করে সেই জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও টিকে থাকার ভিত। তেমনিভাবে আরবদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো, যে-সব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে আরবজাতি বেড়ে উঠেছে, নেতৃত্ব দিয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, সে-উপাদানগুলোর একমাত্র উৎস ছিলো ‘ইসলাম’; অর্থাৎ ইসলামধর্ম অবলম্বনের পর থেকেই মূলত আরবজাতি ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ও মর্যাদাবান স্থান করে নিতে পেরেছে।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে আরবদের জন্মভূমি ‘আরব-উপদ্বীপ’-এ (জাযিরাতুল আরবে) ইসলামধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। ইসলাম এসে পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার বিনাশ সাধন করে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে তাদের প্রতিমাগুলো। আর ইসলামই এই আরবদেরকে দেখায় পৌত্তলিকতার দাবানল ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ। আরবদেরকে স্বগোত্রপ্রীতি ও আঞ্চলিকতাবাদের প্রবণতা-মুক্ত করতে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। ইসলামের ছোঁয়াতেই এই আরবজাতির জ্ঞান-বুদ্ধি এবং আকল-মন আলোকমালার সন্ধান পায়। ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে তাদের তনু-মন। ফলে তারা ঝুঁকে পড়ে একমাত্র শরিকবিহীন (লা-শারিক) বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহর ইবাদত ও উপাসনার প্রতি।

আরবদের এই পরিবর্তনের কারণ—ইসলামই তাদেরকে এক নতুন অস্তিত্ব ও কাঠামো উপহার দিয়েছে এবং তাদেরকে এমন এক সমাজে একীভূত করেছে, যে-সমাজের নেতৃত্বে ছিলো সংহতি, উদারতা, সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ন্যায়পরায়ণতার সমূহ অনুভূতি। পারস্পরিক সংহতি, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ইনসাফের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো এই সমাজ। অথচ ইতোপূর্বে আরবরা ছিলো অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া এবং বিপথগামী একটি উপজাতি।

ভূমিকা

আমরা সবাই গর্বের সাথে স্মরণ করি, ১৪০০ বছর আগে আরবদের জন্মভূমিতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদের ﷺ দাওয়াত ও আহ্বান প্রকাশ পেয়েছিলো। মুহাম্মাদের ﷺ এই আহ্বান ছিলো পুরো মানবজাতির জন্য হিদায়াত ও পথনির্দেশ এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি ইমান আনয়ন ও বিশ্বাস-স্থাপনের আহ্বান। রাসূলে কারীমের ﷺ এই ডাক ও আহ্বান ছিলো সকল জাতিকে এক জাতিতে ঐক্যবদ্ধকরণের, যাতে থাকবে না কোনো বংশগত ভেদাভেদ ও আঞ্চলিকতাপ্রীতির ছাপ।

আমরা এ-কথা ভুলবো না যে, ইসলামধর্ম তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার কারণে বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের স্থান দখল করে আছে। এই ধর্ম যেমনিভাবে প্রভুর সাথে মানুষের সম্পর্ককে সুগঠিত ও মজবুত করে তোলে, তেমনি মানুষের সাথে মানুষের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককেও সুবিন্যস্ত ও প্রগাঢ় করে—একইভাবে ইসলাম ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কও সুসংহত করে।

ইসলামের আবেদন ও আইনের কারণে এই ধর্মকে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও বিধান হিসেবে গণ্য করা হয়, যা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সুরক্ষা বাধ্যতামূলক করে; দায়িত্বের ক্ষেত্রে অধিকার, কর্তব্য ও সংহতিতে জাতির নাগরিকদের মাঝে একতা রক্ষার আহ্বান করে। ইসলাম মানুষের মাঝে বংশ-গোত্র ও বর্ণপ্রথার বিভেদ দূর করে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য করে। এ-ব্যাপারে আমাদের জন্য রাসূলের ﷺ সেই বাণীটি যথেষ্ট, যেখানে তিনি বলেন, "অনারবের ওপর আরবের এবং কৃষ্ণবর্ণের ওপর শ্বেতবর্ণের কোনো মর্যাদা নেই; তাকওয়াই মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি।" অর্থাৎ যে বেশি তাকওয়াবান (আল্লাহভীরু), সে বেশি সম্মান ও মর্যাদা পাবার হকদার। এ-ছাড়া আরব-অনারব, সাদা চামড়া-কালো চামড়ার মানুষ সকলেই সমমানের।

ইসলাম আমাদের বংশ ও জাতকৌলিন্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও জিহাদের প্রতিও উৎসাহিত করেছে। ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ করা ও বাধা দেওয়া এবং মজলুম ও নির্যাতিতদের সাহায্য করার ব্যাপারেও অনুপ্রাণিত করেছে ইসলাম। এ-সব নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম সংঘটিত হওয়ায় ইসলামি দাওয়াতের পতাকাতলে বিভিন্ন জাতি, বংশ ও শ্রেণির মানুষ একীভূত হয়ে মিশে গেছে বৃহৎ ইসলামি সমাজে।

আরব-উপদ্বীপ (জাযিরাতুল আরব) অঞ্চলে ইসলামি দাওয়াতের প্রচার-প্রসার এবং রাসুলের যুগে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াতি মিশন জাযিরাতুল আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে খুলাফায়ে রাশিদার আমলে এই মিশন পূর্ণতা লাভ করে। ফলে ইরাক, বৃহত্তর শাম, ইরান, পারস্য এবং মিশর বিজিত হয়ে ইসলামের শাসনাধীনে চলে আসে। তৃতীয় পর্যায়ে উমাইয়াদের শাসনামলে (যারা দামেশককে খেলাফতের রাজধানী হিসেবে বেছে নিয়েছিলো) তুর্কিস্তান, মঙ্গোলিয়া, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-আফ্রিকা এবং আন্দালুস ইত্যাদি অঞ্চল বিজয় করা হয়। এই তৃতীয় পর্যায়ে (যার সময়কাল ছিলো প্রায় ১ শতাব্দী) ইসলামি সাম্রাজ্য পূর্বে চিন-সীমান্ত থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক সাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ ধাপ শুরু হয় আব্বাসি সাম্রাজ্য (খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনকালে যা সর্বোচ্চ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিলো এবং ক্ষমতা ও বৈজ্ঞানিক-সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির চূড়ান্ত মর্যাদায় পৌঁছেছিলো) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই চতুর্থ ধাপের স্থায়িত্বকাল ছিলো প্রায় ৫২৫ বছর। আব্বাসিদের শাসনামলের শেষ দিকে কয়েকটি অঞ্চলে স্বাধীনতা, বিদ্রোহ এবং বিচ্ছিন্ন আন্দোলন বেড়ে যায়। এরই ফলে তুর্কিদের প্রভাব অস্তিত্ব লাভ করে। এরপর ধীরে ধীরে তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত হতে থাকে। অবশেষে হিজরি দশম (খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) শতাব্দীতে গোটা আরব-বিশ্বের ওপর উসমানি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পর্যায়গুলোতে ইসলামি অঞ্চল ও ভূখণ্ডসমূহ পূর্ব-পশ্চিম দিক থেকে বিভিন্নভাবে বহিরাগত আক্রমণের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন এবং মারাত্মক আগ্রাসন ও আক্রমণ ছিলো ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ এবং ভয়ঙ্কর মঙ্গোল-যুদ্ধ। নিজেদের ঐক্য এবং আকিদাগত দৃঢ় বিশ্বাসের কল্যাণে মুসলমানরা এ-সব আক্রমণ ও যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় এবং আক্রমণকারীদের ওপর বিজয় লাভ করে। মুসলমানরা নিজেদের দেশ ও ভূখণ্ড থেকে আক্রমণকারীদেরকে বিতাড়িত করে।

যে-বিষয়টি বোঝা এবং উপলব্ধি করা উচিত, তা হলো, মুসলমানরা নিজেদের বিজিত দেশ ও অঞ্চলসমূহে যোদ্ধা এবং দখলদার হিসেবে প্রবেশ করেনি; বরং তারা এ-সব দেশে প্রবেশ করেছিলো ইসলামের শাশ্বত বার্তা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের সৈনিক হিসেবে। বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর জাগরণে কিংবা পুনর্জাগরণে বিরাট ভূমিকা রাখে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর পুনর্জাগরণে ইসলামধর্মের অবদান ছিলো অনস্বীকার্য। আন্দালুস এবং সিসিলির

মারকাযসমূহ থেকে ইসলামি সভ্যতা ইউরোপে প্রবেশের পূর্বে এই অঞ্চলের জনগণ ছিলো মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত।

মোটকথা, ইসলামের ইতিহাস একটি আয়না এবং একটি পাঠশালার মতো—যাতে রয়েছে অনেক বীরত্ব, মহত্ত্ব ও কীর্তিগাথা—যেগুলো নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। ইসলামি ইতিহাসের ঐতিহ্য ও নিদর্শনগুলোর জন্য আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত ও সম্মানিত মনে করি; যে-সব নিদর্শন আজও জীবন্ত ছবির মতো ইসলামি সভ্যতার গৌরবগাথা বর্ণনা করছে।

মহান আল্লাহর কাছে আমরা মিনতি করছি, তিনি যেন আমাদের এই ইতিহাস লেখার কাজকে শুধু তার সন্তুষ্টিতে পরিণত করেন—এই আশায় আমরা তাঁর কাছে দুআ করছি। তিনি উম্মতের সন্তানদের মাঝে জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে এই গ্রন্থ প্রকাশের তাওফিক দিয়েছেন। আল্লাহ সমস্ত শুভ ইচ্ছার উদ্ভাবক এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি

রমযানুল মুবারক ১৩৮৯ হিজরি

নভেম্বর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রাক-ইসলামি যুগে আরব

জাযিরাতুল আরব বা আরব-উপদ্বীপ আরবের এবং আরব-জাতির প্রথম আবাসস্থল—বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আরব-উপদ্বীপ। এ-দ্বীপের তিন দিক সাগর দ্বারা বেষ্টিত। ভৌগোলিক সীমানা হিসেবে এর দক্ষিণে আরব-সাগর, উত্তরে ইরাক ও শাম অঞ্চল, পূর্বে আরব (বা পারস্য) উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর রয়েছে।

ঐতিহাসিকরা আরব-জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকেন।

- আরবে আরিবা: আরবে আরিবা কাহতানের সন্তানাদি। তাদের মাতৃভূমি ছিলো ইয়েমেন। কাহতানি আরবরা পরবর্তী সময়ে সময়ে দুই শাখায় ভাগ হয়ে যায়। এরা হলো সাবা'র সন্তানাদি কাহলান এবং হিময়ার। আর তারাই যেহেতু আরব-উপদ্বীপে সর্বপ্রথম আরবি-ভাষায় কথা বলেছিলো, এ-জন্য তাদের বলা হয় আরবে আরিবা।[১]

- আরবে মুসতারিবা: আরবে মুসতারিবা হলো আদনানের সন্তানাদি। যাদের বংশপরিক্রমা মিলিত হয় নবী ইসমাইলের সাথে। ইসমাইল কথা বলতেন সুরিয়ানি ভাষায়। সুরিয়ানি ছিলো তার পিতা ইবরাহিমের ভাষা। একপর্যায়ে ইবরাহিম পুত্র ইসমাঈলসহ মক্কায় আসেন। কাহতানি বংশোদ্ভূত জুরহুম গোত্রের কিছু মানুষের সঙ্গে বাইতুল্লাহর পাশে বসবাস করতে থাকেন। পরে তাদের এক নারীকে বিয়ে করেন। এ-সময়ে তিনি নিজে আরবি-ভাষা শেখার পাশাপাশি সন্তানদেরও শেখান; এ-জন্য তাদের বলা হয় আরবে মুসতারিবা।

  আদনানি আরবদের প্রাথমিক বাসস্থান ছিলো হিজায, নাজদ এবং সিরিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত কিছু এলাকা। পরবর্তী সময়ে কাহতানিরা উত্তর-আরবে

[১] দ্রষ্টব্য—*আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, আবু শাহবা: ১/৪৭

হিজরত করে আদনানিদের সাথে মিলিত হয় এবং হিজায, নাজদ—বিশেষ করে মদীনাকে স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করে।

➦ বিলুপ্ত (বা ধ্বংসপ্রাপ্ত) আরব: আদনান ও কাহতান গোত্রের পূর্বে আরবদের বিশাল একটি গোষ্ঠী ছিলো। কিন্তু একপর্যায়ে তারা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের কোনো উত্তরাধিকারী থাকে না। আর এ-কারণেই তাদেরকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিলুপ্ত আরব বলা হয়।। বিলুপ্ত আরবদের মধ্যে আদ, সামুদ, তসম, জাদিস উল্লেখযোগ্য কিছু গোত্র। তাদের প্রসিদ্ধ শহর ছিলো হাজরামাউত, ইয়ামামা, ইয়াসরিব, ওমান, তায়মা ও ওয়াদিল কুরা ইত্যাদি।[২]

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের ধর্ম

তৎকালীন আরবরা দ্বীনে-হানাফিয়্যা তথা ইবরাহিমের ﷺ ধর্মের অনুসারী ছিলো; সে-সময় এটিই ছিলো তাওহিদের ধর্ম—যদিও পরবর্তীকালে আমর বিন লুহাই নামক এক মূর্তিপূজারি এই ধর্মে বিকৃতি সাধন করে। এই আমরই সর্বপ্রথম আরবদের মূর্তিপূজা শিক্ষা দেয়।[৩] ফলে আরবরা দীর্ঘ দিন রত থাকে মূর্তিপূজায়। এরপর নবী মুহাম্মাদকে ﷺ পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা দ্বীনে-হানাফিয়্যার এই বিকৃতি দূর করে তাওহিদের ধর্ম ফিরিয়ে আনেন।

[২] দ্রষ্টব্য—*মাদখাল লি ফাহমিস সিরাত*: ৯৮-৯৯; *আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*: ১/৪৭, অবু শাহবা

[৩] পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হলো, নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তিপূজা, যা আজও প্রায় সকল ধর্মীয় সমাজে চালু আছে এবং বর্তমানে যা মুসলিম-সমাজে স্থানপূজা, কবরপূজা, ছবি-প্রতিকৃতি, মিনার ও ভাস্কর্য-পূজায় রূপ নিয়েছে; এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় উদাহরণ যিশুর মূর্তি। আজকের খ্রিস্টানরা গির্জায় স্থাপিত যিশুর মূর্তির সামনে গিয়েই নতজানু হয়, তার কাছেই কায়মনে প্রার্থনা করে—কোনো কিছু কামনা করে। তারা জানে যে, এই মূর্তির কোনো কার্যক্ষমতা নেই; তবু তারা এটিকে নবীর একটি সিম্বল বানিয়ে, ঈশ্বরের পুত্রের একটি উপমা বানিয়ে তার পূজা করছে। যিশু তো আর হিন্দুধর্মের দেবতাদের মতো বেদ, গীতা, মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনি থেকে উঠে আসেননি; তিনি সত্য এবং তার ইতিবৃত্ত বেশ ঘটা করেই পৃথিবীর ইতিহাসে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যিশুকে সত্য জানার পরও—তার আগমন, ধর্মপ্রচার, পরলোকগমন সব ইতিহাসে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানার পরও মানুষ তার মূর্তি বানিয়ে তাকে পূজা করা শুরু করেছে—এটাই হলো শয়তানের কারসাজি। শয়তান এভাবেই মানুষের অন্তকরণে ধোঁকার বীজ বুনে দেয়। মানুষকে একেশ্বরবাদ (তাওহিদ) থেকে পৌত্তলিক (মুশরিক) বানানো মানবমনের ভঙ্গুর ধর্মবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরব-উপদ্বীপে মূর্তিপূজক ছাড়া আরও কিছু ধর্মাবলম্বীর অস্তিত্ব ছিলো। ইহুদি, খ্রিস্টান, আগুনপূজারি (মাজূস) এবং তারকাপূজারি (সাবেয়ী) তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

জাহেলি-যুগে ইহুদিরা বসবাস করতো খাইবার, ইয়াসরিব[৪] (মদীনা), ইয়েমেন, ওয়াদিল কুরা এবং তায়মা ইত্যাদি শহরে। আরবদের মধ্য থেকে ইহুদি-মতাবলম্বীদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম, যা উল্লেখ করার মতো নয়। এ-ছাড়া ইয়েমেনে হিমযারের এক ইহুদি বাদশা বসবাস করতো। সেখানে তার বেশ কিছু অনুসারী ছিলো। খুব সম্ভবত এটা ছিলো মূসার আনীত ইয়াহুদধর্ম বিকৃতির পূর্বে।

খ্রিস্টানদের বসবাস ছিলো ইয়েমেন, নাজরান ও উত্তর-আরবের জানদাল শহরে। সিরিয়ার গাসসানি আরবদের সাথে এবং ইরাকের হিরা শহরেও তারা বসবাস করতো।

সাবেয়ী তথা গ্রহ-নক্ষত্রপূজারিদের অস্তিত্ব ছিলো আরব-উপদ্বীপের দক্ষিনাঞ্চলে। পরিমাণে তারা ছিলো খুবই কম। কিছু ইরাকি এবং ইয়েমেনিও তাদের অনুসরণ করতো।

আগুনপূজারিদের বিশ্বাস ছিলো, ভালো ও মন্দের জন্য দুজন পৃথক উপাস্য আছেন। তারা আরব-উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চল এবং ইয়েমেনের ছোট শহরগুলোতে বসবাস করতো। খুব সম্ভবত এ-সব অঞ্চলে পারস্য শাসকদের উপস্থিতির কারণেই এই ধর্মের বিস্তৃতি ঘটেছিলো। কারণ অজানা নয়, এটা মূলত একজন পারসিক তথা জারাদাশত প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ছিলো।

আরও বেশ কিছু ধর্মের অস্তিত্ব ছিলো আরব-উপদ্বীপে—কিন্তু ইসলামের আবির্ভাব এবং তাওহিদের ধর্ম ফিরে আসার ফলে ভ্রান্ত সব ধর্ম একেক করে অস্তিত্ব হারায়। এরপর আরব-উপদ্বীপে তাওহিদের ধর্মই টিকে থাকে একক অস্তিত্বে।

[৪] হযরত নূহের এক ছেলে, নাম তার ইয়াসরিব। ইয়াসরিবের বংশধরদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তিনি মদীনায় এসে বসবাস করেন। তার নামানুসারে এ-শহরের নাম ইয়াসরিব রাখা হয়। ইয়াসরিব অর্থ অভিযুক্ত করা বা ধমক দেওয়া। রাসূলের আগমনে যে-শহরের এত গুণাগুণ তার নাম ইয়াসরিব থাকতে পারে না, তাই রাসূল আল্লাহর নির্দেশে শহরের নাম ইয়াসরিব পাল্টে মদীনা তাইয়েবা রাখেন।

ইসলামের পূর্বেও আরবরা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করতো না; বরং তারা শিরক করলেও এই বিশ্বাস রাখতো যে, স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ আছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

> তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো, যদিও তারা ছিলো মুশরিক। সূরা ইউসুফ: আয়াত ১০৬

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ

> আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন—'কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন?', তারা উত্তরে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'।
>
> সূরা লুকমান: আয়াত ২৫

সেই অন্ধকার যুগে আরব-উপদ্বীপে হাজার হাজার মূর্তি ছিলো। প্রত্যেক গোত্রের জন্য ছিলো স্বতন্ত্র মূর্তি। শুধু কুরাইশ গোত্রেরই কাবার আশপাশে ছিলো স্বতন্ত্র ৩৬০টি মূর্তি। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এ-সব মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দেন।[৫]

কাবা ও হজের তীর্থস্থান

ইবরাহিম ﷺ কর্তৃক পবিত্র কাবা নির্মাণের পর থেকে আরবদের কাছে কাবা শরিফের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের কমতি ছিলো না। পবিত্র স্থান হিসেবে তাদের একমাত্র স্থান ছিলো কাবাঘর। তৎকালীন আরবরা আল্লাহর এই মহান ঘরের তাওয়াফ করতো। একইভাবে এই কাবাঘরের সম্মানও রক্ষা করতো। এরপর আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের আবির্ভাব হলে কাবার মহত্ত্ব ও সম্মান আরও বৃদ্ধি পায়। সব সময় কাবাঘর তাওয়াফের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

হজের বিধান বিধিবদ্ধ ছিলো নবী ইবরাহিমের ﷺ যুগ থেকেই। দীর্ঘ সময় ধরে মূর্তিপূজা-করে-আসা আরবরা এই পবিত্র ঘরে হজ করতে থাকে এবং তারা হজের যাবতীয় নীতিমালাও পালন করতে থাকে; কিন্তু তারা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় জাহেলি

[৫] *দ্রষ্টব্য—আল গুরাবাউল আওয়ালুন: ৬০*

বিদআত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিরকি তালবিয়া। হজের সময় তারা তালবিয়া পাঠ করতো এভাবে:

> আমরা উপস্থিত। হে আল্লাহ, আমরা উপস্থিত। আমরা উপস্থিত, তোমার কোনো শরিক নেই। তবে এমন শরিক আছে, যার মালিক তুমি নিজেই।[৬]

ইসলামধর্মের আবির্ভাব হজকে আরও সুদৃঢ় করে এবং তার থেকে বিদআত দূর করে ইসলামি রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে।

হারাম শরিফের সম্মান

নবী ইবরাহিমের ﷺ যুগ থেকেই আরবদের নিকট কাবা শরীফের চারপাশে অবস্থিত হারামে এলাকাকে সম্মান ও মূল্যায়নের একটি রীতি প্রচলিত ছিলো। হারামের সীমানার[৭] মধ্যে মারামারি বা খুনোখুনি অবৈধতার ব্যাপারে একমত ছিলো আরবরা। এ-জন্য হারাম শরিফে কেউ প্রবেশ করলে, সেখান থেকে নিরাপদে বের হওয়া পর্যন্ত তার কোনো ক্ষতি করা হবে না—এ-ব্যাপারে তারা সচেষ্ট ছিলো।

তৎকালীন জাহেলি-যুগে আরবদের একটি প্রশংসনীয় প্রথা ছিলো; তারা সেটাকে যথেষ্ট সম্মান করতো ও গুরুত্ব দিতো। পরবর্তী সময়ে ইসলামের আবির্ভাব এর সম্মান আরও বৃদ্ধি করে। প্রথাটি হচ্ছে, বছরের নির্ধারিত চার মাস—যে-চার মাসে কোনো প্রকার যুদ্ধ, হত্যা, ঝগড়া-ফাসাদ চলবে না। নির্ধারিত চারটি মাস হলো—রজব, যিলকদ, যিলহজ এবং মুহাররম।[৮]

---

[৬] ইসলামে হজে নির্ধারিত তালবিয়া হলো: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك

[৭] হারাম শরিফের সীমানা: হারাম শরিফের সীমানা হলো—পশ্চিম দিকে: শুমাইসি (হুদায়বিয়া), যা মসজিদে-হারাম থেকে জেদ্দার রাস্তায় ২২ কি. মি. দূরে অবস্থিত; পূর্ব দিকে: তায়েফের রাস্তার উরানা উপত্যকার পশ্চিম পার্শ্ব পর্যন্ত, যা মসজিদে-হারাম থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে—জিরানার দিক থেকে মুজাহিদিনের পথ হয়ে মসজিদে-হারাম থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরত্বে; উত্তর দিকে: 'তানঈম' পর্যন্ত, যা মসজিদে-হারাম থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে; দক্ষিণ দিকে: 'আযাত্ লীন' ইয়েমেনের রাস্তা, যা মসজিদে-হারাম থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরত্বে। হজ ও ওমরা পালনকারীদেরকে মসজিদে-হারামের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি লক্ষ রেখে যথাযথ দায়িত্ব পালন এবং ইহরাম বাঁধার ক্ষেত্রে এর সীমানার প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত জরুরি।

[৮] আবু বাকরা ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, "বছরে হচ্ছে বারো মাস। এর মধ্যে চার মাস হারাম (নিষিদ্ধ)। চারটির মধ্যে তিনটি ধারাবাহিক: যিলকদ, যিলহজ ও মুহাররম। আর হচ্ছে, মুদার গোত্রের রজব মাস, যেটি জুমাদা ও শাবান মাসের

এই অলিখিত প্রথা প্রবর্তন আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে বিরাট এক অবদান রাখে। প্রত্যেক গোত্রের ধর্মীয় কার্যাবলি আদায় করতে, বাণিজ্য-বাজার নিরাপদ রাখতে, সাহিত্যের আসর ও মৌসুমগুলো সচল রাখতে এবং যুদ্ধ ও বিগ্রহ, বিবাদ ও বিসংবাদ—যেগুলো ছিলো তৎকালীন আরব চরিত্রের অপরিহার্য অংশ, সেগুলো থেকে দূরে রাখতে এই প্রথার ভূমিকা ছিলো অতুলনীয়।

সামাজিক অবস্থা

গোটা আরব-উপদ্বীপের অধিবাসীদের মাঝে মরুচারিতা (বাদাওয়াহ) ছিলো প্রধান বৈশিষ্ট্য। এমনকি মক্কা, ইয়াসরিব, সানআ ও নাজরাতের মতো শহরগুলোর অধিবাসীরাও এই মরু-প্রকৃতি থেকে মুক্ত ছিলো না। এই মরুচারী প্রকৃতিই তাদের জীবনের সকল চিন্তা-চেতনা, কাজ-কর্মের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক ছিলো। এটা থেকেই জন্ম নিয়েছিলো তাদের গোত্রপ্রীতি ও জাহেলি সাম্প্রদায়িকতা। জাহেলিয়্যাত তাদের মন ও মানসিকতাকে রুক্ষ ও উগ্র করে দিয়েছিলো। ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে লেগেই থাকতো।

এ-সব যুদ্ধের কারণ ছিলো বিভিন্ন ধরনের। তবে বেশিরভাগ যুদ্ধই তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর কারণে লেগে থাকতো। যেমন: একটি উটনি-হত্যা নিয়ে বনু বকর এবং বনু তাগলিবের মাঝে যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো দীর্ঘ ৪০ বছর।[১]

আর সে-সময়ে খুন-খারাবি এবং লুটতরাজ নিয়ে গোত্রে গোত্রে ঝগড়া-ফাসাদ লেগে থাকা জাহেলি রীতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। আর এই রীতি অনুসারেই প্রত্যেক গোত্র যখনই সুযোগ ও সক্ষমতা পেতো, অন্যের ওপর ঝাপিয়ে পড়তো!

পারস্পরিক সম্পর্ক ও শাসনপদ্ধতি

আরবদের স্বীয় সম্প্রদায়প্রীতি, স্বগোত্রের সঙ্গে তাদের সুদৃঢ় বন্ধন (তথা আল-ওয়ালা) ছিলো সকল বন্ধনের ঊর্ধ্বে। ফলে কোনো গোত্রের মাত্র এক ব্যক্তি সামান্য লাঞ্ছনার শিকার হলে পুরো গোত্র যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে যেতো। বরং তাদের জাহেলি সমাজের নীতি ছিলো, সর্বাবস্থায় বন্ধু গোত্রকে সাহায্য করা। সে জালেম নাকি

মধ্যবর্তী।" [*সহিহ বুখারি (২১৫৮)*]

[১] *আল কামিল ফিত তারিখ, ইবনে আসির: ১/৩১২*

মজলুম, রোগী নাকি নির্দোষ এটা তারা দেখতে যেতো না। এ-দিকে ইঙ্গিত করে কবি বলেন:

> বিপদের সময় যখন তাদের ভাই তাদের কাছে সহযোগিতা কামনা করে, তখন তারা কোনো প্রমাণ চায় না।

প্রাচীন অর্থে প্রশাসন বা রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে যা কিছু বোঝায় ইসলামপূর্ব আরব সমাজে এর কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। যা ছিলো, তা হলো গোত্রভিত্তিক বন্ধন। প্রত্যেক আরব তার নিজের গোত্র ও গোত্র-প্রধানের অনুগত হতো। গোত্রপ্রধানের কাজ ছিলো প্রচলিত রীতি অনুসারে ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করা, গোত্রের মুখপাত্র হিসেবে কথা বলা ও যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া। মেধার তীক্ষ্ণতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, সাহসিকতা, শক্তি এবং ব্যক্তিত্বের ওপর ভিত্তি করে দলপ্রধান নির্বাচিত হতো।[১০]

বলা হয়, সে সময়ে মক্কায় আরব গোত্রদের মধ্যে শান্তশিষ্ট এবং বিরোধমুক্ত গোত্র ছিলো কেবল কুরাইশরাই। কারণ, তাদের মাঝে ছিলো উপদেষ্টা কমিটি। 'দারুন নদওয়া' নামক একটি ছোট সংসদ ও মিলনস্থল—যেখানে তারা বিভিন্ন সমস্যা-সমাধানে পরামর্শ করতো।

স্বাধীনতা

যুগের পর যুগ স্বাধীন থাকার ফলে স্বাধীনতা ও বন্ধনহীনতা আরব-জাতির জন্মগত স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে তারা যুদ্ধ-লড়াই পর্যন্ত করতো। যে-ব্যক্তি তাদের স্বাধীনতায় বাধা দিতো, সে বিবেচিত হতো তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে। কেউ তাদের স্বাধীনতা অথবা সম্মানে আঘাত হেনেছে—এমন কোনো নজির পেলে তারা তাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করতো না—যদিও সে স্বগোত্রীয় মহান কেউ হোক না কেন।[১১]

[১০] দ্রষ্টব্য— *আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ:* ১/৪৭, আবু শাহবা

[১১] নোট: বিশ্বের ইতিহাস জুড়ে কোনো আন্দোলনই প্রথম ১০০ বছরের মধ্যে ইসলামের মতো এত দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারেনি। ইসলামের মধ্যে এমন কী বিশেষত্ব ছিলো এবং এমন কোন অবস্থাতেই-বা এর পত্তন ঘটেছিলো যে, এর বাণী এত দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিলো! কিছু ইতিহাসবেত্তা এই দ্রুত বিস্তারের সহজ সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরব-উপদ্বীপের নিয়মিত খরা, আরবদের নিয়মিত অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও গৃহযুদ্ধ, আরবদের গৌরব ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়কে কারণ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। তবে সত্য অবশ্যই এমন এক বাক্যের সহজ-সরল ব্যাখ্যার

চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং সূক্ষ্ম। বাস্তবতা হচ্ছে, আরব-উপদ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলো ইসলামের মতো এমন এক শক্তিশালী একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তির আগমনের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলো। ৭ম শতকের শুরুর দিকে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি, ভাষা, ভূ-প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন ছিলো, ইসলামের আগমনের জন্য এর চেয়ে আর ভালো সামগ্রিক পরিস্থিতি আর হতে পারতো না।

আরব-উপদ্বীপ হচ্ছে এক রুক্ষ, কর্কশ ভূমি। স্থায়ী কোনো নদী, জলপ্রবাহ কিংবা হ্রদের অস্তিত্ব এখানে নেই। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা মরূদ্যানগুলোই হচ্ছে এ-অঞ্চলে জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন। মরুভূমির মাঝ দিয়ে ভ্রমণ খুবই কষ্টসাধ্য, জীবনবাজি রেখে চলার মতো; এমনকি এখনো এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে, যেগুলো পানিশূন্যতার কারণে জনমানবহীন।

এই ঊষর মরু-আরবদের এবং আরব-উপদ্বীপের বাইরের লোকদের মাঝে এক ধরনের 'বাফার জোন' বা নিরাপদ অঞ্চল হিসেবে কাজ করতো। এই উপদ্বীপটি ইসলাম আগমনের আগেই তৎকালীন আরবদের মাঝে 'জাজিরাত আল-আরব' কিংবা 'আরবদের দ্বীপ' হিসেবে পরিচিত ছিলো। বহির্বিশ্বের সাথে এই অঞ্চলটির বিচ্ছিন্নতাই ছিলো অঞ্চলটিকে দ্বীপ হিসেবে অভিহিত করার কারণ। একমাত্র একজন বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, প্রশিক্ষিত আরবের পক্ষেই এই বিজন অঞ্চলে টিকে থাকা সম্ভব। এই অঞ্চলের বাইরের লোকজন এই উপদ্বীপে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। তারপরও তখন দুটো সাম্রাজ্য ছিলো, যারা এই প্রচেষ্টা করেছিলো।

ইসলামের আগমনের পূর্বে বিশ্বে আরব-উপদ্বীপ নিয়ন্ত্রণকারী কোনো পরাশক্তি ছিলো না। রোমানরা ভূমধ্যসাগর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতো এবং রোমানরাই ছিলো প্রাচীনকালে বিশ্বের পরাশক্তি। কেউ যদি আরব-বিশ্ব জয় করতে পারতো, তা হলে একমাত্র রোমানরাই পারতো। প্রকৃতপক্ষে রোমানরা তাদের রাজত্ব বিস্তার করার লক্ষ্যে ২৪ খ্রিস্টপূর্ব সনে একবার আরব-উপদ্বীপে আক্রমণ করেছিলো, তবে এটি তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। জগদ্বিখ্যাত রোমান-সৈন্যরা হয়তো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আবহাওয়ায় অনেক কার্যকরী ছিলো, তবে আরব-মরুভূমিতে নয়। রোমানরা কখনোই তাদের নিয়ন্ত্রণ আরব-মরুভূমির উত্তর সীমান্তের বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি।

ইসলামপূর্ব যুগে অন্য আরেক পরাশক্তি ছিলো পারসিক (পারস্য/ফারসি) সাম্রাজ্য। আরব-উপদ্বীপের উত্তর এবং পূর্ব দিকে অবস্থিত এই সাম্রাজ্যটিও আরবে আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলো; যার ফলে রোমানদের সাথে ফারসিদের উপর্যুপরি সংঘাত ও যুদ্ধ লেগেই থাকতো। এ-দুই শক্তির মধ্যে একের পর এক এই মহাকাব্যিক ইঁদুর-বিড়াল খেলায় সম্মুখ যুদ্ধের সীমারেখা সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যেই ঘুরপাক খেতো। উভয় পক্ষই একে অপরের অগ্রগতি সতর্কতার সাথে লক্ষ রাখতো, যার ফলে কোনো পক্ষই আরব-ভূমিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

উত্তর দিকে অবস্থিত শক্তিশালী দুটি প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের মাঝে অবিরত যুদ্ধের কারণে আরবরা বস্তুত স্বাধীন ছিলো। মূলত, আরবরা একপ্রকার বিচ্ছিন্নও ছিলো। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে দূরবর্তী সাম্রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক ব্যাপারস্যাপার নিয়ে আরবদের তেমন মাথা ঘামাতে হয়নি কখনো। তাই বহিঃশক্তির কোনো ধরনের আধিপত্য ছাড়াই তারা জীবনধারণ করতে পারতো, সেই সাথে তৈরি করে নিয়েছিলো নিজেদের মতো করে এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিলো বিকেন্দ্রীভূত এক রাজনৈতিক ধারা, যার ফলে বেড়ে গিয়েছিলো ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বাধীনতা। গোত্রের প্রতি আনুগত্য ছিলো সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শক্তি। — অনুবাদক

পরিবার এবং জাতীয়তা

আরব-জাতির শুরু থেকেই তাদের মাঝে পরিবার-ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। নারী-পুরুষের বিয়ে-শাদি সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে তৈরি হতো পরিবারব্যবস্থা। এরপর বংশ বিস্তারের মাধ্যমে পরিবার ধীরে ধীরে প্রশস্ত হতো। তবে সন্তান ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক, সে তার পিতার পরিচয়ে সম্পৃক্ত থাকতো, মাতার নয়।

জাহেলি-সমাজে নারীদের অবস্থা ছিলো করুণ। নারীদেরকে এতটা তুচ্ছ করা হতো যে, তাদের থেকে অন্যরা ওয়ারিস হতো, কিন্তু তারা নিজেরা ওয়ারিস হতে পারতো না। নারীদের অবস্থা ছিলো দাসীদের সদৃশ। ইসলাম এসে নারীদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের যথাযথ প্রাপ্য।

ইসলাম-পূর্ববর্তী সময়ে জাহেলি-যুগের আরেকটি রীতি ছিলো, পরস্পর বংশ নিয়ে গর্ব করা। তারা নিজেদের বংশ নিয়ে গর্ব করার জন্য মৌসুম বানিয়ে নিতো। ইসলাম এসে এ-সব ভ্রান্ত রীতির বিলোপ ঘটায়। সামাজিক সমতা আবশ্যক করে। সমাজে সবাই সমান—এটি ছিলো ইসলামের পরম শিক্ষা। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

> নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। সুরা হুজুরাত: আয়াত ১৩

মদ্যপান

জাহেলি-সমাজে মদ্যপান ছিলো একটি সচরাচর রীতি। অন্যান্য পানীয় পান থেকে মদ্যপান করাকে তারা গর্বের বিষয় মনে করতো। যার বাস্তব প্রমাণ তাদের রচিত বিভিন্ন কবিতা বা গানে লক্ষ করা যায়। ইসলাম এসে এই মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা মদ্যপানে উপকার থেকে ক্ষতিই বেশি।

সততা

আরবদের স্পষ্টভাষিতা, সত্যপ্রিয়তা ও মিথ্যা থেকে দূরে থাকার এত গল্প ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে এসেছে যে, এটি আরব-জাতির একটি বৈশিষ্ট্য-তিলকে পরিণত হয়েছে। মিথ্যাকে আরবরা এত পরিমাণ ঘৃণা করতো যে, যদি তাদের কেউ কখনো মিথ্যা

বলতো, তবে সেটা সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে যেতো, মানুষ সেটা ভুলতে দিতো না। বিভিন্ন মঞ্চ ও বৈঠকে, গল্প-গুজবের মজলিসে সেটার সমালোচনা করতো।

উদারতা ও দানশীলতা

তৎকালীন আরবদের অন্যতম স্বভাবজাত দুটি গুণ—উদারতা ও দানশীলতা। উদারতা তাদের সমাজে সাধারণ স্বভাব ও চালচলনের অংশে পরিণত হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতা করতো—কে কার থেকে বেশি উদার হতে পারে। উদারতা যে তাদের অন্যতম গুণ—এ-ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করতে পারবে না।

এমনিভাবে তারা অতিথিপরায়ণতায়ও ছিলো অতুলনীয়। তাদের কাছে যখনই কোনো মেহমান আসতো, তারা তার যথাযথ ও সম্মান ও যত্ন নিতো। এমনকি কারও কাছে যদি তার নিজ বাহন বা যুদ্ধের ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছু না থাকতো, তারা এগুলোই জবাই করে আনন্দের সাথে মেহমানদারি করতো।

তারা নিজেদের মাঝে উদারতা ও দানশীলতার গুণ প্রবলভাবে গেঁথে নিয়েছিলো। ফলে তারা কৃপণের প্রতি এমন ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাতো যে, কেউ কৃপণতা করার সাহস করতো না। তাদের দানশীলতার পরিধি এমন দীর্ঘ ছিলো, যা অন্য কোনো জাতি স্পর্শ করতে পারেনি। তাদের মধ্যে দানশীলতায় প্রসিদ্ধ অনেক মনীষী ছিলো। হাতেম তাই[১১] তাদেরই একজন।

আত্মমর্যাদাবোধ ও সাহসিকতা

আরবদের অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য—আত্মমর্যাদাবোধ এবং উত্তম চরিত্র। এ-দিকে ইঙ্গিত করে প্রসিদ্ধ কবি আনতারা বিন শাদ্দাদ বলেন:

> দিবানিশি আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় সময় পার করেছি।
>
> সাধ্যমতো ধৈর্য ধরে উত্তম খাবারের স্বাদ নিয়েছি।

[১১] পূর্ণ নাম হাতিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ আত-তাই; ছিলেন তাই গোত্রের, সময়কাল ৬ষ্ঠ শতাব্দী। তাই বংশ বাস করতো সৌদি আরবের উত্তর পশ্চিম কোণে 'হাইল' নগরীতে। তাই গোত্রের একজন আরব খ্রিস্টান কবিও ছিলেন। সাফানা আদি ইবনে হাতিম তার ছেলে। দানশীলতার জন্য তিনি প্রবাদপুরুষে পরিণত হন এবং বর্তমান সময়েও কারও দানশীলতাকে তার সাথে তুলনা করা হয়। তিনি ৫৭৮ সালে মারা যান। হাইলের তুওয়ারিনের তাকে দাফন করা হয়েছে।

অপরাধী সাব্যস্ত করা হতো। ফলে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পূর্ণ চেষ্টায় অটল থাকতো; এমনকি শুধু প্রতিশ্রুতি পূরণ ও রক্ষা করতে তারা যুদ্ধ পর্যন্ত করতো, রক্ত ঝরাতো। আরব-ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।[১৫]

আরব-সংস্কৃতি

জাহেলি-যুগের আরব-সমাজ ছিলো সর্বযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকপাল। নিখুঁত ছবি অঙ্কন, সুন্দর অভিব্যক্তি, গুণাবলি বর্ণনায় অসাধারণ কৌশল, যুক্তি উপস্থাপনে ভাষাসৌকর্য, একবার শুনেই গল্প মুখস্থ রাখা, বুদ্ধি মেখে কথা বলা এবং শব্দজ্ঞানে গভীর দক্ষতা ইত্যাদি গুণে তারা গুণান্বিত ছিলো।

আরবরা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে সুতীব্র মেধা, ধী ও মুখস্থশক্তির স্বাক্ষর রেখে যায়। তারা কঠিন কঠিন কবিতার পঙ্‌ক্তি এবং দীর্ঘতর গল্প একবার শুনে তৎক্ষণাৎ মুখস্থ করে ফেলতো; এমনকি তারা একবার-শোনা গল্প-কবিতা যখন ইচ্ছা তখনই হুবহু বর্ণনা করতেও পারঙ্গম ছিলো। এই অনুপম মেধা ও অনন্য মুখস্থশক্তি তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

ভাষা চর্চা

শুরুর দিকে সাহিত্য-সংস্কৃতির রাজত্ব ছিলো হিময়ারি। আরবদের মাঝে হিময়ারিরাই সর্বপ্রথম তাদের ভাষাকে লেখ্যরূপ দান করেন। ইয়েমেনের বিভিন্ন শিলা ও পাথরে হিময়ারি খত (লেখা) এখনো বিদ্যমান। হিময়ারি সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করেছিলো ইয়েমেনে বিশেষত তুব্বা, বাদশাহদের শাসনামলে। ফলে তাদের

[১৫] ৭ম শতাব্দীর যে-পারিপার্শ্বিক অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর আগমন ঘটেছিলো, তা ইসলামের আগমনের জন্য ছিলো আদর্শ এক অবস্থা। ভৌগোলিকভাবে তৎকালীন পরাবিশ্বগুলোর থেকে বিচ্ছিন্নতা, সাংস্কৃতিকভাবে রাসূলের ﷺ আলোড়নপূর্ণ জীবনকে গ্রহণ করার জন্য আরবদের মানসিকতা এবং ভাষার দিক দিয়ে—কাব্যিক আসমানি গ্রন্থ—আল-কুরআনের আলৌকিকতা বোঝার সক্ষমতা—এ-সব দিক দিয়ে চিন্তা করলে এমন কোনো স্থান কিংবা কাল চিন্তা করা যায় না, যখন ইসলামের শিকড় গাড়তে আদর্শ পরিবেশ ছিলো। মুসলিমদের কাছে এ-সব কিছুই কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং ইসলামের আগমন এবং বিস্তারের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। অন্য দিকে অমুসলিম ইতিহাসবিদদেরকে ইসলামের এই তড়িৎ বিকাশ এবং বিস্তারের ব্যাপারটি তাদের তথাকথিত 'সেকুলার' (ধর্মনিরপেক্ষ) পরিভাষায় ব্যাখ্যা করতে হিমশিম খেতে দেখা যায়। বিশ্ব-ইতিহাসের অন্যান্য ধর্মগুলোর উত্থানের ঘটনাগুলোর সাথে একে কোনোভাবেই খাপ খাওয়ানো যায় না।—অনুবাদক

লোকেরা এ-সব মেলায় অংশগ্রহণ করতো। প্রসিদ্ধ মেলা ছিলো উকায, মাজান্না এবং যু-মাজায ইত্যাদি।

বার্ষিক এ-সব মেলা ছিলো আরবদের শিল্প-সাহিত্য প্রদর্শনের বিশেষ মৌসুম। উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কবিদের মাঝে সাহিত্য-আসর এবং কবিতা নিয়ে খেলা ও প্রতিযোগিতা হতো। বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পারদর্শী ব্যক্তিরা। সর্বোত্তম কবি নির্বাচন করে কবির নির্বাচিত কবিতা কাবা শরিফে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। ফলে কবির জন্য এটা হতো অফুরান গর্বের উপাদান। কবিদের ঝুলিয়ে-দেওয়া কবিতাগুলোকে বলা হতো 'মুআল্লাকাত' (ঝুলন্ত কবিতা)।

আরবদের আনন্দ উপভোগের অন্যতম মাধ্যম ছিলো কাব্যচর্চা। ফলে এ-সব মেলার বিষয়বস্তুতে কবিতার স্থান ছিলো সর্বাগ্রে। কবিতার পাশাপাশি এ-সব মেলায় বিভিন্ন জ্ঞানমূলক আলোচনা-পর্যালোচনা হতো। নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিকরা এককভাবে আলোচনা উপস্থাপন করতেন। আকসাম বিন সাইফি ও কুসস ইবনে সায়েদা এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উকাযের এক মেলায় কায়স বিন সাআদা আলোচনা করতে গিয়ে মূর্তিপূজার সমালোচনা করেন এবং ইসলামধর্মের সুসংবাদ দেন।

বছর কয়েকবার সংঘটিত হওয়া এ-সব সাহিত্যমেলা আরবদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। উৎকৃষ্ট কবিতার স্থানে স্থান পেতে সকল কবি ও সাহিত্যিক অপেক্ষার প্রহর গুনতেন। আরবদের নিয়মিত এ-সব সাহিত্যমেলার মাধ্যমে আরবি-ভাষা যখন পূর্ণতায় রূপ নেয়, তখনই উদিত হয় ইসলামের সূর্য। গোটা আরবে আরবি-ভাষার নেতৃত্ব দেয় কুরাইশদের আরবি-ভাষা। কবিতা, ছন্দ ও বক্তব্য-চর্চায় কুরাইশদের আরবিই স্বতন্ত্র গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।[১৬]

শিক্ষাদীক্ষা

মরুভূমিতে পশু চরানো ছিলো বেদুইন-আরবদের মূল স্বভাব—পশুর ঘাস ও পানির জন্য তারা একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো। ফলে এগুলো ছেড়ে শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করবে—এমন কল্পনা তারা আদৌ করতো না; তথাপি আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষাবাদ ও কৃষিকাজ এতটা অগ্রসর হয়েছিলো, যা প্রকৌশল বিজ্ঞান ও

[১৬] দ্রষ্টব্য—*আবকারিয়াতুল লুগাতিল আরাবিয়া*, ড. মুহাম্মাদ সাইদ রবি আল-গামেদি

নির্মাণ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরবদের ব্যাপক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। আরবদের প্রকৌশল ও পরিকল্পনা-জ্ঞানে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইয়েমেনের মারিব বাঁধ।[১৭]

আবহাওয়ার উত্থান-পতন এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস সম্পর্কে বেদুইনদের তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিলো। বাতাসের গতিবিধি দেখে তারা বৃষ্টির পূর্বাভাস এতটাই সূক্ষ্মতার সঙ্গে দিতে পারতো যে, বিভিন্ন সময়ে তারা তাদের অধীনস্থদেরকে উপত্যকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিতো। কারণ তারা বুঝতে পারতো, সে-সময়ে উপত্যকায় প্রবল ঢল নামবে।

চিকিৎসার জন্য বেদুইনদের মাঝে ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ ব্যবহারের প্রচলন ছিলো। বেদুইনরা বিভিন্ন গাছ-গাছড়া ও লতাপাতার মাধ্যমে ঔষধ তৈরি করতো এবং এ-সব ঔষধ দিয়ে অনেক রোগীর চিকিৎসা করতো। তাদের অনেকেই (অর্থোপেডিক ফ্র্যাকচার) হাড়ভাঙন-চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলো। তারা আগুনে ছেঁকা দিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসা করতো। বরং এটা ছিলো তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাপদ্ধতি। তাদের মাঝে অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও ছিলো। হারেস বিন কালদা এবং লুকমান বিন আদ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রাচীন কাল থেকেই আরব-জাতি ব্যবসার সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিলো। যাযাবর জীবন যাপন সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা যথেষ্ট অগ্রসর ছিলো। পাশাপাশি আরব-উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানও তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড আরও বেগবান করে।

[১৭] প্রাচীন বিশ্বের স্থাপত্যকলার অন্যতম বিস্ময় ছিলো মারিবের মহাবাঁধ, যা ইয়েমেনে অবস্থিত ছিলো। এর নির্মাণ শুরু হয়েছিলো খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে। এটি তৈরি হয়েছিলো মাটি দ্বারা। প্রস্থচ্ছেদে এটি ছিলো ত্রিকোণাকার, দৈর্ঘ্যে ৫৮০ মি. (১৯০০ ফিট), প্রকৃত উচ্চতায় ৪ মি. (১৩ ফিট)। এটি দুই সারি পাথরের মাঝে তৈরি হয়েছিলো, যার সাথে শক্তিশালীভাবে বাঁধটি জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো। বিভিন্ন সময়ে এর সংস্কার করা হয়, যার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০ সালের সংস্কার। এর ২৫০ বছর পর বাঁধটির উচ্চতা বৃদ্ধি করে ৭ মি.-এ (২৩ ফিট) উন্নীত করা হয়। সাবাদের রাজত্বের শেষে বাঁধটির নিয়ন্ত্রণ চলে যায় হিমইয়ারাইটদের (১১৫ খ্রিস্টপূর্ব) হাতে, যারা এর কলেবর বৃদ্ধি করে। তাদের বানানো বাঁধ ছিলো ১৪ মি. (৪৬ ফিট) উঁচু এবং এতে ছিলো অতিরিক্ত পানি বের হবার জন্য ৫টি পথ, ২টি শক্তিশালী জলকপাট ও বিতরণ-চৌবাচ্চায় সংযোগকারী ১০০০ মি. দীর্ঘ খাল। এই ব্যাপক সংস্কার ৩২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শেষ হয় এবং ২৫০০০ একর (১০০ বর্গকিমি) এলাকায় সেচকার্য সম্ভব করে তোলে।—উইকিপিডিয়া

কারণ এই উপদ্বীপ ছিলো তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মেলবন্ধন। আরব-উপদ্বীপের দক্ষিণ বন্দরগুলোতে দূর প্রাচ্য ও ভারত থেকে জাহাজ বোঝাই করে মালামাল আসতো। সেগুলো পরে চলে যেতো বিভিন্ন বন্দর এবং পশ্চিমা ইউরোপীয় দেশগুলোতে। এ-ছাড়াও আরবের বেশ কিছু শহরবাসী স্থানীয় মালামাল বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতো।

ইসলামের সূর্যোদয়

রাসূলের ﷺ জীবনী

নবী মুহাম্মাদ ﷺ ১২ রবিউল আউয়াল আমুল ফিল (হস্তী বছর)[১৮] ৫৭১ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[১৯]

বাবার দিক থেকে তার বংশ-পরিচয়: মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে-মানাফ বিন কুশাই বিন কিলাব বিন মুররা বিন কাআব বিন লুয়াই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালিক বিন নাদার বিন কিনানা বিন খুযাইমা বিন মুদরিকা বিন ইলয়াস বিন মুদার বিন নাযযার বিন মাআদ বিন আদনান।[২০]

মায়ের দিক থেকে তার বংশ-পরিচয়: মুহাম্মাদ বিন আমিনা বিনতে ওয়াহাব বিন আবদে মানাফ বিন যাহরাহ বিন কিলাব। নবীজির ﷺ বাবা-মায়ের বংশপরিক্রমা কিলাব বিন মুররার বংশ পর্যন্ত ভিন্ন হলেও কিলাবের পর থেকে তাদের বংশ-পরিক্রমা অভিন্ন সূত্রে গাঁথা।

রাসূলুল্লাহর ﷺ বংশ বনু হাশিম কুরাইশ গোত্রের সর্বোৎকৃষ্ট শাখা-গোত্র হিসেবে বিশুদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ছিলো। উত্তম চরিত্র ও সৎ স্বভাবের অধিকারী হিসেবে এই গোত্র ছিলো প্রভাবপ্রতিম; তাই হাজিদের পানি পান করানো এবং তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের হাতে। আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের দশ ছেলের সর্বকনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে স্নেহাস্পদ। আবদুল্লাহর মা ছিলেন মদীনার বনু নাজ্জার গোত্রের আউস বংশীয় কন্যা।

উত্তম চালচলন ও সৎ চরিত্রের অধিকারী আবদুল্লাহর বয়স যখন সাতাশ, তখন তার বাবা মদীনার উঁচু বংশীয় শান্ত-শিষ্ট ও সম্মানিতা নারী বনু যোহরা গোত্রের আমিনা বিনতে ওয়াহাবের সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন করেন। আবদুল্লাহ আমিনার

[১৮] *সিরাতে নাববিয়্যাহ, ইবনে হিশাম:* ১/৮৪

[১৯] *সহিহুস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ,* ড. ইবরাহিম: ৪৭

[২০] *বুখারি:* ৪/২৮৮; *শারহুস সুন্নাহ:* ১৩/১৯৩

অনন্য গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যে ছিলেন বেশ সন্তুষ্ট। তবে তাদের সুখের জীবন বেশি দিন স্থায়ী হলো না। বিয়ের প্রায় ৪০ দিন পর আবদুল্লাহ সিরিয়া যান ব্যবসার উদ্দেশ্যে। সিরিয়া থেকে ফেরার পথে মদীনায় বনু নাজ্জার গোত্রের কাছাকাছি এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই তিনি সাড়া দেন পরম প্রভুর ডাকে। তার ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মা আমিনার গর্ভে। তার জন্ম হলে দাদা আবদুল মুত্তালিব খুবই খুশি হন।

নবীজির বাল্যকাল

নবীজিকে তার মা আমিনা মাত্র ৭ দিন দুধ পান করিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তার চাচা আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবা তাঁকে দুধ পান করান—যিনি ইতোপূর্বে তার অপর চাচা হামযাকেও ﷺ দুধ পান করিয়েছিলেন। এরপর তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী নবী মুহাম্মাদকে তার মা আমিনা হাওয়াযিন গোত্রের প্রসিদ্ধ ধাত্রী হালিমা সাদিয়াকে লালন-পালন ও দুধ পান করানোর জন্য দিয়ে দেন। হালিমা তাকে নিয়ে চলে যান নিজ গ্রামে। সেখানে তিনি তাকে পূর্ণ ২ বছর দুধ পান করান। সে-সময়ে বনি সাআদ এলাকায় নবী মুহাম্মাদ তার দুধমাতা এবং দুধ-ভাইদের সাথে ৪ বছর অবস্থান করেন। এরপর তাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন হালিমা সাদিয়া।[২১]

নবীজির বয়স সবেমাত্র ৬ বছর। এমন সময়ে তার মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব বনু নাজ্জার গোত্রে তার মামাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মদীনা থেকে ফেরার পথে ইন্তেকাল করেন। আমিনা বিনতে ওয়াহাবকে মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি আবওয়া নামক স্থানে দাফন করা হয়। এরপর তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দাদা আবদুল মুত্তালিব।[২২] দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মুহাম্মাদের প্রতি আবদুল মুত্তালিবের যত্ন এবং ভালোবাসা বেড়ে যায় বহু গুণে—যদিও তার দাদা বেশি দিন বেঁচে ছিলেন না। নবীজির ৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন চাচা আবু তালিব। রাসূলের প্রতি তার ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা ছিলো অতুলনীয়। কিন্তু আবু তালিব ছিলেন দরিদ্র। পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্যা সংখ্যাও ছিলো বেশি। ফলে ১২

[২১] *দ্রষ্টব্য—মুসনাদে আবু ইয়ালা আল মাওসিলি: ৭১৯৩; আল-মুজামুল কাবির: ৪৫৪; মাজমাউজ জাওয়ায়িদ: ৮/২২*

[২২] *সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৬৮*

বছর বয়সী শিশু মুহাম্মাদকে জীবিকা উপার্জনের চিন্তা করতে হয়। তিনি পার্বত্য উপত্যকায় আপন চাচার মেষ চরাতে চলে যেতেন।[২৩]

সর্বজনশ্রদ্ধেয় চাচা আবু তালিবের সুরক্ষা ও যত্নের ছায়ায় বেড়ে ওঠেন নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকেই একসময় তিনি ৪০ বছর বয়সে উপনীত হন এবং নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। তাঁর জীবনে দেখা সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিলো ফিজার যুদ্ধ। তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র ১৪ বছর। হারাম মাসে সংঘটিত হয়েছিলো বিধায় এই যুদ্ধ ফিজার যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত। কুরাইশ ও তার মিত্রগণ এক দিকে, অন্য দিকে কাইস গোত্রের সঙ্গে এই যুদ্ধ লেগেছিলো। মুহাম্মাদ ﷺ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তির কুড়িয়ে এনে চাচাদেরকে সাহায্য করছিলেন।[২৪]

জাযিরার বাইরে গমন

মক্কা-মদীনার বাইরে নবী মুহাম্মাদের ﷺ সর্বপ্রথম সফর ছিলো সিরিয়ায়। ১২ বছর বয়সে তিনি চাচা আবু তালিবের বাণিজ্য সফরে সিরিয়া যান। এই সফরে এক খ্রিস্টান ধর্মযাজক আবু তালিবকে বলেন, তার ভাতিজা মুহাম্মাদ নবী হবেন। তাওরাতে এ-ব্যাপারে স্পষ্ট বিবৃতি এসেছে।

মুহাম্মাদ ﷺ বাল্যকাল থেকেই সততা ও বিশ্বস্ততায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ-জন্য সাইয়েদা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ তার সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব মুহাম্মাদের ﷺ হাতে সঁপে দেন। খাদিজার দাস মাইসারাকে সাথে নিয়ে বাণিজ্য করতে মুহাম্মাদ ﷺ সর্বপ্রথম সফর করেন ইয়েমেনের হুবাশা বাজারে। সেখান তিনি প্রচুর পরিমাণে লাভবান হন। ফলে তার প্রতি বিশ্বাস আরও বেড়ে যায় খাদিজার। পরবর্তী সময়ে বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়া গমন করেও বেশ লাভবান হন। তখন মুহাম্মাদের ﷺ বয়স ছিলো ২৫ বছর।

নবী মুহাম্মাদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ তাকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। খাদিজাও ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে সম্মানিতা, নিষ্ঠাবান ও সতী রমণী। খাদিজার বয়স ৪০ আর মুহাম্মাদের বয়স

[২৩] দ্রষ্টব্য—*বুখারি*: ২২৬৮; *আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহিহা*, উমরি: ১/১০৬; *মাদখাল লি ফাহমিস সিরাহ*, ড. ইয়াহইয়া: ১২৪

[২৪] দ্রষ্টব্য—*সিরাতে ইবনে হিশাম*: ১/২২১; *সিরাতে হালাবিয়্যাহ*: ১/১২৭

২৬—এমন সময়ে চাচা আবু তালিব মুহাম্মাদকে খাদিজার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দেন।[২৫]

নবীজির ﷺ দীর্ঘ জীবনে উত্তম সহযোগী ছিলেন সাইয়েদা খাদিজা ؓ। কুরাইশ কর্তৃক নবীজিকে কষ্ট দেওয়ার মাত্রা যখন বেড়ে যায়, তখন খাদিজাই ছিলেন রাসূলের একমাত্র সঙ্গিনী। খাদিজা ؓ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, "যখন লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করেছে, তখন খাদিজা আমাকে বিশ্বাস করে নিয়েছে। যখন লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তখন খাদিজা আমাকে সত্যায়ন করেছে। যখন লোকেরা তাদের ধন-সম্পদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন খাদিজা আমাকে তার ধন-সম্পদের অধিকারী বানিয়েছে।" রাসূলের ﷺ সকল সন্তান খাদিজার গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছে। কেবল ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ রাসূলের ﷺ অন্য স্ত্রী মারিয়া কিবতিয়ার ؓ গর্ভে জন্ম নেয়।

নবুওয়াতপূর্ব জীবন

জাহেলি-যুগের চরম বর্বরতার মধ্যেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে অনেক হেফাজতে রেখেছিলেন। তার নবুওয়াত-পূর্ববর্তী জীবন-ব্যবস্থা লক্ষ করলেই বোঝা যায়, একটি মহান রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম চরিত্র প্রদান করে সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক করেছেন; তাকে প্রদান করেছেন ব্যতিক্রম কিছু গুণাবলি। তার সত্যবাদিতা, নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয় এবং বিশ্বস্ততা লোকদের দারুণ মুগ্ধ করেছিলো। তার সত্যবাদিতা ও চরিত্রের অসাধারণ পবিত্রতায় সকলেই বিমুগ্ধ হয়ে তাকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করে।

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে তৎকালীন কুরাইশদের মাঝে রাসূল তার অসাধারণ মেধা এবং সুচিন্তায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ইতোপূর্বে অন্য কেউ এমন গুণে গুণান্বিত ছিলো না। ফলে কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপনের সমস্যা দূরীকরণে মুহাম্মাদকেই ﷺ নির্বাচন করেছিলেন।

[২৫] *রিসালাতুল আম্বিয়া*, উমর আহমাদ উমর: ৩/২৭; *আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, আবু ফারিস: ১২২; *ফিকহুস সিরাহ*, গাজালি: ৭৫।

হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন

পবিত্র কাবাগৃহের পুনঃনির্মাণ হলে 'হাজরে আসওয়াদ' সংস্থাপন নিয়ে কুরাইশদের বিভিন্ন শাখার মাঝে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উপক্রম হয়। প্রত্যেক গোত্র চায়, তারা হাজরে আসওয়াদকে সংস্থাপন করবে। এমতাবস্থায় তাদের এক দলনেতা আবু উমাইয়া হুযাইফা বিন মুগিরা মাখজুমি এই সংঘর্ষ সমাধানে বলেন, 'যে-ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সে-ই এই হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন করবে।' এরপর নবী মুহাম্মাদই সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তখন তারা খুশি হয়ে বলে—'এই বিশ্বস্ত ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা সন্তুষ্ট। সুতরাং সে যদি এর সমাধানে এগিয়ে আসে, তা হলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই; আমরা এতে রাজি।'

নবী মুহাম্মাদের হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপনের পদ্ধতিতে তার সুচিন্তা ও তীক্ষ্ণ মেধার প্রকাশ পায়। তিনি একটি চাদর বিছানোর আদেশ দিলেন। নিজ হাতে সেই চাদরে রাখলেন হাজরে আসওয়াদ। এরপর উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে চাদরের বিভিন্ন পার্শ্ব ধরে পাথরটিকে তুলতে বললেন। যখন সবাই মিলে সেটাকে নির্ধারিত জায়গায় নিয়ে গেলো, তিনি নিজ হাতে সেটা কাবার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। এভাবে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এই সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করে মিটিয়ে দেন তাদের সংঘর্ষ।[২৬]

হিলফুল ফুযুল

হিলফুল ফুযুল (শান্তি সংঘ) নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবুওয়াত-পূর্ব সময়ে নবীজীবনের আরেকটি ঘটনা হলো হিলফুল ফুযুল সংঘ প্রতিষ্ঠায় অংশ নেওয়া। সভায় উপস্থিত ছিলেন কুরাইশদের প্রধান নেতৃবৃন্দ। এই সংঘের মূল লক্ষ্য ছিলো ছিলো মক্কার অভ্যন্তরে যে-কোনো নিপীড়িতের সহযোগিতা করা এবং নিপীড়ককে প্রতিহত করা—মজলুম মক্কাবাসী হোক কিংবা মক্কার বাইরের, তার দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে না। এই হিলফুল ফুযুল বা শান্তি-সংঘের প্রতি সন্তোষজ্ঞাপন রাসূল ﷺ নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর বলতেন, 'যদি ইসলাম আসার পরেও আমাকে এমন কোনো সংঘের দিকে আহ্বান করা হতো, তাতে আমি সাড়া দিতাম'।[২৭]

[২৬] দ্রষ্টব্য—*বুখারি*: ১৫৮২; *রিসালাতুল আম্বিয়া*: ৩/২৯-৩০।
[২৭] দ্রষ্টব্য—*আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*: ১/২১৩; *ফিকহুস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ*: ১১০।

নবুয়তপ্রাপ্তির সময় ঘনিয়ে এলে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদের ﷺ মনে নির্জনতার প্রতি অনুরাগ তৈরি করে দেন। ফলে তিনি নির্জনে নিঃসঙ্গ ও একাকী থাকতে ভালোবাসতে শুরু করেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং নির্জনতার জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ স্থান ছিলো মক্কায় অবস্থিত গারে-হেরা বা হেরা গুহা।[২৮]

নবুওয়াতপ্রাপ্তি

মুহাম্মাদের ﷺ বয়স ৪০ পূর্ণ হলে হেরা গুহায় একাকী ইবাদতে মগ্ন তাঁর কাছে জিবরিল ﷺ ওহী নিয়ে আসেন। দিনটি ছিলো ৬০৯ সালের রমযান মাস। কোনো রকম ভূমিকা ছাড়াই জিবরিল ﷺ নবী মুহাম্মাদকে পড়ার আদেশ করেন; তখন নবী মুহাম্মাদ ﷺ ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' জিবরিল ৩ বার এভাবে পড়ার আদেশ করে চতুর্থবার বললেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا
لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

> পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।
>
> সূরা আলাক: আয়াত ১-৫

[২৮] জাহেলি-যুগে আরব-সমাজের অন্যায়, অবিচার প্রতিরোধ করার জন্য হিলফুল ফুজুল গঠিত হলেও মহানবীর ﷺ নেতৃত্বে* গঠিত এ-সংগঠনটির শিক্ষা সর্বকালের, সর্বসমাজের যুবকদের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা ও পথনির্দেশক হয়ে রয়েছে। বর্তমান যুগে জাহেলি-যুগের মতো কলুষিত সমাজ পরিলক্ষিত না হলেও পৃথিবীর সব দেশে, সব সমাজেই এখনো বহু অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য রয়ে গেছে। এখনো সমাজে বহু মানুষ নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এখনো সমাজে হত্যা, নারী নির্যাতন, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি অসামাজিক কাজ কম-বেশি প্রচলিত রয়েছে। হিলফুল ফুযুলের মতো সংগঠিত হয়ে যুবসমাজ আজও সমাজের সব অন্যায় প্রতিরোধ করে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

* এটি নবীজির তৈরি-করা সংগঠন নয়। আরব-নেতারা এটি করেছিলো। তিনি তাতে মেহমান হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে এই অংশগ্রহণ করাটাও কম বুদ্ধিদীপ্ততার কথা নয়। কারণ, অনেকেই এটির সমালোচনাও করেছিলেন।—সম্পাদক

নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, 'আমি এভাবেই পড়লাম। এরপর আমাকে রেখেই জিবরিল ﷺ চলে গেলেন। মনে হলো, তিনি আমার অন্তরে একটি কিতাব দিয়ে গেলেন।'

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রী খাদিজার ﷺ কাছে কেঁপে কেঁপে এলেন। তার সাথে ঘটিত বিষয়গুলো খাদিজাকে ﷺ বললেন। খাদিজা বললেন, 'আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে খাদিজার প্রাণ, আমি প্রত্যাশা করছি, আপনি এই উম্মতের নবী হবেন।'

খাদিজার ﷺ তীক্ষ্ণ মেধা এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি তার স্বামী মুহাম্মাদের ﷺ সাথে ঘটে-যাওয়া বিষয়কে শয়তানের কর্মকাণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে দেয়নি। এ-জন্যে তিনি ঘটনার বাস্তবতা জানতে কোনো গণক ও জ্যোতিষীর কাছে না-গিয়ে এমন এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে যান, যিনি মূর্তিপূজা করেন না এবং যিনি তাওরাত ও ইনজিল পাঠ করেন। তিনি হলেন তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফাল।

খাদিজা ﷺ ওয়ারাকা বিন নওফালের কাছে মুহাম্মাদের সাথে-ঘটা সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করেন। ওয়ারাকা তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে বললেন, 'তুমি যদি সত্য বলে থাকো খাদিজা, তা হলে শোনো—যে-ওহী নবী-রাসূলদের কাছে প্রেরিত হয়, তাঁর কাছে সে-ওহীই প্রেরিত হয়েছে। তিনি এই জাতির নবী হবেন; সুতরাং তুমি তাঁকে বলো, তিনি যেন তার কাজকর্মে অটল থাকেন।' [২৯]

আল্লাহর পথে দাওয়াত

অতঃপর নবীজীর ﷺ ওপর নতুন করে ওহী অবতীর্ণ হতে শুরু করে। তিনি আল্লাহর পথে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন। তবে প্রাথমিক অবস্থায় নবীর দাওয়াতি কার্যক্রম কিছুটা গোপনেই চলতে থাকে।

তিনি দীর্ঘ তিন বছর গোপনে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই অল্প সময়ে সংখ্যায় অল্প অথচ মানের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিছু মানুষ নবীজির প্রতি ইমান আনেন। তাদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য: তাঁর স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, আলি বিন আবি তালিব, আবু বকর সিদ্দীক, নবীজির আজাদকৃত

[২৯] দ্রষ্টব্য—*মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ*, সাদেক উরজুন: ১/৪৬৯; *আল মুখতার মিন কুনুজিস সুন্নাহ*: ১৯; *তাফসিরে ইবনে কাসির*: ৪/৫২৮; *ফি জিলালিল কুরআন*, সাইয়েদ কুতুব: ৬/৩৯৩৬; *আত তারিখুল ইসলামি*, হুমায়দি: ১/৬৯।

ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসা, উসমান বিন আফফান, যুবায়ের বিন আওয়াম, আবু উবায়দা আমির বিন জাররাহ, সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, আবদুর রহমান বিন আওফ এবং আরকাম বিন আবুল আরকাম প্রমুখ।[৩০]

শুরুর দিকে কুরাইশরা নবী মুহাম্মাদের আনীত নতুন ধর্মের খবর জানা সত্ত্বেও কোনো গুরুত্ব দেয়নি; কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করেনি তার দাওয়াতি কার্যক্রমে। কারণ, নবী মুহাম্মাদ তখনো পর্যন্ত তাদের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদকে তার প্রকাশ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম চালাতে আদেশ করেন, তখন কুরাইশরা তার ধর্মের প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করে। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রকাশ্যে প্রথমে তার স্বগোত্রের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করতে আদেশ দেন। আল্লাহ বলেন:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

> আর আপনি আপনার পরিবার-পরিজন এবং নিকটাত্মীয়দের (আল্লাহর) ভয় প্রদর্শন করুন। সূরা শুরা: আয়াত ২১৪

নবী মুহাম্মাদ ﷺ সর্বপ্রথম বনু আবদুল মুত্তালিব গোত্রের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন। তাদের মধ্য থেকে তার চাচাতো ভাই আলি বিন আবি তালিব ছাড়া কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি। আবার কেউ তাকে মন্দ কিছুও বলেনি। ব্যতিক্রম ছিলো চাচা আবু লাহাব। সে তার দাওয়াতকে মারাত্মকভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।[৩১]

ইসরা ও মিরাজ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

---

[৩০] দ্রষ্টব্য—*সিরাতে ইবনে হিশাম*: ১/২৪৬; *আল-মারআ ফি আহদিন নাবি*: ৪২; *দিরাসাতুন তাহলিলিয়্যাহ লি শাখসিয়্যাতির রাসূল*: ১৯১; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, আবু শাহবা: ১/২৮৪; *দাওলাতুর রাসূল*: ২১২।

[৩১] দ্রষ্টব্য—*বুখারি*: ৪৭৭০; *মুসলিম*: ৩৪৮; *আল-হারবুন নাফসিয়্যাহ জিদ্দাল ইসলাম*;. আবদুল ওয়াহহাব: ১২১; *আল-গুরাবাউল আওয়ালুন*: ১৬৭।

> পবিত্র মহান সে-সত্তা, যিনি তার বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল-মাসজিদুল হারাম থেকে আল-মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত—যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।
>
> সুরা বনি ইসরাইল: আয়াত ১

আল্লাহর নির্দেশে নবী মুহাম্মাদ ﷺ মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে এক রাতে বুরাক বাহনযোগে ভ্রমণ করেছিলেন। এটা ছিলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ এক কুদরত। ফলে তিনি যেভাবে চেয়েছেন, তাঁর বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁকে আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শন দেখানো। [৩২]

কুরাইশদের বিরোধিতা

কুরাইশরা যখন বুঝতে পারলো, নবীজীর ﷺ আনীত এই দাওয়াত তাদের পৌত্তলিকতার ভিত্তিকে গুঁড়িয়ে দিবে এবং নবীজী ﷺ তাঁর এই দাওয়াতের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অবিচল—তাদের কোনো কথা কিংবা কাজকে পাত্তা দিচ্ছেন না, তখন কুরাইশরা তাদের একটি দলকে পিতৃব্য আবু তালিবের কাছে খবর দিয়ে পাঠায়—যেন আবু তালিব নবী মুহাম্মাদকে তার দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা এবং তাদের মূর্তির ইজ্জতহানি থেকে বাধা দেন।

আবু তালিব নবী মুহাম্মাদকে ডাক দিয়ে উপদেশস্বরূপ বললেন, 'ভাতিজা আমার, আমাকে এবং তোমার নিজেকে বেঁচে থাকতে দাও। আমি যে-বিষয়ে অক্ষম, তা আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ো না।' নবী ﷺ উত্তরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ—হে চাচা, তারা যদি এই দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করার শর্তে আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র রাখে, তবুও তা বন্ধ করা সম্ভব নয়।'

রাসূলের এই এক কথাই আবু তালিবকে দেওয়া কুরাইশদের সেই আবেদন এবং সতর্কতা ভুলিয়ে দিতে যথেষ্ট ছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী মুহাম্মাদকে ﷺ এ-কথা বলতে বাধ্য হলেন, 'তুমি তোমার পছন্দমতো কথা বলে যাও এবং তোমার এই দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাও।'

---

[৩২] দ্রষ্টব্য—*বুখারি*: ৩৮৮৭; *মুসলিম*: ৩৫৯; *আশ শিফা*, কাজি ইয়াজ: ১/১০৮; *আত-তারিখুল ইসলামি*, হুমায়দি: ৩/৩৮।

হাবশায় হিজরত

কুরাইশরা নবীর এই দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করতে চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছিলো। তাদের মধ্য থেকে এই বিরোধিতায় শীর্ষে ছিলো আবু লাহাব, আবু জাহল, এবং আবু সুফিয়ান প্রমুখ।

বারবার নবীকে দাওয়াতি কার্যক্রমে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়ে তারা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। ফলে নবী মুহাম্মাদ ﷺ সাহাবীদেরকে কুরাইশদের যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য হাবশায়[৩৩] হিজরত করার আদেশ করে বলেন, 'তোমরা হাবশায় চলে যাও। কারণ, সেখানে এমন একজন রাজা রয়েছেন, যার কাছে কেউ জুলুমের শিকার হয় না; তখন—নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে একদল সাহাবী হাবশায় হিজরত করেন।

এ-দিকে হিজরত-করা সাহাবীদের ফিরিয়ে দেওয়া অথবা তাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে কুরাইশরা একটি প্রতিনিধিদল পাঠায় বাদশা নাজ্জাশির কাছে। আবেদনে সাহাবীদের ব্যাপারে মিথ্যা রটানো হয় যে, তারা হযরত ঈসার ﷺ ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। নাজ্জাশি কুরাইশদের এ-কথা বিশ্বাস করেননি; বরং তিনি আশ্রয় প্রদান করলেন সাহাবীদেরকে। সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন তার সামনে সূরা মারইয়াম তিলাওয়াত করলে তিনি তাদের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। সাহাবীরা সপ্তম হিজরি পর্যন্ত হাবশায় অবস্থান করেন। সপ্তম হিজরিতে জাফর বিন আবু তালিবের ﷺ নেতৃত্বে তারা হাবশা থেকে ফিরে আসেন। একই সময় মুসলমানদের হাতে খাইবার বিজয় হয়। হাবশা থেকে তাদের নিরাপদে ফিরে আসা এবং মুসলমানদের হাতে খাইবার বিজয় একই সময়ে হওয়ায় সাহাবীদের মাঝে আনন্দ-উল্লাসের সীমা ছিলো না।[৩৪]

কুরাইশদের প্রবল বাধা ও তীব্র হুমকি

ইসলামের দাওয়াতি পরিক্রমা রুখতে কুরাইশদের তৎপরতা দিনদিন বেড়েই যাচ্ছিলো। অপরদিকে বৃদ্ধি পচ্ছিলো মুসলমানদের সংখ্যাও। দুইজন বিশেষ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ দ্বারা আরও সুদৃঢ় হয় ইসলামের শক্তি। কারণ, কুরাইশদের মাঝে এই

[৩৩] বর্তমানে আফ্রিকার ইথিউপিয়া নামক দেশ।

[৩৪] দ্রষ্টব্য—*সহিহ মুসলিম*: ৩/১৩৯২; *মুসনাদে আহমদ*: ১৭৪০; *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ১/৩৯৮; *ফাতহুল বারি*: ৬/২৩৭; *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, তাবারি: ২/৩২৮।

দুই ব্যক্তির ছিলো যথেষ্ট প্রভাব। একজন হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব ﷺ, অপরজন উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ।

এরপর তারা মুসলমানদেরকে বয়কট করার ষড়যন্ত্র করে। কুরাইশদের সাথে শাখা-গোত্র বনু হাশেম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের মাঝে এবং মুসলমানদের মাঝে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব ধরনের লেনদেন নিষেধাজ্ঞার ওপর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে সকল মুসলিমরা ভয়াবহ বিপর্যয়ের শিকার হন। তবে কিছু কিছু কুরাইশ এই ঘৃণ্য চুক্তির বিরোধিতা করে এবং এটা শেষ করার জন্য কাজ করে। অবশেষে তিন বছর পরে এটার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ-দিকে মক্কাবাসী কিংবা মক্কাতে বহিরাগত যার সাথেই রাসূলের সাক্ষাৎ হতো, তাকেই তিনি আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন। তার দাওয়াতি কার্যক্রম দিনদিন ফলপ্রসূ হচ্ছিলো। কিন্তু নবুওয়াতের দশম হিজরিতে একই সাথে ঘটে দুটি বড় বিপদ। এই বিপদ দুটি রাসূলের ﷺ ওপর প্রভাব ফেলে প্রবলভাবে। দুটি মসিবতের একটি ছিলো—তার সাথে দুঃখ-কষ্টে সর্বদা সঙ্গীনি হয়ে-থাকা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের ইন্তেকাল। খাদিজার ইন্তেকালের ৪০ দিন পর পিতৃব্য আবু তালিবের ইন্তেকাল ছিলো দ্বিতীয় মসিবত। আবু তালিবের মৃত্যুর পর নবীজির ﷺ ওপর কুরাইশরা ঝড়ের মতো লাফিয়ে পড়ে। কুরাইশদের নির্বোধেরা অসম্ভব কষ্ট দেয় রাসূলকে। যে-দিকে ইঙ্গিত করে স্বয়ং রাসূল ﷺ বলতেন, 'আবু তালিবের ইন্তেকালপূর্ব পর্যন্ত কুরাইশরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।'[৩৫]

কুরাইশদের-দেওয়া কষ্টে রাসূল ﷺ বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার কওমকে হিদায়াত দান করুন—তারা বোঝে না।

মক্কায় কুরাইশ কর্তৃক রাসূলকে নির্যাতন-নিপীড়নের পরিমাণ বেড়ে গেলে তিনি তায়েফ গমন করেন। তায়েফের প্রধান নেতৃবৃন্দদেরকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তাকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান করেন; কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাকে কোনো সহযোগিতা তো করেই না, বরং পাথর নিক্ষেপ করে চরমভাবে নির্যাতন করে।[৩৬]

---

[৩৫] দ্রষ্টব্য—*ফাতহুল বারি*: ৭/১৯৪; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস-সাহিহা*, উমরি: ১/৮৪।

[৩৬] দ্রষ্টব্য—*রুহুল মাআনি*: ১০/৮৯; *তাবাকাতে ইবনে সাআদ*: ১/২২১; *ফাতহুল বারি*: ৪/৩৭৩।

আকাবার প্রথম বাইআত

রাসূল ﷺ তায়েফ থেকে ফিরে এসে মুতইম বিন আদির সহযোগিতায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। রাসূল ﷺ এবং তার সাহাবীদের ওপর কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতন তখন চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের এই জুলুম-নির্যাতনের কারণে বন্ধ করেননি তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম। সীমাহীন বিপদগ্রস্ত আর নির্যাতনের শিকার হয়েও বেড়েই চলছিলো তার দাওয়াতি কাজের গতি।

৬২১ সালে একদিন রাসূল তাঁর অভ্যাসমতো হজের মৌসুমে হাজিদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বের হন। তার সাথে সাক্ষাৎ হয় মদীনা থেকে আগত আউস এবং খাজরাজ গোত্রের কিছু ব্যক্তির সাথে। তারা রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রেখে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদীনায় তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাদানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ থেকে বাইআত গ্রহণ করে। এই বাইআত মিনার অভ্যন্তরে আকাবা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো।

মুসআব বিন উমাইরের প্রতিনিধিত্ব

৬২১ সালে ইয়াসরিব থেকে আগত দলটি রাসূলের ﷺ হাতে বাইআত গ্রহণের পরে (যা আকাবার প্রথম বাইআত নামে প্রসিদ্ধ) রাসূল এই নওমুসলিম দলকে ইসলামি বিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসআব বিন উমাইর বিন হাশেম বিন আবদে মানাফকে ؓ প্রতিনিধি বানিয়ে তাদের সাথে পাঠান। মুসআব ؓ ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য সাহাবী। তিনি হাবশার প্রথম মুহাজিরদের একজন। পরবর্তী সময়ে বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন।[৩৭]

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত

আকাবার প্রথম বাইআতের পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে মদীনা থেকে আনসারি ৭৫ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা আকাবা নামক স্থানে একত্রিত হয়। নবী ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করবেন, তখন তাঁকে নিরাপত্তা এবং হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তারা নবীজির ﷺ কাছে বাইআত গ্রহণ করে। এই বাইআতকে ৬২২ সালে ঘটিত আকাবার দ্বিতীয় বাইআত বলা হয়।[৩৮]

---

[৩৭] দ্রষ্টব্য—*আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, আবু শাহবা: ১/৪৪২।

[৩৮] দ্রষ্টব্য—*মুসনাদে আহমদ*: ১৪৪৫৬, ২২৭০০; *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ২/৬১।

মদীনায় হিজরত

আকাবার বাইআতের পর রাসূল ﷺ তার সাহাবীদের মদীনায় হিজরত করার আদেশ দেন। সাহাবীরা গোপনে হিজরতে বের হন মদীনা অভিমুখে। তবে উমর ইবনুল খাত্তাব ؓ কাবা তাওয়াফের পরে প্রকাশ্যেই বের হন হিজরতে। মুশরিকদের প্রতি প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন—কারও যদি সাহস থাকে তবে যেন তার পিছু নেয়।[৩৯]

এ-দিকে, কুরাইশরা নবীজিকে ﷺ হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে 'দারুন নদওয়া'-তে সমবেত হয়। কুরাইশ-নেতারা এ-ব্যাপারে একমত হয় যে, কুরাইশ গোত্রের প্রতিটি শাখা-গোত্র নবী-হত্যায় শরিক থাকবে। প্রত্যেক গোত্র একজন করে যুবক নির্ধারণ করবে। তারা সবাই এক যোগে সম্মিলিতভাবে মুহাম্মাদকে হত্যা করবে। এতে করে সকল গোত্র তার হত্যায় সমানভাবে দায়ী হবে। ফলে বনু হাশেম তাদের সবার সঙ্গে যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে যাবে এবং তার রক্তপণ গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের এই কূটচাল বিনষ্ট করে দিলেন।

যে-রাতে কুরাইশরা নবীজিকে ﷺ হত্যা করার চেষ্টা করে, সে-রাতে তিনি আবু বকরের ؓ সাথে মক্কা ছেড়ে মদীনা অভিমুখে হিজরতের জন্য রওনা করেন। এ-সময়ে তিনি তার চাচাতো ভাই আলি বিন আবি তালিবকে ؓ তার বিছানায় রেখে যান। কুরাইশরা নবীজিকে ﷺ ধরার জন্য সব রকমের কোশেশ শুরু করে। যে নবীজিকে ﷺ জীবিত অথবা মৃত ধরে নিয়ে আসতে পারবে, তার জন্য কুরাইশ-নেতারা একশো উটনী পুরস্কারের ঘোষণা করে। কিন্তু বিফলে যায় তাদের এই ষড়যন্ত্র এবং নবীকে হত্যার চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ৩ দিন হেরা গুহায় গুপ্ত থাকার পরে নবী ﷺ এবং আবু বকর ؓ চলে যান মদীনার কাছাকাছি। দীর্ঘ ১১ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এক বিপদজনক সফরের মধ্য দিয়েই তারা পৌঁছেন ইয়াসরিব-উপকণ্ঠে কুবা নামক গ্রামে। কুবাতে তারা ৪ দিন অবস্থান করেন। এখানে অবস্থানকালেই নবী মুহাম্মাদ কর্তৃক ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হয়।[৪০]

---

[৩৯] দ্রষ্টব্য—*তাবাকাতে ইবনে সাদ*: ১/৩২৫; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস-সাহিহা*, উমরি: ১/২০২; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, আবু শাহবা: ১/৪৬১।

[৪০] দ্রষ্টব্য—*বুখারি*: ৩৯০৫, ৩৬৫৩; *তিরমিজি*: ৩৯২৫; *মুসনাদে আহমদ*: ৩২৫১; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনে কাসির: ২/২৩৩; *খাতামুন নাবিয়্যিন*, আবু জাহরা: ১/৬৫৯; *তাফসিরে আবুস সাউদ*: ৯/৬০; *আল-হিজরাতুন নাবাবিয়্যাহ আল মুবারাকা*: ১০৪-১০৬।

৬২২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৭ রবিউল আউয়াল জুমার দিনে ইয়াসরিববাসী রাসূলকে ﷺ সাদর সম্ভাষণ জানাতে বের হয়। ইয়াসরিবের এই দিনটি ছিলো ইতিহাসে দৃষ্টান্তহীন। এখানে পৌঁছে নবী ﷺ আবু আইয়ুব আনসারির রা. ঘরে অবস্থান করেন।

ইতিহাসের এই দিনকে কেন্দ্র করেই মদীনার পূর্ববর্তী নাম ইয়াসরিব থেকে দারুল হিজরত বা মদীনা নামে পরিবর্তিত হয়। যারা মদীনায় হিজরত করেন, তারা লাভ করেন মুহাজির উপাধি। মদীনার আউস এবং খাজরায গোত্রীয় যারা নবীজিকে ﷺ এবং সাহাবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, তারা লাভ করেন আনসারি উপাধি।

মদীনার মসজিদ নির্মাণ

ইয়াসরিব তথা মদীনায় পৌঁছার পরপরই নবী ﷺ মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। মসজিদ নির্মাণকাজে সহযোগিতা করেন মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ। মসজিদের নির্মাণ-কাজ সম্পূর্ণ হলে রাসূল ﷺ এক টুকরো মাটি এবং পাথর নিয়ে উত্তরের একটি প্রাচীর ঘেঁষে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে কিবলা তৈরি করেন; কিন্তু নবী ﷺ মদীনায় আসার ১৮ মাস পর মহান আল্লাহ তাআলা তার কিবলা মসজিদে হারামের অভিমুখে করার আদেশ দেন; তখন থেকেই সকল মুসলমানদের জন্য পবিত্র কাবা স্থায়ী কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হয়।[৪১]

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মদীনায় আগমনের পর নবীজির ﷺ সর্বপ্রথম কাজ ছিলো ইসলামি আইনের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এ-সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিলো আউস এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যবর্তী শত্রুতা এবং ঝগড়া-ফাসাদ।

রাসূল ﷺ তার দূরদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম মেধা দিয়ে এ-সব সমস্যা বিদূরিত করেন। এরপর তিনি ইসলামের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করতে এবং গোত্রে-গোত্রে পরস্পর বৈরিতা-বিরোধিতা দূর করতে শুরু করেন মসজিদ নির্মাণ-কাজ, যাতে তাদের অন্তর শান্ত হয় এবং তাওহিদের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পায়।

---

[৪১] দ্রষ্টব্য—*বুখারি*: ৩৯০৬; *মুসলিম*: ৫২৪; *ফিকহুস সিরাহ*, গাজালি: ১৯১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৩/৩০৩; *আত-তারিখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি*, ড. আলি মুতি: ১৫৭; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, আবু শাহবা: ২/৩৬; *আত-তারিখুল ইসলামি*, হুমায়দি: ৪/১৩।

জাহেলি-যুগের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে খুনোখুনি ও ঝগড়া-ফাসাদ দূর করতে একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হলো। মদীনায় একটি সাধারণ সম্মেলন ডাকা হলো—যেখানে সব মুসলমান ভাই-ভাইয়ে পরিণত হলেন। এই সমতা ও ভ্রাতৃত্বের সম্মেলনের পর ইসলামি সমাজে কোনো প্রকার খুন-খারাবি লক্ষ করা যায়নি। ফলে আরব-উপদ্বীপে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নেই। সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃত্ব, সবার মাঝে সৃষ্টি হয় গভীর ভালোবাসা।

মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরে ইহুদিদেরকে তাদের সকল অধিকার প্রদান করা হয় এবং তারা মুসলমানদের সাথে মদীনা থেকে শত্রুদের প্রতিহত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইহুদিরা এ-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।[৪২]

উপদেষ্টা কমিটি গঠন

বদরে কুবরা যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে রাসূল বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি গঠন করে তিনি কুরাইশদের প্রতিরোধ করতে একটি পরিকল্পনা-রেখা আঁকলেন। এরপর রাসূল ﷺ মানসিক প্রস্তুতি যাচাই করতে তাদের মতামত চাইলেন। উপস্থিত সাহাবীরা জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যা উত্তম মনে করেন, তা-ই করুন। আমরা আপনার সাথেই আছি। ওই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি আমাদের নিয়ে এই সমুদ্র অতিক্রম করেন, তা হলে আমরা আপনার সাথেই থাকবো; এমনকি আপনি যদি বারকে গিমাদে (ইয়েমেনের একটি স্থান) আমাদের নিয়ে চলেন, তবুও আমাদের কেউ আপনার থেকে পিছপা হবো না।'

সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান করতে এই পরামর্শ-কমিটি গঠন করাটা ছিলো রাসূলের উন্নত প্রজ্ঞার অনন্য নিদর্শন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটিই ছিলো রাসূলের মূলনীতি, যার ওপর ভিত্তি করে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আরব-উপদ্বীপে।

[৪২] দ্রষ্টব্য—*বুখারি*: ৬০৬৫, ২৪৪২; *মুসলিম*: ২৫৫৯; *আনসাবুল আশরাফ*, বালাজুরি: ১/২৭০; *ফাতহুল বারি*: ৭/৩০৭; *জাদুল মাআদ*: ২/৭৯।

বদর যুদ্ধ

হিজরতের পূর্বে মুসলমানদের জন্য লড়াই বা যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিলো। হিজরতের পর লড়াই এবং যুদ্ধের বৈধতা দিয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ

> যুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে—'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।'
>
> সূরা হজ: আয়াত ৩৯- ৪০

বদর যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ১৯ মাস যাবৎ মুসলমান এবং মুশরিকদের মাঝে কোনো প্রকার যুদ্ধ বা লড়াই হয়নি। শুধু মক্কা ও তায়েফের মাঝে কুরাইশদের কাফেলা প্রতিহত করতে আবদুল্লাহ বিন জাহাশের ﷺ নেতৃত্বে একটি ছোট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। সে-যুদ্ধে মুশরিকদের ১ জন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। মুশরিকদের মাঝে থেকে এটিই ছিলো সর্বপ্রথম হত্যা।

বদর মদীনা মুনাওয়ারার দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ১৬০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। শাম ও মক্কা কেন্দ্রিক সকল বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর প্রধান যাত্রাবিরতি কেন্দ্র ছিলো এটি। এখানেই মুসলমান এবং কুরাইশদের মাঝে দ্বিতীয় হিজরিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের কারণ ছিলো, কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী-কাফেলাকে অধিকার করা। কারণ, এই কাফেলার অধিকারী কুরাইশরাই এত দিন মক্কাতে মুসলিমদের সম্পদ জবরদখল করেছিলো। ভাগ্যক্রমে কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলা মুসলিমদের হাত থেকে বেঁচে যায়। বিপরীতে তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় ১ হাজার সশস্ত্র মুশরিক যোদ্ধা। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

> আর যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে, যাতে কোনো রকম কণ্টক নেই, তা-ই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন, সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে। সুরা আনফাল: আয়াত ৭

এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সৈন্যস্বল্পতা সত্ত্বেও মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিককে হত্যা করা হয়। বন্দি করা হয় অনেক মুশরিক সৈন্যকে। বন্দিকৃত বেশ কিছু মুশরিককে রাসূল ﷺ কোনো ধরনের মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেন। কিছু মুশরিককে মুক্ত করে দেন তার মুক্তিপণ নিয়ে। আবার কিছু কিছু মুশরিককে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, তারা মুসলমানদের বাচ্চাদেরকে লেখাপড়া শেখাবে।[৪৩]

বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত বণ্টন করা হয় কুরআনের আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

> তোমরা জেনে রেখো যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, রাসূলের আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য।
>
> সুরা আনফাল: আয়াত ৪১

[৪৩] দ্রষ্টব্য—*সিরাতে ইবনে হিশাম*: ২/৬১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৩/২৬০; *তাবাকাতে ইবনে সাদ*: ২/৪২; *ফাতহুল বারি*: ৭/২৯০-২৯২; *শারহুন নববি আলা সাহিহ মুসলিম*: ৬/৩৪০।

বন্দি মুশরিকদের সাথে আচরণ

নবী ﷺ সাহাবীদেরকে বন্দিকৃত মুশরিকদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও কোমল আচরণ করার নির্দেশ দেন এবং মন্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। তাদের মধ্য থেকে যারা ফিদয়া (তথা মুক্তিপণ) দিতে সক্ষম নয়, তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে বলেন। ইসলামি শরিয়তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং বন্দি মুশরিকদের সাথে মানবিক আচরণ—এমনটিই কাম্য ছিলো। শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বন্দি মুশরিকদের সাথে এমন উত্তম আচরণ ইতিহাসে নজিরবিহীন।[৪৪]

উহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের দ্বারা কুরাইশরা পরাজিত হওয়ার পর দ্বিগুণ বেড়ে যায় তাদের ক্ষোভ। মুসলমানদের দ্বারা পরাজিত হওয়ার লজ্জা মেটাতে তারা তাদের নিহতদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এরই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় হিজরিতে আবু সুফিয়ান সাখার বিন হারবের নেতৃত্বে মুসলমানদের মোকাবেলা করতে ৩ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করা হয়। অপরদিকে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো প্রায় ৭০০-এর কাছাকাছি।[৪৫]

মদীনার উত্তর অংশে অবস্থিত উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী পৌঁছে তাবু তৈরি করে নেয়। মুসলমানরা উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে একটি টিলায় অবস্থান করে। শুরু হয় কুরাইশ ও মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় যদিও মুসলমানদের সাময়িক বিজয় ছিলো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুশরিকদের দ্বারা পুনর্বার আক্রমণ তাদেরকে পরাজিত হতে বাধ্য করে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে থেকে ৭০ জন সাহাবী শহিদ হন। হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব ﷺ শহিদদের মধ্যে একজন। এ-যুদ্ধে রাসূল ﷺ আহত হন। তখন উপস্থিত সাহাবীদেরকে এ-সংবাদ দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া হয় যে, রাসূলকে হত্যা করা হয়েছে।[৪৬]

---

[৪৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৩/৩০৭; *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ*: ৬/৮৬; *মাগাজি*, ওয়াকিদি: ১/১১৯; *আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়া*: ৩/৭৪।

[৪৫] দ্রষ্টব্য—*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৪/১১; *গাজওয়ায়ে উহুদ দিরাসাতুন দাবিয়াতুন*: ৬৮; আবু ফারিস প্রণীত *গাজওয়ায়ে উহুদ*: ১৭; *আর রাহিকুল মাখতুম*: ২৫০।

[৪৬] দ্রষ্টব্য—*সহিহ মুসলিম*: ২৪৭০; *ইমতাউল আসমা*: ১/১২০; *আস-সিরাতুল হালাবিয়াহ*: ২/৪৯৭-৪৯৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৪/১৭।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ ছিলো বেশ কিছু তিরন্দায মুজাহিদ কর্তৃক রাসূলের ﷺ নির্দেশ লঙ্ঘন। রাসূলের ﷺ নির্দেশ ছিলো, জয় অথবা পরাজয় কোনো অবস্থাতেই মুসলিম তিরন্দাজ-বাহিনী যেন পাহাড়ে তাদের অবস্থান পরিত্যাগ না করে। কারণ, তাতে মুসলিম-বাহিনীর পেছনের অংশ শত্রুর জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বিজয় নিজেদের অর্জিত হয়ে গেছে মনে করে মুসলিম-বাহিনী রাসূলের আদেশ লঙ্ঘন করায় তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ-সুযোগে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। নেতার আদেশ লঙ্ঘন ও শৃঙ্খলার অভাবই ছিলো উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ। মুসলমানদের এই পরাজয়ে কুরাইশরা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কায় ফিরে যায়। এ-যুদ্ধে তাদের ২৪ জন সৈন্য নিহত হয়।[৪৭]

উহুদ যুদ্ধে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন। রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে উহুদ-প্রান্তে আগমনকালে ৩০০ মুনাফিক পেছনে সরে যায়। যুদ্ধের সেনাপতি রাসূলের ﷺ আদেশ না-মানার ফলে মুশরিক-বাহিনী কর্তৃক হঠাৎ আক্রমণ করে যে-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তাতে মুসলমানদের জন্যে বহু শিক্ষা রয়েছে।

আহযাবের যুদ্ধ

রাসূলকে ﷺ গুপ্তহত্যা করার পরিকল্পনা করে বনু নাজির গোত্রের ইহুদিরা; তাই তাদের অবরোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা মুসলমানদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে রাসূলের কাছে এই আবেদন জানায় যে, তারা দেশান্তর হবে; রাসূল ﷺ যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের ওপর কোনো অত্যাচার যেন না-করা হয়।

এ-সব ইহুদিরা খাইবারে যেতে না-যেতেই মদীনা আক্রমণ ও মুসলমানদেরকে বিনাশ করার জন্য কুরাইশদের সঙ্গে হাত মেলায়। মুশরিক-বাহিনী তাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে নাজদ এবং হিজাযের মূর্তিপূজারি বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রায় ১০ হাজার সেনাবাহিনী একত্রিত করে। রাসূলের ﷺ কাছে কুরাইশদের এই সমাগমের খবর পৌঁছুলে তাঁর নির্দেশে সালমান ফারসির رضي الله عنه পরামর্শের ভিত্তিতে মদীনার উত্তরাঞ্চলে খন্দক বা পরিখা খনন করা হয়; কুরাইশ এবং ইহুদিরা মদীনা দখল করার জন্য মদীনার বাইরে জড়ো হয়। অপরদিকে মদীনার অভ্যন্তরে বসবাসরত

[৪৭] *সহিহ বুখারি:* ৩০৩৯; *মুসনাদে আহমাদ:* ১/২৮৭।

বনু কুরাইজা গোত্রের ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে মিলিত হয় কুরাইশদের সাথে।[৪৮]

শত্রুদল মুসলমানদের ওপর ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। পাহাড়ের মতো অটল-অবিচল থেকে তারা মদীনাকে অবরোধ করে রাখে। এভাবে অবরোধ চলতে থাকে ২ মাস। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের মুখোমুখি করে এখান থেকে বিতাড়ন করেন। ফলে তারা অবরোধ ভেঙে মদীনা থেকে পালায়। তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। মুশরিক-বাহিনী মুসলমানদের দূরদর্শিতা, অত্যাধুনিক রণকৌশল এবং গোয়েন্দা-বাহিনীর কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। মুসলমানরাও তাদের অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধের কারণে নবী-যুগের এই যুদ্ধে আরব-উপদ্বীপে এক মহাবিজয় লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এই যুদ্ধে জয়ের ফলে চতুর্দিকে মুসলমানদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।[৪৯]

বনু কুরাইযার যুদ্ধ

বনু কুরাইযার যুদ্ধ খন্দক যুদ্ধের অংশবিশেষ। খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি লঙ্ঘন করে বনু কুরাইজা গোত্র কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়। কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের মাধ্যমে মদীনা শহর অবরোধ করা হলে বনু কুরাইযার ইহুদিরাও তাদের নানাভাবে সাহায্য করে। তারা মুসলমানদের ওপর বিভিন্ন দিক থেকে হামলার পরিকল্পনা করেছিলো। খন্দক যুদ্ধ সমাপ্ত হলে মুসলমানরা বনু কুরাইযা গোত্রের মুখোমুখি হয় এবং চুক্তি লঙ্ঘন করার শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে কঠিনভাবে অবরোধ করে রাখে। ফলে বনু কুরাইজা দুর্বল হয়ে যায় এবং মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ আউস গোত্রের নেতা সাআদ বিন মুয়ায ؓ বিরোধ-মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষ থেকে বিচারক নিযুক্ত করেন। সাআদ বিন মুয়ায ؓ সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যোদ্ধাকে তাদের খেয়ানত এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ হত্যা করার আদেশ দেন। এভাবেই বনু কুরাইজা গোত্রের ইহুদিদের চক্রান্ত থেকে পবিত্র ও নিরাপদ হয় মদীনা।[৫০]

---

[৪৮] *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ৩/২৩৭।

[৪৯] দ্রষ্টব্য—*জাদুল মাআদ*: ৩/২৪৯; *তারিখে তাবারি*: ২/২৮৪; *ফাতহুল বারি*: ৭/৩৩২।

[৫০] দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি*: ৪১১৯; *সহিহ আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*: ৩৭৩।

তিনটি যুদ্ধ

চতুর্থ হিজরিতে রাসূল ﷺ মদীনা থেকে আরও তিনটি যুদ্ধে বের হয়েছিলেন:

- যাতুর রিকা যুদ্ধ,
- দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ,
- দুমাতুল জান্দাল যুদ্ধ।

যাতুর রিকা যুদ্ধ

এই যুদ্ধকে যাতুর রিকা বলার কয়েকটি কারণ হতে পারে:

- মুজাহিদগণ টুকরা কাপড় জোড়া-তালি দিয়ে তাদের পতাকা তৈরী করেছিল।
- তারা নাজদের যেখানে অবতরণ করেছিলো, সেই জায়গাটা ছিলো কালো এবং সাদা রং মিশ্রিত। এ-জন্য সেই জায়গাকে যাতুর রিকা বলে নামকরণ করা হয়।
- সেই জায়গার পাথর সাহাবীদের পা জখম করে দিয়েছিলো, ফলে তাদের পায়ে পট্টি লাগানো হয়; তাই এই যুদ্ধকে যাতুর রিকা বলে নামকরণ করা হয়।[৫১]
- যাতুর রিকা নামক স্থানে গাতফানের কিছু লোক মুসলমানদের মুখোমুখি হয়, কিন্তু তাদের মাঝে কোনো ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি; বরং তারা পরস্পর ভয় পেয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ বা ভয়ের নামাজ আদায় করেন। পরে তাদের নিয়ে ফিরে আসেন মদীনায়।[৫২]

দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ

শাবান মাসে আবু সুফিয়ানের দেওয়া নির্ধারিত সময়ে বদর-প্রান্তরে রাসূল ﷺ সাহাবীদের নিয়ে বের হন। তিনি তাদের নিয়ে এখানে ৮ রাত অবস্থান করেন আবু সুফিয়ানের অপেক্ষায়—আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে বের হয়ে মিজান্না পর্যন্ত আসে। এরপর আবার ফিরে যায়। যাওয়ার সময় সে নিজ বাহিনীকে লক্ষ করে বলে, 'হে কুরাইশ গোত্র, তোমাদের একটি উর্বর বছরে যুদ্ধ করা উচিত। যে-বছর তোমরা

---

[৫১] *সহিহ বুখারি:* ৪১২৮

[৫২] দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি:* ৪১২৮; *সিরাতে ইবনে হিশাম:* ৩/২২৫; *ফিকহুস সিরাহ লিলবুতি:* ২০৭।

গাছাগাছালি ও দুধ পাবে। অথচ এ বছরটা হচ্ছে দুর্ভিক্ষের বছর। আর আমি ফিরে যাচ্ছি, সুতরাং তোমরাও ফিরে যাও। এই যুদ্ধকে দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ হিসেবে নামকরণ করা হয়।[৫৩]

দুমাতুল জান্দাল

রাসূল ﷺ মদীনায় ফিরে এসে কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করেন এবং যিলহজ মাসও প্রায় ফুরিয়ে যায়। এরপর রাসূল ﷺ দুমাতুল জান্দাল যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু তিনি সেখান পর্যন্ত পৌঁছাননি এবং কোনো লড়াইয়ের মুখোমুখি না-হওয়ায় মদীনায় ফিরে আসেন। বছরের বাকি সময় তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন।[৫৪]

হুদায়বিয়ার সন্ধি

খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভের পর নবী ﷺ দাওয়াতি কার্যক্রম গভীরভাবে পরিচালনা করতে এবং রাষ্ট্রীয় নতুন নিয়ম-কানুনগুলো বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ৬ষ্ঠ হিজরিতে সাহাবীদের উমরার জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। রাসূল ﷺ ১৪০০ সাহাবীদের নিয়ে মদীনা থেকে বের হন উমরার উদ্দেশ্যে। এই সফরে কোনো ধরনের যুদ্ধ বা লড়াইয়ের ইচ্ছা রাসূলের ছিলো না; তা সত্ত্বেও কুরাইশরা মুসলমানদের উমরা করতে বাধা দেয়। তখন রাসূল তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে ইহরামপরা অবস্থায় সফর স্থগিত করেন। এখানে মুসলমান এবং কুরাইশদের মাঝে বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা চলে। একপর্যায়ে তারা তাদের মাঝে এবং মুসলমানদের মাঝে সন্ধি-চুক্তির আবেদন করে। রাসূল ﷺ তাদের আবেদন গ্রহণ করেন; এটিই ছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধি। এই সন্ধিতে প্রধান শর্তসমূহ ছিলো নিম্নরূপ:

- মুসলমানরা এ-বছর উমরা না-করেই মদীনায় ফিরে যাবে এবং এই বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না।
- আগামী বছর উমরার জন্য এসে তারা ৩ দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবে।
- মক্কায় প্রবেশকালে মুসলিমরা কোনো ধরনের অস্ত্র আনতে পারবে না। আত্মরক্ষার জন্য কোষবদ্ধ তরবারি আনতে পারবে।

---

[৫৩] দ্রষ্টব্য—*নাদরাতুন নায়িম*: ১/৩১৮-৩১৯; *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ৩/২৩২।

[৫৪] *দিরাসাত ফি আহদিন নাবুওয়াতি লিশশুজা*: ১৪৪।

- মদীনার মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দীর্ঘ ১০ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
- কুরাইশদের কেউ মদীনায় আশ্রয় নিলে তাকে রাসূল ﷺ কর্তৃক ফেরত দিতে হবে। কিন্তু মদীনার কোনো মুসলমান মক্কায় আশ্রয় নিলে, তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।
- আরবের যে-কোনো গোত্রের লোক মুসলমানদের বা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে। তাদের ওপর সন্ধির সমস্ত শর্তাবলি পালন করা আবশ্যক হবে।

সন্ধির ফলাফল

হুদায়বিয়ার সন্ধি রাসূল ﷺ এবং তার দাওয়াতি কার্যক্রমের জন্য বড় সহায়ক ছিলো। তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

- হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য ছিলো একটি বিরাট বিজয়। কেননা, এর মাধ্যমে উভয় পক্ষ পরস্পরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলো। এতে উভয় পক্ষের লোকেরা একে অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সঙ্গে মিশতে সক্ষম হয়। ফলে কুরাইশদের অনেকেই ইসলামের বাস্তবতা সঠিকভাবে বুঝে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়।
- মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের আক্রমণ স্থগিত হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের খাইবার, ওয়াদিল কুরা, ফাদাক ও তাইমা ইত্যাদি অঞ্চলে ইহুদিদের বিশৃঙ্খলার সমাপ্তি ঘটানোর সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়।
- আরব-বিশ্বের আনাচে-কানাচে রাসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন রাজা-বাদশার কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সাহাবীদের পাঠান।
- কুরাইশ মুসলমানদের কিছু যুবক মক্কা থেকে পলায়ন করে মদীনায় অবস্থানের ইচ্ছা করে; কিন্তু রাসূল ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে তাদেরকে মদীনায় অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করেননি। তখন তারা মক্কা ও শামের মাঝে কুরাইশদের বাণিজ্যিক পথ বন্ধ করে দেয়। তাদের বিভিন্ন তেজারতি কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানো শুরু করে। তখন কুরাইশরা নবীজির ﷺ কাছে পুনরায় আবেদন করে বলে—মক্কা থেকে কেউ মদীনায় এলে নবীজী

তাকে আশ্রয় দিতে পারবেন না—এই শর্ত তারা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ফলে এখন থেকে কেউ মদীনায় এলে মদীনাতেই থাকবে! এটা তারা করেছিলো শামে তাদের বাণিজ্যিক পথ সুগম করতে। রাসূল ﷺ তাদের এই আবেদনও মেনে নেন।

রাজা-বাদশাদের রাসূলের দাওয়াত

মুসলমান এবং কুরাইশদের মাঝে সন্ধি চলাকালীন রাসূল ﷺ বিভিন্ন রাজা-বাদশা এবং আমির-উমারাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদান করেন। এ-সব রাজা-বাদশাদের মধ্যে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য-রাজা কিসরা, মিশরে রোমান গভর্নর মুকাওকিস এবং ইয়েমেনে কিসরার প্রতিনিধি বাযান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

রাসূল ﷺ এ-সব বাদশার কাছে পৃথক পৃথক দূত পাঠিয়েছেন। ফলে দাওয়াতপ্রাপ্ত বাদশাদের প্রতিক্রিয়া ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। বাদশা কিসরা নবীজির দাওয়াতি চিঠি পেয়ে রাগে তা না পাঠ করেই ছিঁড়ে ফেলে। হিরাক্লিয়াস চিঠি সুন্দরভাবে গ্রহণ করে এবং এই দাওয়াতি চিঠির দূতকে সম্মান করে। এমনকি মুকাইকিসও রাসূলের এ-দাওয়াতি চিঠির সুন্দর জবাব দেয়। আর বাযান ইয়েমেনে পারস্যের কিছু অধিবাসীকে নিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

খাইবার বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূল ﷺ যে-কাজ সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তা হলো, খাইবার শহরে ইহুদিদের রাজত্ব নিশ্চিহ্ন করা। ইহুদিরা খাইবারকে মূল ঘাঁটি বানিয়ে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাতে চেষ্টা করেছিলো। খন্দক যুদ্ধে কুরাইশদের দলে যোগ-দেওয়া অন্যতম গোত্র ছিলো খাইবারের ইহুদি গোত্র। দীর্ঘ ২ মাস যুদ্ধ-লড়াই করে মুসলমানরা খাইবারে বিজয় লাভ করে। খাইবার বিজয়ের সাথে সাথে ইহুদিদের অন্য সব উপশহর তথা ফিদাক, ওয়াদিল কুরা এবং তায়মা ইত্যাদি মুসলমানদের দখলে চলে আসে—শেষ পর্যন্ত দুর্লভ হয়ে যায় ইহুদিদের অস্তিত্ব।[৫৫]

[৫৫] *তাবাকাতে ইবনে সাদ* ২/১০৬; *তারিখে দিমাশক লিইবনে আসাকের*:১/৩৩; *জাদুল মাআদ*: ৩/৩৫৪-৩৫৫।

কাযা উমরা

রাসূল ﷺ খাইবার থেকে ফিরে এসে ৭ম হিজরির যিলকদ মাসে সাহাবীদের নিয়ে ইহরাম বেঁধে মক্কার উদ্দেশে রওনা হন। কুরাইশ-বাহিনী রাসূলের আগমনের খবর পেয়ে হুদায়বিয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ শর্তাবলি বাস্তবায়ন করতে মক্কা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করেন। হারাম শরিফের তাওয়াফ করেন। তাওয়াফের সময় তারা বলছিলেন—'এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর ওয়াদা সত্য হয়েছে। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং তিনি একাই আহযাব তথা কুরাইশ দলকে পরাজিত করেছেন।'

রাসূল ﷺ মক্কায় ৩ দিন অবস্থান করে তাঁর সাহাবীদের মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ফলে সবাই চতুর্থ দিনে মদীনায় রওনা হন।

মুতার যুদ্ধ

তৎকালীন শামের শাসক হারিস বিন আবু শিমর গাসসানির কাছে রাসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠান। সে রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তার লোকজন রাসূলের প্রেরিত দূতকে হত্যা করে। এ খবর পেয়ে রাসূল ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাদের বিরুদ্ধে যায়েদ বিন হারেসার ؓ নেতৃত্বে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সাহাবীদের উদ্দেশে বলেন, 'যদি যায়েদ নিহত হয়, তা হলে মুসলমান-বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে জাফর বিন আবু তালিব এবং যদি জাফরকেও হত্যা করা হয়, তা হলে নেতৃত্ব দেবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা; এরপর নেতৃত্বের বিষয়টি মুসলমানদের পরামর্শের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।'[৫৬]

অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে যায়েদ তার কিছু বাহিনীসহ মুতায় পৌঁছেন। বিপরীতে শত্রুদল রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো প্রায় ১ লক্ষ। এই মুতা নামক স্থানে মুসলমান ও রোমানদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সাহসী সেনাপতি যায়েদ বিন হারেসা ؓ শহিদ হন। তার হাত থেকে পতাকা মাটিতে পড়ার আগেই জাফর বিন আবু তালিব তা নিজ হাতে নেন; তিনিও যথেষ্ট সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যান। এরপর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা হাতে নেন; তিনিও যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যান। তৎক্ষণাৎ মুসলমানরা সাহসী

[৫৬] তারিখে তাবারি: ৩/১০৩।

সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতি হিসেবে নির্বাচন করে। পরবর্তী দিন ভোরে রোমান-বাহিনী আক্রমণ করার আগেই খালিদ তার বাহিনী নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। বস্তুত এ-যুদ্ধে খালিদ মুসলিম-বাহিনী নিয়ে (পিছু হটে) ফিরে এলেও যতটা শৃঙ্খলা ও নিপুণতার সঙ্গে তারা কাজটি করেছিলেন সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা ছিলো একটি বিরল ঘটনা। এই প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি তার মেধা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে মুসলমান সৈন্যদল থেকে ১০ গুণ বেশি রোমান-বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের জান-মাল রক্ষা করতে সক্ষম হন।[৫৭]

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর কুরাইশদের মিত্র গোত্র ছিলো বনু বকর এবং মুসলমানদের মিত্র-গোত্র ছিলো খুযাআ। এ-দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বশত্রুতা ছিলো। বনু বকর কুরাইশদের সহযোগিতা নিয়ে খুযাআ গোত্রের ওপর হামলা করে। এভাবে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশরা বনু বকরকে অস্ত্র দিয়ে [illegible] প্রতিকারে খুযাআ গোত্র মদীনার মিত্র মুসলমানদের সাহায্য [illegible] বিজয়ের উদ্দেশ্যে সমস্ত মুসলমানকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। ১০ হাজার সৈন্য সমবেত হয় রাসূলের কাছে। অষ্টম হিজরির রমযান মাসে তিনি সৈন্যদল নিয়ে মদীনা থেকে বের হন। তখনো মুসলমানরা জানতো না যে, রাসূল তাদের নিয়ে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন।[৫৮]

আবু সুফিয়ান সন্ধি নবায়নের আশায় মদীনায় এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে যান। মুসলমানরা যখন মক্কার কাছাকাছি আসে, তখন আবু সুফিয়ান মুসলমানদের অবস্থা জানতে মক্কা থেকে বের হন। তিনি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের মুখোমুখি হলে আব্বাস তাকে নিয়ে আসেন রাসূলের কাছে। রাসূল তাকে নিরাপত্তা দান করেন। আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করে। খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন দল ছাড়া অন্য কোনো দলের সাথে কোনো ধরনের লড়াই সংঘটিত হয়নি।

[৫৭] দ্রষ্টব্য—*সিরাতে ইবনে হিশাম*: ৪/২৮; *ইমতাউল আসমা*: ১/৩৪৮-৩৪৯।

[৫৮] *মাগাজি*, ওয়াকিদি প্রণীত: ২/৭৮১-৭৮৪; *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ৪/৩৯; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৪/২৭৮।

মক্কায় প্রবেশকালে রাসূল ঘোষণা করে বলেন, 'যে হারাম শরিফে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদে থাকবে। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে, সেও নিরাপদে থাকবে।' এভাবে মক্কায় মুসলমানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূর্তি ভাঙচুর

রাসূল ﷺ সাহাবাদের নিয়ে কাবা শরিফ ৭ বার তাওয়াফ করার পর সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলার আদেশ দিয়ে বলেন:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

> বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হতে বাধ্য। সুরা বনি ইসরাইল: আয়াত ৮১

এরপর কাবার ওপর আরোহণ করে বেলাল ﷺ আজান দিলে মুসলমানরা নামায আদায় করেন। এরপর নবী ﷺ নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন:

> "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সকল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন।"

এরপর কুরাইশদের সম্বোধন করে বলেন:

> "কুরাইশ লোকসকল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে জাহেলি-যুগের সকল অহংকার এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ-সম্পর্কিত সকল গরিমা রহিত করেছেন; কারণ, সব মানুষ আদমের উত্তরসূরি। আর আদম ছিলেন কাদামাটির তৈরি।"

তিনি তিলাওয়াত করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

> হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও

> গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী।
>
> সুরা হুজরাত: আয়াত ১৩

এরপর নবী ﷺ কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বললেন:

> 'হে কুরাইশরা, তোমাদের প্রতি আমার কী রকম আচরণ করা উচিত বলে মনে করো?' তারা বলল, 'করুণা, হে আল্লাহর নবী! কারণ আপনি মহানুভব ভাই। মহানুভব ভাইয়ের সন্তান।' তখন নবী ﷺ বললেন, 'তোমরা যেতে পারো, তোমরা মুক্ত।'[৫৯]

হুনাইন যুদ্ধ

মক্কায় মুসলমানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপার জেনে হাওয়াজিন গোত্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে বের করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। মালিক বিন আওফ নাজরি তাদের এই ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দেয়। রাসূল ﷺ তাদের এই ব্যাপারটি জেনে যান। ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা এবং তায়েফের মাঝামাঝি হুনাইন-উপত্যকায় পৌঁছেন। সেখানে এই বিপুল পরিমাণ সৈন্যসহ মুসলমানরা হাওয়াজিন গোত্রের মুখোমুখি হয়।

যুদ্ধের শুরুতে হাওয়াজিন গোত্র মুসলমানদের প্রায় পরাজিত করে ফেলছিলো; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাহসিকতা এবং যুদ্ধে অটল থাকার দরুন মুসলমানরা বিজয় লাভ করে।

মুসলমানরা হাওয়াজিন গোত্রকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণ গনিমতের সম্পদ পেতে সক্ষম হন। নববী যুগের অন্য কোনো যুদ্ধে এই পরিমাণ গনিমতের মাল মুসলমানদের অর্জিত হয়নি।[৬০]

---

[৫৯] দ্রষ্টব্য—*সিরাতে ইবনে হিশাম*: ৪/৬১; *আল মাগাজি*: ২/৮৩৮।

[৬০] দ্রষ্টব্য—*সহিহ মুসলিম*: ১০৫৯, ১৭৭৫; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আসসহিহাহ*: ২/৪৯৭; *মাগাজি*, ওয়াকিদি প্রণীত: ৩/৮৯৩; *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ*: ৬/১৭৯; *তারিখে তাবারি*: ৩/৭৩।

আমুল উফুদ (প্রতিনিধি-বর্ষ)

নবম হিজরিকে বলা হয় আমুল উফুদ বা প্রতিনিধি-বর্ষ। এ-বছর আরব-উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে ইসলামের ছায়াতলে আসে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

> যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এলো এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখলেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।
>
> সূরা নাসর

বিদায় হজ

সাহাবী জাবিরের ﵁ হাদীসে বিদায় হজের বর্ণনা এভাবে এসেছে—"নবী ﷺ দশম হিজরিতে হজের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওনা করেন। আমরাও তাঁর সাথে মদীনা থেকে বের হয়ে 'যুল হুলাইফা' পর্যন্ত চলে আসি।" ... তিনি বলেন, "এরপর নবী ﷺ কসওয়া নামক উটনীতে আরোহণ করে উপত্যকায় এসে থেমে যান। আমি তখন রাসূলের সামনে-পেছনে এবং ডানে-বামে পদাতিক ও আরোহী লোকজন দেখতে পাই। এরপর সূর্য হেলে পড়লে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে নবী ﷺ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন:

> "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম (অর্থাৎ এগুলোর সীমারেখা লঙ্ঘন করা হারাম)—যেমন তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই দিন হারাম।
>
> জেনে রাখো, নিশ্চয় জাহেলিয়াতের প্রত্যেকটি বিষয় আমার এই দুই পায়ের তলে রাখা হলো।
>
> আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো। আর তাদের ব্যাপারে

> তোমাদের ওপর দায়িত্ব হচ্ছে, উত্তম পন্থায় তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা।
>
> আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক বিষয় রেখে যাচ্ছি, যা তোমরা আঁকড়ে ধরলে আর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না; তা হলো, আল্লাহর কিতাব।""

উল্লেখ্য, এ-বছর আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে যারা হজ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১ লক্ষ। আর এই বিদায় হজেই রাসূলের ওপর সুপ্রসিদ্ধ আয়াত অবতীর্ণ হয়:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

> আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।
>
> সুরা মায়িদা: আয়াত ৩

বলা হয়, ওহী প্রেরণের ধারাবাহিকতা সমাপ্তির বিষয়ে এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর অচিরেই আল্লাহর রাসূল ﷺ ইহলোক ত্যাগ করবেন। বিদায় হজের ৩ মাস অতিবাহিত হলে নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার মাত্রা বেড়ে গেলে তিনি হযরত আবু বকরকে رضي الله عنه সাহাবীদের নামায পড়ানোর দায়িত্ব প্রদান করেন। যখন তিনি শুনতে পেলেন, আনসারি সাহাবীরা কান্নাকাটি করছে, তখন আলির رضي الله عنه ওপর ভর করে মাথায় পট্টি বাধা অবস্থায় মসজিদে গমন করেন। এরপর তিনি মিম্বারের সর্বনিম্ন সিঁড়িতে বসে লোকজনের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করেন:

> "হে লোকসকল, শুনেছি, তোমরা তোমাদের নবীর পরলোকগমনকে ভয় করছো? আমার পূর্বে কোনো নবীকে ইহকালে চিরস্থায়ী হতে দেখেছো? আমিও এই ইহকালে চিরস্থায়ী হবো না। শুনে রাখো, আমি আমার প্রভুর কাছে চলে যাবো। তোমরাও আমার কাছে আসবে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে প্রথম সারির মুহাজিরদের ব্যাপারে কল্যাণের ওসিয়ত করছি। আর মুহাজিরদেকে তাদের নিজেদের মাঝে কল্যাণের ওসিয়ত করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

> শপথ অপরাহ্ণের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং উপদেশ প্রদান করে ধৈর্যের।
>
> সূরা আসর

> আর আমি আনসারদের জন্যও কল্যাণের ওসিয়ত করছি। কেননা, তোমাদের আগমনের পূর্বে তারা মদীনায় বসবাস করেছিলো এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো; সুতরাং তোমরা তাদের ব্যাপারে কোমল হও।"[৬১]

রাসূলের ওফাত

রাসূলের ﷺ অসুস্থতার মাত্রা আরও বেড়ে গেলো। অসুস্থতার আধিক্যে তিনি ঘর থেকে বের হতে পারছিলেন না। একপর্যায়ে তিনি মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দেন। দিনটি ছিলো ১১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার। খ্রিস্টীয় সন মোতাবেক ৮ জুন ৬৩২ ইং। রাসূলের ওফাতে মুসলমানরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। কেউ কেউ রাসূলের ওফাত সহ্য করতে না পেরে অস্বীকার করে। এমনকি হযরত উমর رضي الله عنه এই ঘোষণা করেন, 'যে বলবে, রাসূলের ওফাত হয়েছে, আমি তার মস্তক উড়িয়ে দেবো।' উমর رضي الله عنه এর ধারণা ছিলো, রাসূলের ওফাত হতে পারে না। উমর رضي الله عنه রাসূলের ওয়াদাকে নবী মূসার عليه السلام ওয়াদার ন্যায় মনে করে বললেন, 'তিনিও মূসার عليه السلام ন্যায় উম্মতের কাছে আবার ফিরে আসবেন। এমর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

> আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরও দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তার ভাই হারুনকে বললেন, 'আমার

[৬১] দ্রষ্টব্য—*সহিহ মুসলিম: ১/৩৯৭; সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৬০৩।*

> সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাকো। তাদের সংশোধন করতে থাকো এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চোলো না।
>
> সুরা আরাফ: আয়াত ১৪২

উমরের ﷺ এ-সব কথা লোকেরা শুনে বিশ্বাস করে নিচ্ছিলো। এই সময় হযরত আবু বকর ﷺ উমরের ﷺ এই বিষয়টি জানতে পেরে লোকদের সমবেত হতে বলেন। তিনি তাদের উপস্থিতিতে নিম্নোক্ত বক্তব্য দেন:

> "হে লোকসকল, যে-ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করবে, সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ ﷺ ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে সঠিক পথেই আছে। কেননা, মহান আল্লাহ্ সদা সর্বদা জীবন্ত, তার ওফাত নেই।"

এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ.

> আর মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছু নন। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয়, তা হলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত যে পশ্চাদপসরণ করবে, সে কখনো আল্লাহর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। আর অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করবেন।
>
> সুরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪৪

১১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ বুধবার রাতে রাসূলকে নিজ বিছানার স্থানে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশার ﷺ কামরায় দাফন করা হয়।[৬২]

[৬২] দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি*: ২/৬৩৮-৬৪১; *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ২/৬৫৫।

রাসূলের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

আমরা যদি রাসূলের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি এখানে উল্লেখ করতে যাই, তা হলে তার বর্ণনা শেষ করতে সক্ষম হবো না—এমনকি বর্ণনার হকটুকুও আদায় করতে পারবো না।

এককথায়, রাসূলের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ছিলো প্রশংসনীয় ও সুন্দর। তাঁর প্রতিটি কাজই ছিলো সঠিক ও সুপথপ্রাপ্ত। তিনি তাঁর উত্তম গুণাবলিতে পরিপূর্ণতার অধিকারী ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনে রাসূলকে যেভাবে প্রশংসিত করেছেন, তার থেকে উত্তম বর্ণনা আর কী হতে পারে! আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

> তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী। সুরা কালাম: আয়াত ৪

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

> তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।
>
> সুরা তাওবা: আয়াত ১২৮

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

> হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।
>
> সুরা আহযাব: আয়াত ৪৫ ৪৬

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

> কসম নক্ষত্রের, যখন তা অস্ত যায়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি। আর সে মনগড়া কথা বলে না। সে যা বলে, তা তো কেবল ওহী, যা তাঁর প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। সুরা নাজম: আয়াত ১৪

রাসূল ﷺ আল্লাহর পথে তার দাওয়াতি কার্যক্রম চালাতে অনেক কষ্ট, মসিবত ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন; তা সত্ত্বেও তিনি ভেঙে পড়েননি, দুর্বল হয়ে যাননি; বরং কোনো ক্লান্তি বোধ না-করে দাওয়াত চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ত্যাগ ও ধৈর্যধারণ অমর হয়ে আছে ইতিহাসে। কুরাইশদের থেকে এত পরিমাণ কষ্ট আর নির্যাতনের শিকার হয়েও তিনি তাদের জন্য দুআ করে বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার কওমকে ক্ষমা করে দিন। কেননা, তারা অজ্ঞ।'

রাসূল ﷺ ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে সত্যবাদী মানব। ন্যায়পরায়ণতা, সম্মান, মেধা, প্রজ্ঞা এবং সাহসিকতায় ছিলেন সবার ঊর্ধ্বে। প্রশস্ত হৃদয়, শান্তমনা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ধৈর্য ও নমনীয়তার গুণে গুণান্বিত ছিলেন তিনি। মিসকিনদের দেখাশোনা করতেন। ওঠাবসা করতেন দরিদ্রদের সাথে। লোকদেরকে উত্তম চরিত্র এবং কল্যাণ-কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট সম্মানের অধিকারী। সুষ্ঠু নিয়ম-নীতির ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামি সমাজ।[৬৩]

ইসলামের প্রভাব

আরবদের জাগরণে ইসলাম বিশাল ভূমিকা রেখেছিলো। এটা তাদেরকে দিয়েছিলো এক পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা, যাতে জীবনের সব কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ইসলামের মৌলিক অবদানগুলোর মাঝে ছিলো:

ইসলাম মূর্তিপূজা নিশ্চিহ্ন করেছে এবং মানুষদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতমুখী করেছে—যাঁর কোনো শরিক নেই।

আরবদেরকে মুক্ত করেছে মূর্খতার অভিশাপ থেকে। ফলে তাদের চোখ নুর দর্শনে সক্ষম হয়েছে এবং দাসত্বের লাগাম কেটে ফিরে পেয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ।

---

[৬৩] দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি*: ১/৫০৩-৫১৭; *সহিহ মুসলিম*: ২/২৫২; *খোলাসাতুস সিয়ার*, পৃ-২৩। *শিফা*, কাজি আয়ায: ১/১২১-১২৬; *শামায়েলে তিরমিযি*।

ইসলাম আরবদের প্রচলিত মন্দ ও নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ড তথা—লুটতরাজ, মদ্যপান, সুদ, এবং জিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন করেছে। দূর করেছে সামাজিক অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলা। নারীদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের সম্মান ও সামাজিক সকল অধিকার।

বর্ণবৈষম্য দূর করে সবাইকে এনে দিয়েছে এক কাতারে। পরনির্ভরতা ও পারস্পরিক বিচ্ছিনতা বারণ করে দিয়েছে। সবাইকে দান-সাহায্য করার উৎসাহ দিয়েছেন কল্যাণ-কাজে।

ছোটদের নির্দেশ দিয়েছে বড়দের সম্মান করার। মনিব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে নাফরমানির নির্দেশ না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে ইসলাম পিতা-মাতার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়ার ওসিয়ত করেছে এবং সবাইকে উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে।

ইসলাম গোটা আরব-সমাজকে পবিত্র কুরআনভিত্তিক নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে এসেছিলো।

ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক এবং সত্য ধর্ম হয়ে আবির্ভাব হয়। ইসলাম তার রিসালাতের দ্বারা সমস্ত বিভক্ত দলকে এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। গোত্র ও আঞ্চলিক ভেদাভেদ মুছে দিয়েছে ইসলাম। আকিদা, পূর্ণ ইমান এবং ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের আহ্বানে একতাবদ্ধ করেছে মানবজাতিকে।

ইসলামের আরকান

- শাহাদাত: মুসলমানরা ইসলাম গ্রহণ করতে কালিমায়ে শাহাদাত বলে থাকে। শাহাদাত হলো:

  أَشْهَدُ أَنّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله وأَشْهَدُ ان محمداً رس ول الله

  আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

  শাহাদাতের এই রুকনটি গায়রুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সব কিছুকে মুছে দেয় এবং এক আল্লাহর জন্য ইবাদত বা উপাসনা সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদের ﷺ রিসালাতের স্বীকৃতি দেয় এই শাহাদাত।

- নামায: নামায দ্বীনের মূল স্তম্ভ। অশ্লীলতা এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয় এই নামায। মুসলমানরা ইবাদত হিসেবে নামায আদায় করে থাকে। পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে নামায আদায় করা আবশ্যক। নামাযের সময় অন্তরকে কেবল আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট রাখতে হয়। নামায আদায়কারী তাকবির তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে তার নামায শুরু করবে। এরপর ধারাবাহিকভাবে সুরা ফাতিহা পড়বে, সাধ্যমতো সূরা মেলাবে, রুকু-সিজদা করে আল্লাহর যথাযথ তাসবিহ পাঠ করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো, কিবলামুখী অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত বাইতুল্লাহ শরিফের অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করা। এভাবে মুসলমানদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত যথা: ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করতে হয়।

- যাকাত: ইসলাম যাকাতকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে বিধিবদ্ধ করেছে। মানব-সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে যাকাত। এর আদান-প্রদানের মাধ্যমে শান্তি, সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় মানুষের মাঝে। ইসলাম দরিদ্রদের প্রতি কল্যাণ এবং ইহসানস্বরূপ যাকাত ফরয করেছে। এই যাকাত দ্বারা ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের হক নির্ধারিত করেছে।

- রোযা: প্রতি বছর রমযান মাসের রোযা রাখা মুসলমানদের জন্য ফরয। রোযা হলো, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকা। তবে মুসাফির, অসুস্থ ব্যক্তি, মুজাহিদ এবং হায়েয বা নেফাসগ্রস্ত মহিলা এবং অতি বৃদ্ধ—যারা রোযা রাখতে অক্ষম (মহিলা বা পুরুষ) ব্যক্তিদের রোযা না-রাখার সুযোগ দিয়েছে ইসলাম; বরং তারা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে রোযা কাযা করবে। অতি বৃদ্ধ যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তারা ফিদয়া আদায় করবে।

রোযা বাস্তবিকপক্ষে মানবতা এবং ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ। রোযার মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের অন্য ভাইদের ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করে। ইসলাম যে রোযা ফরয করেছে, তাতে গভীর হিকমত রয়েছে। এর দ্বারা দরিদ্রদের কষ্ট বোঝা যায়। ফলে তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং বন্ধুসুলভ আচরণ তৈরি হয়। রোযা ধৈর্যধারণ এবং ইচ্ছাশক্তির জানান দেয়। মানবমন থেকে সরিয়ে দেয় অহংকার ও অবাধ্যতার কালিমা।

হজ: জীবনে একবার প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহর হজ করা ফরয। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম থেকে নানা ধরনের মানুষ হজ আদায়ের জন্য বাইতুল্লাহ গমন করে। এখানে অহংকার বা ক্ষমতা প্রদর্শন বলে কিছু নেই। ইসলামের এই বিধান নানা ধরনের মানুষকে এক চাদরে বেষ্টিত করে। এ-ছাড়া মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়ায় পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা বিনিময়ের মাধ্যমে এই হজ।

ইসলামধর্মে জিহাদ

আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ রাখতে তাঁর মনোনীত দ্বীনের পথে সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করা ইসলামি আকিদারই একটি নির্দেশনা। সে-কাজ জ্ঞানভিত্তিক, সম্পদভিত্তিক বা শক্তিভিত্তিক বা যে-কোনো ক্ষেত্রভিত্তিক হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

> হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান বলে দেবো না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে; এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।
>
> সুরা সাফ: আয়াত ১৩

আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তি আরোপ করতে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

> আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি কোরো না। নিশ্চয়ই

> আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।
>
> সুরা বাকারা: আয়াত ১৯০

ইসলাম যুদ্ধকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এই স্বীকৃতি দ্বারা ইসলামি আকিদা, স্বাধীনতা এবং স্বদেশকে রক্ষা করাই মূল লক্ষ্য। কারণ, ইসলাম মৌলিকভাবে ফিতনা সৃষ্টি এবং মানুষকে কষ্ট দেয়, এমন কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সুতরাং জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার মূল লক্ষ্য এবং হিকমতসমূহ সুস্পষ্ট।[৬৪]

[৬৪] আল-বাদায়েউস সানায়ে।

জিহাদের সংজ্ঞা: জিহাদ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো—

[illegible] প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। কষ্ট স্বীকার করা। শত্রুকে প্রতিরোধ করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করা।

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ: [illegible] ইবনে হাজার আসকালানি [illegible] বলেন, '[illegible] শক্তি ব্যয় করা। এর ('জিহাদ শব্দ') দ্বারা নিজের প্রবৃত্তি, শয়তান এবং [illegible] বোঝায়।'

এখানে প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ বলতে দ্বীন শিক্ষাগ্রহণ করা, শিক্ষাদান করা ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা; শয়তানের সাথে সংগ্রাম বলতে তার আনীত সংশয় ও অযাচিত লোভ-লালসা প্রতিরোধ করাকে বোঝায়। আর কাফিরদের সাথে জিহাদ হাত (শক্তি প্রয়োগ), সম্পদ, কথা কিংবা অন্তর—যে-কোনোটির মাধ্যমেই হতে পারে। এ-ছাড়া দুরাচারীদের সাথে জিহাদ হাত দ্বারা (শক্তি প্রয়োগ), অতঃপর জবান, তারপর অন্তর দ্বারা হতে পারে। [৬৪]

ইমাম জুরজানি [illegible] বলেন, 'জিহাদ হলো, সত্য দ্বীন তথা ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করা।' [৬৪]

আল্লামা কাসানি ﵀ বলেন,

'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ হলো, প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা কিংবা কোনো কাজে সফল হওয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মুখের কথা, সম্পদ ও জীবন ইত্যাদি ক্ষয় করে সফলতার মানদণ্ডে পৌঁছার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার নামই জিহাদ। — অনুবাদক

ন্যায়পর খলিফাদের বিজয়

খিলাফত প্রতিষ্ঠা

রাসূলুল্লাহর ﷺ ওফাতের পূর্বে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে কাউকে খিলাফত হস্তান্তর করেননি; বরং মুসলমানদের মধ্যে শুরাভিত্তিক খিলাফতের ব্যবস্থা করে তিনি চলে যান। তাঁর ওফাতের পর কাকে খলিফা বেছে নিতে হবে, কে মুসলমান-জনগোষ্ঠী ও তাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করবেন—এটি নিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মক্কার মুহাজিরগণ দাবি করেছিলেন, তারা খিলাফতের যোগ্য। যেহেতু নবীর বংশের লোক এবং তারাই নবীর দাওয়াতকে সর্বপ্রথম সত্যায়ন করেছিলেন; অন্যদিকে মদীনার আনসার সাহাবীদের দাবি ছিলো, তারা খিলাফতের অধিক হকদার। কারণ, তারা নবীকে হিজরতের পর সাহায্য ও রক্ষা করেছিলেন।

আনসারি সাহাবীরা খাযরাজ গোত্রের নেতা সাআদ বিন উবাদাকে ﷺ খলিফা মনোনীত করেন। এ-দিকে সমস্ত সাহাবী সাকিফায়ে বনি সাআদা নামক এক স্থানে একত্রিত হন;[৬৫] সেখানে আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ খলিফা-নির্বাচনের জন্য আলোচনায় বসেন। সবশেষে আবু বকরকে ﷺ খলিফা নিযুক্ত করা হয়। এটি ছিলো বিশেষ বাইআত। পরদিন মসজিদে সব মুসলমান আবু বকরের ﷺ নিকট সাধারণ বাইয়াত গ্রহণ করে।[৬৬]

আবু বকর ﷺ

আবদুল্লাহ আবু বকর বিন উসমান ﷺ। তার পিতা উসমান পরিচিত ছিলেন আবু কুহাফা নামে। ছয় পুরুষ পরে তার বংশ-লতিকা রাসূলের ﷺ বংশের সাথে গিয়ে মেলে। তিনি রাসূলের প্রতিটি কথা কোনো দ্বিধা ছাড়া সত্য বলে মেনে নিতেন; এ-জন্য তাকে 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিলো। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম

---

[৬৫] দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি*, ৩৩৯৪; *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, তাবারি: ২/৪৫৫

[৬৬] দ্রষ্টব্য—*তাবাকাতে ইবনে সাআদ*: ৩/৫৬৮, ৭/৩৯০

ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন খাদিজা ﵂ এবং বাচ্চাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আলি ﵁।

আবু বকর ﵁ সদা-সর্বদা রাসূলকে সত্যায়ন করতেন। তাঁর কথাকে সত্য বলে মেনে নিতেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য জিহাদে তাঁর সঙ্গ দিতেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন:

> হে লোকসকল, আমাকে তোমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। তাই আমি যদি সঠিক করি, তবে তোমরা আমাকে সহায়তা করো। আর যদি আমি ভুল করি, তবে তোমরা আমাকে ঠিক করে দিয়ো। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবল—যতক্ষণ না তার হক আদায় করে দেবো। আর তোমাদের সবল ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল—যতক্ষণ না তার কাছ থেকে হক নিয়ে নেবো।[৬৭]

উসামাকে বালকায় প্রেরণ

আবু বকর ﵁ উসামা বিন যায়েদের ﵁ কাঁধে ৫ হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে তাকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠান। সিরিয়ার গাসসানি আরবরা উসামা বিন যায়েদের পিতাকে হত্যা করেছিলো। ফলে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে তাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের প্রস্তুতি রাসূল ﷺ তাঁর ওফাতের পূর্বেই দিয়ে গিয়েছিলেন। উসামার ﵁ নেতৃত্বে এই বাহিনী শামে গমন করে এবং মুতার নিকটবর্তী বালকা নামক স্থানে রোমানদের সঙ্গে কিছু বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মুসলমানরা এসব বিজয় লাভ করে দীর্ঘ ৪০ দিন পর প্রচুর মূল্যবান গনিমত নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে। এই যুদ্ধ তৎকালীন বড় বড় যুদ্ধ-বিজয়ে ভূমিকা হিসেবে কাজ করে।[৬৮]

রিদ্দার যুদ্ধ

আবু বকরের ﵁ খিলাফতকালে একদল ধর্মত্যাগী এবং বিদ্রোহী ইসলামের ফরয বিধান যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যাকাতের বিরোধিতা করে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন আবু বকর ﵁। কয়েকজন সাহাবীর নেতৃত্বে আরবের

[৬৭] *মুসান্নাফে আবদির রাযযাক*: হাদিস নং ২০৭০২; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৫/২৬৮, ৬/৩৩২; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির: ১/৩৬১

[৬৮] *দ্রষ্টব্য—তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, তাবারি: ২/৪৬১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৬/৩৩৫-৩৩৬; *তারিখু দিমাশক*, ইবনু আসাকির: ২/৫৯

ইয়ামামা, বাহরাইন, ওমান ও ইয়েমেন ইত্যাদি এলাকায় সৈন্যবাহিনী পাঠান। এ-সব ধর্মত্যাগীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইয়ামামার অধিবাসী মিথ্যাবাদী মুসায়লামা। সে নিজেকে নবী দাবি করতো। মুসায়লামা যখন বনি তামিমের সাজাজ নামে জনৈকা মহিলাকে বিয়ে করে, তখন তার ফিতনা ভয়াবহ রূপ নেয়। কেননা, তার স্ত্রী সাজাজ নিজ স্বামীর মতো নিজেকে নবী দাবি করেছিলো।[৬৯]

রিদ্দার যুদ্ধে সাহাবীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সাহসিকতার পরিচয় দেন, তারা হলেন—খালিদ বিন ওয়ালিদ ﵁, ইকরিমা বিন আবু জাহল ﵁, আমর ইবনুল আস ﵁ প্রমুখ। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৪ জন সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসির, আবু হুযায়ফা বিন উতবা, সালেম বিন সালেম এবং আবদুল্লাহ বিন সাহল ﵁ এই যুদ্ধে শহিদ হন।

এই রিদ্দার যুদ্ধের মাধ্যমে আরব-উপদ্বীপ ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহী মুক্ত হয় এবং ইসলামের ঝাণ্ডাতলে স্বাধীনভাবে এক আল্লাহর একত্ববাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

হিরা ও আনবার বিজয়

১২ হিজরিতে আবু বকর ﵁ হিরা এবং আনবার নামক দুটি শহর বিজয় করতে খালিদ বিন ওয়ালিদের ﵁ নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রস্তুত করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদের সহযোগিতায় থাকেন মুসান্না বিন হারিসা শায়বানি। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় পারস্যের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যরা বিজয় লাভ করে। হিরা, ফুরাতের পশ্চিম তীর, শামের মরু অঞ্চল এবং ইরাকের উল্লেখযোগ্য কিছু শহর মুসলমানদের দখলে আসে। এরপর খালিদ বিন ওয়ালিদ ﵁ সৈন্যদের নেতৃত্ব মুসান্না বিন হারিসার কাছে অর্পণ করে আবু বকরের ﵁ নির্দেশে শাম অভিমুখে সেখানকার মুসলিম-বাহিনীর সহায়তার উদ্দেশ্যে রওনা হন।[৭০]

শাম বিজয়

শাম বিজয়-অভিযানে আবু বকর ﵁ ৪টি সৈন্যদলকে ৪ জনের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। হিমসের দিকে প্রেরণ করা হয় আবু উবায়দা আমের বিন জাররার বাহিনী,

---

[৬৯] দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি*: ৪০২৪, ৪০২৫; *মুসনাদে আহমাদ*: ৩৫২৪

[৭০] দ্রষ্টব্য—*তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, তাবারি: ২/৫৫৩-৫৭৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৬/৩৮৪

জর্ডানের দিকে শুরাহবিল বিন হাসানার বাহিনী, ফিলিস্তিনের দিকে আমর ইবনুল আসের বাহিনী এবং দামেশকের দিকে প্রেরণ করা হয় ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে।

এই ৪ সৈন্যবাহিনীর সর্বমোট সংখ্যা ছিলো ৩৬ হাজার। একই মুহূর্তে বাইজেন্টাইন-সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার সৈন্যবাহিনীকে মাহানের নেতৃত্বে মুসলমানদের মোকাবেলা করতে পাঠায়। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো ৮০ হাজার। যুদ্ধ যতই ভয়ানক রূপ নিচ্ছিলো, রোমানদের পক্ষে সাহায্য এবং সৈন্যসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। একপর্যায়ে তাদের সৈন্যসংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার পর্যন্ত ঠেকে। এর বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো কেবল ৪০ হাজার। ফলে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে খলিফার সহযোগিতা কামনা করে। তখন আবু বকর ﷺ খালিদ বিন ওয়ালিদকে ﷺ হিরা থেকে তার সেনাবাহিনীসহকারে ইয়ারমুকে এসে মুসলিম-বাহিনীর নেতৃত্ব পরিচালনার নির্দেশ দেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ ছিলেন যুদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী এবং বিচক্ষণ নেতা। ফলে তিনি উত্তমভাবে সৈন্যদেরকে গুছিয়ে নেন। তাদেরকে ডান-বাম এবং মধ্যবর্তী সারিতে সঠিকভাবে সাজান। ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালীন খলিফা আবু বকর ﷺ ওফাতপ্রাপ্ত হন। তার ওফাতের পর খিলাফতের ভার দেওয়া হয় উমর ইবনুল খাত্তাবের ﷺ হাতে।[৭১]

কুরআন একত্রীকরণ

বিভিন্ন যুদ্ধে হাফিজদের একটি বড় অংশ শহিদ হয়ে যাওয়ার দরুন আবু বকরের ﷺ যুগে সম্পূর্ণ কুরআন একত্রিত করা হয়। সম্পূর্ণ কুরআন একটি মাসহাফের অন্তর্ভুক্ত করে একত্রিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয় যায়েদ বিন সাবিতকে ﷺ।

খেজুরপাতা, পাথরের টুকরো এবং মানুষের স্মৃতি থেকে কুরআনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো একত্রিত করা হয়। আবু বকরের ﷺ যুগেই সমাপ্ত হয় কুরআন একত্রীকরণের কাজ। কুরআনে কোনো বিকৃতি সাধন যেন না হয়, সে-জন্য তিনি তার ওফাতের পূর্বেই আল্লাহর পবিত্র এই কুরআন একত্র করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

আবু বকর ﷺ ছিলেন মুত্তাকি, পরহেজগার এবং আল্লাহর শরীয়তের নির্দেশ বাস্তবায়নকারী এক ব্যক্তিত্ব। তিনি নবী মুহাম্মাদের ﷺ থেকে ২ বছরের ছোট ছিলেন।

[৭১] দ্রষ্টব্য—*তারিখু দিমাশক*, ইবনু আসাকির: ২/৫৯-৬৪; *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, তাবারি: ২/৫৮০-৮৭

১৩ হিজরি (৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ) সনে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ওফাত লাভ করেন। তার শাসনকাল ছিলো ২ বছর ৩ মাস। আল্লাহর রাসূলের ﷺ পাশে আয়েশার ؓ কক্ষে তাকে দাফন করা হয়।[৭২]

উমর ইবনুল খাত্তাব ؓ

উমর ইবনুল খাত্তাব বিন নুফাইল; আবু হাফস তার কুনিয়ত। তিনি তার পিতার দিক থেকে সপ্তম পূর্বপুরুষ এবং মাতার দিক থেকে ষষ্ঠ পূর্বপুরুষে গিয়ে রাসূলের বংশের সাথে মিলিত হন। নবীজির ﷺ থেকে তিনি ১৩ বছরের ছোট ছিলেন।[৭৩]

উমর ؓ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং সাহসী। রাসূলের সাথে প্রায় সবগুলো যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। আবু বকর ؓ ওফাতের পূর্ব-মুহূর্তে নিজ বিছানায় বিশিষ্ট সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে উমর ইবনুল খাত্তাবকে ؓ খলিফা নিযুক্ত করে যান। মুসলমানদের একতা টিকিয়ে রাখতে তিনি খলিফা হিসেবে পছন্দ করেন উমরের ؓ মতো একজন সাহসী এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্বকে। তাই তিনি উসমান বিন আফফানকে ؓ ডেকে উমরের ؓ নিকট খিলাফতের প্রতিশ্রুতি লিখে পাঠান। সেখানে লিখিত ছিলো:

> "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটি আবু বকর বিন আবু কুহাফা ؓ কর্তৃক মুসলমানদের প্রতি প্রতিশ্রুতি। হামদ ও সানার পর, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে ؓ তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করে যাচ্ছি। সুতরাং সে যদি তোমাদের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল এবং ন্যায়পরায়ণ হয়, তার ব্যাপারে আমার ধারণা এমনই। আর যদি সে সীমালংঘন করে এবং উল্টো কিছু করে, তা হলে বলতে হয়, অদৃশ্যের জ্ঞান তো আমি রাখি না।" [৭৪]

এরপর মসজিদে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'যাকে তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছে, তোমরা তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট?' তারা বললেন, 'আমরা আপনার কথা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' [৭৫]

---

[৭২] *দ্রষ্টব্য—সহিহ বুখারি*: ৪৬০৩; *আত-তিবয়ান ফি উলুমিল কুরআন*, সাবুনি: ৫৫; *আল-ইতকান*, সুয়ুতি: ১/৭২, ১৮৩

[৭৩] *মাহজুস সাওয়াব ফি ফাজাইলি আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব*: ১/১৩১; *সহিহুত তাওসিক ফি সিরাতি ওয়া হায়াতিল ফারুক উমর ইবনিল খাত্তাব*: ১৫

[৭৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৭/১৭; *তারিখে তাবারি*: ৪/২৩৮

[৭৫] *তারিখে তাবারি*: ৪/২৪৮

এই প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করেই খিলাফতের ভার আবু বকরের দায়িত্ব ﷺ হতে উমরের ﷺ নিকট হস্তান্তর হয়। উমর ﷺ খলিফা হলে সকল মুসলমান তার কাছে বাইয়াত হন এবং তাকে 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৭৬]

ইসলামের ধারাবাহিক বিজয়

উমর ইবনুল খাত্তাবের ﷺ খিলাফতপ্রাপ্তির সময়ে ইয়ারমুকের যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিলো। ইতোপূর্বে সাহসী বীর সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালিদের ﷺ নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যরা বিভিন্ন বিজয় লাভ করে। খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন সাহসী এবং বিচক্ষণ মুজাহিদ। যুদ্ধের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তার ছিলো গভীর জ্ঞান। এ-পর্যন্ত বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করায় তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচণ্ড দক্ষতা অর্জন করেন।

কিন্তু উমরের ﷺ আশঙ্কা হয়, খালিদের প্রতি মুগ্ধতার ক্ষেত্রে মুসলমানরা ফিতনায় জড়িয়ে পড়ে কি না! তাই তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদের ﷺ কাছে মুসলিম সৈন্যদের নেতৃত্ব আবু উবায়দা ইবনুল জাররার ﷺ হাতে অর্পণের নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠান। খালিদ বিন ওয়ালিদের ﷺ কাছে এই চিঠি পৌঁছুলে তিনি সৈন্যদের দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা প্রকাশ করেননি। এরপর ১৫ হিজরি (৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ) সনে ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সম্পন্ন হলে তিনি তাদের নেতৃত্ব আবু উবায়দার ﷺ কাছে হস্তান্তর করেন।[৭৭]

রোমান-সাম্রাজ্যের পতন

রোমান-সৈন্যদের ইয়ারমুকের যুদ্ধে পরাজিত হওয়া এবং তাদের মধ্য থেকে একটি বিরাট অংশ ইয়ারমুক প্রান্তরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মুসলমান সৈন্যরা আবু উবায়দার ﷺ নেতৃত্বে দামেশকের দিকে অগ্রসর হন। দামেশক মুসলমানদের দখলে চলে আসে। এ-ছাড়াও মুসলমানরা দখল করে নেয় আরও কয়েকটি শহর। এরপর মুসলমানরা বাইজেন্টাইন-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদের মুখোমুখি হয়ে বিজয় লাভ করেন। এভাবেই রোমানদের সাম্রাজ্য সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন থেকে মুছে যায়।

---

[৭৬] দ্রষ্টব্য—*তাবাকাতে ইবনে সাআদ*: ৩/২৮১, *মাহাজুস সাওয়াব*: ১/৩১১

[৭৭] দ্রষ্টব্য—*নিজামুল হিকামি ফি আহদিল খুলাফাইর রাশিদিন*: ৮৩; *তারিখে তাবারি*, ৫/৪১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৭/১১৫; *আত-তারিখুল ইসলামি*: ১১/১৪৭

জেরুজালেমে উমরের প্রবেশ

যে-সময়ে আবু উবায়দা ইবনুল জাররার ﷺ নেতৃত্বে মুসলিম সেনারা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করছিলো, সে-সময়ে আমর ইবনুল আস ﷺ আজনাদাইন নামক স্থানে রোমানদেরকে পরাজিত করে বাইতুল মাকদিস অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি সেখানে পৌঁছে দীর্ঘ সময় জেরুজালেম অবরোধ করে রাখেন। পেট্রিয়ার্ক সফ্রোনিয়াস খলিফা উমরের ব্যক্তিগত উপস্থিতির শর্তে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হন।

এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ মদীনা থেকে জেরুজালেমের উদ্দেশে রওনা করেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার অবস্থা পরিদর্শন করে যান। এরপর তিনি ১৬ হিজরি মোতাবেক ৬৩৭ সালে জেরুজালেম পৌঁছান। পেট্রিয়ার্ক সফ্রোনিয়াস খলিফা উমরকে স্বাগত জানিয়ে তার কাছে জেরুজালেম শহর অর্পণ করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খ্রিস্টানদেরকে তাদের জীবন এবং ধন-সম্পদ হেফাজতের নিরাপত্তা দেন। তাদেরকে ধর্মীয় উপাসনার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেন। পেট্রিয়ার্ক সফ্রোনিয়াস উমরের ﷺ কাজে আকৃষ্ট হয়ে বলে ওঠেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, সত্যিই আপনাদের রিসালাত, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাধীনতা এবং উদারতার সর্বোচ্চ মর্ম বহন করে।'

এটিই ইসলামের মহান রিসালাত, যা উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ মদীনা থেকে জেরুজালেম বহন করে নিয়ে যান। পরদিন উমর ﷺ জেরুজালেম শহর পরিদর্শনে বের হন এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন নিদর্শন পরিদর্শন করেন। হাইকালে সুলাইমানের জায়গাতে (যা বাবেল শাসক বুখতে নসর ৫৮৭ খ্রিস্টপূর্ব সনে ধ্বংস করে দিয়েছিলো) সেখানে তিনি আবর্জনা দেখতে পেয়ে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেখানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন।[৭৮]

ইরাক ও পারস্য বিজয়

খলিফা উমর ﷺ পারস্য বিজয়ের জন্য সৈন্যবাহিনী তৈরি করেন এবং তাদের নেতা হিসেবে মনোনীত করেন সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে। সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৭ হিজরি (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) সনে ইরাকের কাদেসিয়া শহরে অবতরণ করেন। অপরদিকে রুস্তমের নেতৃত্বাধীন পারস্য-সেনাবাহিনী ছিলো মুসলমানদের চার গুণ বেশি। দীর্ঘ ৪ দিন তুমুল যুদ্ধ হয় দুই দলের মধ্যে। সবশেষে

---

[৭৮] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৪/৪৩৩; *হুরুবুর কুদসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি*, ড. ইয়াসিন সুয়াইদ: ৩৭; *ফুতুহুশ শাম*: ১/২১৩-২১৬; *ফুতুহুল বুলদান*: ১/১৮৮, ১৮৯

এ-যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। মুসলমানদের মধ্যে থেকে ৭ থেকে ৮ হাজার সৈন্য শহিদ হন। অপরদিকে পারসিকদের প্রায় ৩০ হাজার যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করে। এমনকি তাদের সেনাপ্রধান রুস্তমও নিহত হন এ-যুদ্ধে। এরপর ২ মাস অতিবাহিত হলে মুসলমানরা মাদায়েন শহরের দিকে অগ্রসর হয় এবং মুসলিম-সেনাপ্রধান সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস তৎকালীন বাদশা কিসরার শ্বেত প্রাসাদে এ-আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে প্রবেশ করেন:

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ

> তারা ছেড়ে গিয়েছিলো কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান এবং কত সুখের উপকরণ—যেখানে তারা খোশগল্প করতো।
> সুরা দুখান, আয়াত: ২৫-২৭

পারসিকরা তাদের সৈন্যবাহিনী নতুনভাবে সজ্জিত করে; যার ফলে তাদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৫০ হাজারে; তখন উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ নোমান বিন মুকাররিনের নেতৃত্বে মুসলমানদের সাহায্যে ৩০ হাজার সৈন্যবাহিনী পাঠান। নাহাওয়ান্দ শহরে এসে মুসলমানদের মাঝে এবং পারসিকদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও মহান আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। মুসলমানরা একে 'বিজয়ের বিজয়' বলে নামকরণ করে।[৭৯]

কেননা এ-যুদ্ধের পর পারস্য সাম্রাজ্য আর কোনো দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। এ-যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো ২১ হিজরি (৬৪২ খ্রিস্টাব্দ) সনে। এভাবেই মুসলমান সৈন্যরা গোটা পারস্যের ওপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

মিশর বিজয়

৬৩৯ সালের শেষাংশে আমর ইবনুল আস ﷺ মিশর বিজয়ের জন্য খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের ﷺ অনুমতি নিয়ে মিশরের দিকে তার সৈন্যবাহিনীসহ অগ্রসর হন। তার সাথে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিলো ৪ হাজার। তিনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিন থেকে উপকূলের সমান্তরাল ভূমি অতিক্রম করে মিশরের বেলবিস শহর

---

[৭৯] দ্রষ্টব্য—*আল-ফান্নুল আসকারিল ইসলামি*: ২৮৪; *তারিখে তাবারি*: ৫/১০৯; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৭/১১৩

দখল করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি ব্যাবিলন-দুর্গ বিজয় করতে অগ্রসর হন এবং সেখানে পৌঁছে দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। এ-সময় তিনি খলিফা উমরের কাছে সাহায্য চেয়ে আরও কিছু সৈন্যবাহিনী তলব করেন। তখন উমর ﷺ যুবায়ের বিন আওয়ামের ﷺ নেতৃত্বে ৮ হাজার সৈন্যসহ একটি দল আমর ইবনুল আসের কাছে পাঠান। ব্যাবিলন-শহরে রোমানদের সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং মুসলমানরা একপর্যায়ে ব্যাবিলন-দুর্গে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ব্যাবিলন-শহর বিজয় করে মুসলমানগণ আলেকজান্দ্রিয়া নগরী আক্রমণ করতে অগ্রসর হন এবং দীর্ঘ দিন তা অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে ২১ হিজরি (৬৪২ ইং) সনে রোমানদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত মিশর-শাসক ও কিবতিদের প্রধান মুকাওকিস আমর ইবনুল আসের ﷺ সাথে সন্ধি করে। এই সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিলো রোমান-বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং তাদের জান-মালের হেফাজত করা হবে; এই সন্ধিতে যারা একাত্মতা প্রকাশ করবে, তারা কর আদায় করবে।

মিশরের জনগণ যখন আমর ইবনুল আসের ﷺ ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতা, বীরত্ব ও উদারতা দেখতে পায়, তখন তারা তাকে ও আরব-সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানায়। ব্যাবিলন-দুর্গের নিকটে আমর ﷺ এক নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এ-শহরের নামকরণ করেন 'ফুসতাত' নামে। একই নামে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, যা আজও বিদ্যমান। পাশাপাশি তিনি কৃষিকাজ ও সেচের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। একটি খাল খনন করেন এবং এর নাম দেন খালিজু আমিরিল মুমিনিন।[৮০]

খলিফার ব্যক্তিত্ব সংস্কারধর্মী কাজ

ন্যায়পরায়ণতা, তাকওয়া, বিনয় এবং সাহসিকতার সামগ্রিক গুণাবলির সুসমাহারে খলিফা উমর ﷺ সুপরিচিত। সাদাসিধে পোশাক, চালচলন এবং খেজুরগাছের পাতাকে নিজ বিছানা বানিয়ে নেওয়া তার উত্তম গুণাবলির প্রমাণবহ জীবনাচার। তিনি সাধারণ মানুষের মতোই বাজারে যাওয়া-আসা করতেন, রাত জেগে সামাজিক নানা সমস্যা খুঁজে বের করে সেগুলো সমাধানে সচেষ্ট হতেন। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করা এবং মুসলমানদের জান-মালের হেফাজত করতে

[৮০] দ্রষ্টব্য—*ফুতুহে মিসর*: ৬৯-৭১; *আত-তারিখুল ইসলামি*, খ- ১২: ৩৫৬

কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কিছুকে উমর ﵁ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি।

উমর ﵁ আরবি সনের প্রবর্তন করেন এবং সেটা রাসূলের ﷺ হিজরত থেকে গননা শুরু করেন। প্রত্যেক বছরের প্রথম মাস নির্ধারণ করা হয় মুহাররমকে।

রাষ্ট্রীয় শাসন-কাঠামো বিভিন্ন মন্ত্রিত্বে বিন্যস্ত করেন; এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে নিয়োগ দেন কর্মকর্তা। আদালত-পরিচালনায় নিয়োজিত করেন কাজি। কাজির কাজ ইনসাফের সঙ্গে সম্পাদনার জন্য তিনি সেটা আলাদা বিভাগের মর্যাদা দেন; ফলে বিচারবিভাগ ও প্রশাসন সবগুলোই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতো। রাষ্ট্রীয় সম্পদের হিসাব রাখতে করতে বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন; বাজারের দেখাশুনা করতে, খেয়ানত ও প্রতারণা বন্ধ করতে তিনি পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন শহরে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে উলামা এবং ফুকাহা প্রেরণ করেন।

২৩ হিজরি মোতাবেক ৬৪৪ সালে মুগিরা বিন শুবার দাস অগ্নিপূজারি আবু লুলুআর হাতে উমর ﵁ নির্মমভাবে শহিদ হন। উমর ﵁ যখন জানতে পারলেন, তাকে শহিদ করেছে একজন অগ্নিপূজারি, তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তার শাহাদাত এমন এক হন্তারকের মাধ্যমে দিয়েছেন, যে জীবনে আল্লাহর জন্য একটি সিজদাও করেনি। আয়েশার ﵂ ঘরে রাসূল ﷺ ও আবু বকরের পাশে তিনি শায়িত হন।[৮১]

উসমান বিন আফফান ﵁

উসমান বিন আফফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস। রাসূলুল্লাহর ﷺ পূর্বপুরুষ আবদে মানাফ পর্যন্ত গিয়ে উসমান এবং রাসূলের বংশ মিলিত হয়।[৮২]

বদর যুদ্ধ ছাড়া প্রায় সব যুদ্ধেই উসমান ﵁ অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহর রাসূলের ﷺ মেয়ে উসমানের স্ত্রী রুকাইয়া অসুস্থ থাকায় তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। রুকাইয়া মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার অপর মেয়ে উম্মে কুলসুমকে উসমানের ﵁ সাথে বিবাহ দেন। এ-জন্য উসমানকে ﵁ 'যুন্নুরাইন'

---

[৮১] দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি*: হাদিস নং-৩৭০০; *সহিহুত তাওসিকি ফি সিরাতি হায়াতিল ফারুক*: ৩৬৯

[৮২] দ্রষ্টব্য—*তাবাকাতে ইবনে সাআদ*: ৩/৫৩; *আল-ইসাবাহ*: ৪/৩৭৭, নং ৫৪৬৩

উপাধি দেওয়া হয়।[৮৩] উসমান ﷺ ছিলেন ওহী-লেখকদের অন্যতম; ছিলেন দানশীল, বিনয়ী এবং দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞানী এক ব্যক্তিত্ব।

উসমানের ﷺ বাইআত

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবকে ﷺ মৃত্যুর আগে কাউকে খিলাফতের ভার প্রদান করে যাননি, যেমনটি আবু বকর ﷺ তার ওফাতের পূর্ব-মুহূর্তে করে গিয়েছিলেন। উমর ﷺ মুসলমানদের মাঝে পরামর্শভিত্তিক খিলাফত-ব্যবস্থাপনার কাঠামো রেখে যান।[৮৪]

বিশিষ্ট সাহাবী উসমান বিন আফফান, আলি বিন আবি তালিব, আবদুর রহমান বিন আউফ, সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ এবং যুবাইর বিন আওয়াম ﷺ—এই ছয়জনের মধ্য থেকে যাকে নির্ভরযোগ্য মনে হয়, তাকেই খলিফা হিসেবে মেনে নিতে বলেছেন। এরপর সকলের পরামর্শে উসমানকে খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।[৮৫]

ইসলামি বিজয়ের ধারাবাহিকতা

খলিফা উসমান বিন আফফানের ﷺ যুগেও ইসলামি বিজয়সমূহ অব্যাহত ছিলো। খুরাসান, আজারবাইজান এবং রোমান-সাম্রাজ্য-শাসিত ত্রিপোলিসহ কয়েকটি শহর উসমানের যুগে মুসলমানদের দখলে আসে। এই সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে-যুদ্ধ হয়, সেটি হলো, ৩৪ হিজরি (৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ) সনে মুসলমান নৌবহর কর্তৃক রোমান নৌবহরকে 'যাতুস সিওয়ারি' নামক স্থানে পরাজিত করা।[৮৬]

ফিতনার ও তার ক্ষয়ক্ষতি

উসমান বিন আফফানের ﷺ খিলাফতের প্রাথমিক স্তরে ইসলামি নেতৃত্ব প্রবলভাবে বিকশিত হয়। অধিকাংশ আরব উত্তর-আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ কুরআন

---

[৮৩] *উমদাতুল কারি*: ১৬/২০১; *সুনানে বায়হাকি*: ৭/৭৩

[৮৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৭/১৪২; *তাবাকাতে ইবনে সাআদ*: ৩/৩৬৪

[৮৫] *আল-মুসান্নাফ*: ১৪/৫৮৮; *মিনহাজুস সুন্নাতিন নুবুওয়াহ*, ইবনে তাইমিয়া: ৩/১৬৫

[৮৬] *তারিখে তাবারি*: ৫/২৯০; *আল-কামিল ফিত তারিখ*: ৩/৫৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৭/১৬৩

একটি মাসহাফের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কুরআনের কয়েকটি নুসখা গভর্নরদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

উসমানের ﷺ খিলাফতের দ্বিতীয় স্তরে, তিনি যখন ৭৬ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সহজ করতে তার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা নেন; একই সাথে আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ কর্তৃক নিয়োজিত কয়েকজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেন—তাদের স্থানে নতুন কয়েকজনকে নিযুক্ত করা হয় এবং তারা জনগণের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালায়। [৮৭] পরবর্তী সময়ে নবনিযুক্ত কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জনগণ নানা কারণে ক্ষেপে যায়। শেষ পর্যন্ত মিশর, কুফা এবং বসরার একটি বিদ্রোহী-গোষ্ঠী একাট্টা হয়ে মদীনায় এসে খলিফার পদত্যাগ দাবি করে। খলিফা উসমান বিন আফফান ﷺ তাদের আগমনের কারণ জানতে চেয়ে দূত পাঠান। এরপর উসমান ﷺ জানতে পারেন যে, তারা হয় বরখাস্ত নতুবা হত্যা করতে মদীনায় এসেছে। তখন এ-বিষয়ে মদীনার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ জরুরি পরামর্শ করে এই বিদ্রোহী-গোষ্ঠীর মোকাবেলা করার ফয়সালা করেন; কিন্তু উসমান ﷺ মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না এবং তাদের পরামর্শকৃত ফায়সালাকে নাকচ করে দেন। তিনি তাদের বলেন, 'আমরা এ-সব বিদ্রোহীদেরকে ক্ষমা করে দেবো।'

পরবর্তী সময়ে এ-সব বিদ্রোহীরা তাদের মদীনায় আগমনের কারণ নিজেরাই প্রকাশ করে। উসমান ﷺ সাধ্যমতো তাদের থেকে সরে থাকেন এবং তাদের নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা পূরণ করে দেন। ফলে তারা যেভাবে এসেছিলো, সেভাবেই মদীনা থেকে চলে যায়। কিন্তু পথিমধ্যে তাদেরকে নতুনভাবে শয়তান পাকড়াও করে। ফলে দ্বিতীয়বার তারা আবার মদীনায় আসে এবং উসমানকে ﷺ ৪০ দিন যাবৎ ঘরে অবরোধ করে রাখে। তারা তাকে পানি পেতেও বাধা প্রদান করে, অথচ তখন উসমান ﷺ ছিলেন ৮০ বছরের বৃদ্ধ। একপর্যায়ে তারা উসমানের ঘর বেয়ে উঠে তাকে কুরআন পড়া অবস্থায় দেখতে পায়। এই অবস্থায় তারা তাকে হত্যা করে। ৩৫ হিজরি (৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সনে উসমান ﷺ শহিদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৮৮]

---

[৮৭] এটি মিথ্যাচার। উসমান ﷺ যাদের নিয়োগ দেন তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে সালাফগণ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

[৮৮] দ্রষ্টব্য—*তাবাকাতে ইবনে সাআদ*: ৩/৭৫ [হাসান লিগাইরিহি]; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৭/১৯০; *ফিতনাতু মাকতালি উসমান*: ১/১৭৫; *আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়া ফি আসরি খুলাফাইর রাশিদিন*: ২৮২; *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*: ১৩৩

উসমানকে ﵁ হত্যার পর আরও বড় ধরনের নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতির আবির্ভাব হয়, যা পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের ওপর খারাপ ফলাফল বয়ে আনে।

আলি বিন আবি তালিব ﵁

আলি বিন আবি তালিব বিন আবদিল মুত্তালিব। তিনি রাসূলের ﷺ চাচাতো ভাই এবং রাসূলের মেয়ে ফাতেমার জামাতা। ভাষা-অলংকার, বীরত্ব ও বিচারকাজে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।[৮৯]

উসমান বিন আফফান ﵁ শহিদ হওয়ার পর কিছু সাহাবা আলিকে খিলাফতের ভার গ্রহণ করতে বললে তিনি খিলাফত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর তারা যখন তাকে খিলাফত গ্রহণ করতে জোর প্রদান করা হয়, তখন তিনি বাধ্য হয়ে তাদের আবেদন মেনে নেন।

আলি ﵁ খিলাফত গ্রহণ করেই উসমান বিন আফফানের ﵁ যুগের সব দায়িত্বশীলকে তাদের পদ থেকে অব্যাহতি দেন। কেননা তারাই ছিলো ওই ফিতনার মূল কারণ—এ-ফিতনার কারণেই হযরত উসমান বিন আফফানকে ﵁ হত্যা করা হয়েছিলো। [৯০] তৎকালীন সিরিয়ার গভর্নর মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ﵁ আলির ﵁ কথা মানতে অস্বীকৃতি জানান। মুআবিয়া ﵁ উসমান বিন আফফানের ﵁ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হন; সে-কল্পে—উজ্জীবনী-স্মারক উপায়েই যেন—উসমানের ﵁ গায়ের জামা ঝুলিয়ে রাখেন মসজিদের মিম্বারে।

জঙ্গে জামাল

আলী ﵁ ইরাকের কুফাকে তার রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি যখন সেখানে শামের বিদ্রোহ দমন ও মুআবিয়াকে ﵁ অনুগত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মক্কায় যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ﵄ এর নেতৃত্বে নতুন এক আন্দোলনের উত্থান ঘটে। উম্মুল মুমিনিন আয়েশাকে ﵂ সাথে নিয়ে

---

[৮৯] *আত-তাবাকাতুল কুবরা:* ৩/১৯; *সিফাতুস সাফওয়া:* ১/৩০৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া:* ৭/৩৩৩; *আল-ইসাবাহ:* ১/৫০৭; *আল-ইসতিয়াব:* ১/১০৮৯; *আল-মুনতাজাম:* ৫/৬৬; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি: ১/৫০

[৯০] এটি তথ্যবিকৃতি ও মিথ্যাচার। পূর্বের ৮৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

বিদ্রোহীরা যখন ইরাকে আগমন করে, তখন আলি ﷺ তাদের প্রতিহত করতে তার সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে নিজ নেতৃত্বে বসরায় গমন করেন।

আলী ﷺ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সমস্যার সমাধান করেই ফেলেছিলেন প্রায়, ঠিক সেই সময় সময় ফিতনাবাজ ইহুদি আবদুল্লাহ বিন সাবা উসমানের ﷺ হত্যাকারীদেরকে সঙ্গে নিয়ে লিপ্ত হয় গোপন চক্রান্তে। প্রথমে তারা আলিকে ﷺ হত্যার পরিকল্পনা করে; কিন্তু তা অসম্ভব দেখে অন্য ষড়যন্ত্র করে। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তারা তালহা ও যুবায়েরের ﷺ বাহিনীর ওপর হামলা করে এবং ফজরের পূর্বেই পালিয়ে যায়; এতে তারা মনে করেন যে, এটি আলির ﷺ বাহিনী ঘটিয়েছে। ফলে উভয় দলের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ বেধে যায়। আলি ﷺ বিজয় লাভ করেন। তালহা বিন উবায়দুল্লাহ এবং যুবায়ের বিন আওয়াম ﷺ নিহত হন।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো ৩৬ হিজরি (৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সনে। যুদ্ধে আলির ﷺ বিপক্ষে হযরত আয়েশা ﷺ উটের ওপর আরোহণ করে যুদ্ধ করেছিলেন বলে এই যুদ্ধকে 'উটের যুদ্ধ' বলা হয়। যুদ্ধ শেষে আলি ﷺ উম্মাহাতুল মুমিনিন আয়েশাকে ﷺ সসম্মানে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দেন। তার দেখভাল করতে নিজ পুত্র হাসান ও হুসাইনকে দায়িত্ব প্রদান করেন।[৯১]

সিফফিনের যুদ্ধ

আলি ﷺ মুআবিয়ার ﷺ সাথে সুষ্ঠুভাবে বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করেন; কিন্তু মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান তাতে সম্মত হলেন না। ফলে আলি ﷺ মুআবিয়া ﷺ ও তার বিদ্রোহী-গোষ্ঠীর মোকাবেলা করতে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। ৩৭ হিজরি (৬৫৭ ইং) সনে ফোরাত নদীর নিকটবর্তী সিফফিন নামক স্থানে দুই দলের যুদ্ধ শুরু হয়।

এই যুদ্ধ ৩ দিন যাবৎ দীর্ঘায়িত হয়। যুদ্ধে হযরত আলির ﷺ বিজয় স্পষ্ট হয়ে যায়—এমন সময় মুআবিয়ার ﷺ সেনাবাহিনী পালাতে শুরু করলে আমর ইবনুল আস ﷺ মুআবিয়াকে ﷺ কিতাবুল্লাহর ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা করতে ইঙ্গিত দেন। আলি ﷺ এমন ফায়সালার চতুরতা বুঝতে পারেন; কিন্তু তার জ্যেষ্ঠ সালারগণ তাকে এই ফয়সালা মেনে নিতে বলেন। ফলে সিদ্ধান্ত হয়, আলির ﷺ পক্ষ থেকে একজন ও মুয়াবিয়ার ﷺ পক্ষ হতে একজন সালিশ-প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে একটি

---

[৯১] দ্রষ্টব্য—*নাসবুর রায়াহ*, যায়লায়ি: ৪/৭০; *আল-ইসতিআব*: ১/২৭৫; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ২/১৯৩, ৩/২১১

সুষ্ঠু সমাধান বের করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলির ﷺ পক্ষ হতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রখ্যাত সাহাবী আবু মূসা আশআরিকে ﷺ এবং মুয়াবিয়ার ﷺ পক্ষে আমর ইবনুল আসকে ﷺ সালিশ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।

চুক্তি অনুযায়ী উভয়েই দাওমাতুল জান্দালে মিলিত হন। অনেক কথা কাটাকাটির পর উভয় দল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আলি ﷺ এবং মুয়াবিয়া ﷺ—উভয়কে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা হবে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে নতুন করে খলিফা-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ-ঐকমত্যের পর উভয়ে সিদ্ধান্ত শোনানোর জন্য জনসম্মুখে আসেন। আমর ইবনুল আস ﷺ আবু মূসা আশআরিকে ﷺ প্রথমে ফয়সালা শোনানোর আহ্বান জানান। কেননা তিনি বয়সে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর বলেন, 'অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমরা এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমরা আলি ﷺ এবং মুয়াবিয়া ﷺ—উভয়কে তাদের পদ থেকে অপসারিত করলাম এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে নতুন করে খলিফা-নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হলো।'

তারপর আমর ইবনুল আস ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন, 'আবু মূসা আশআরি ﷺ নিজের লোককে অপসারিত করেছেন, তা আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। আর মুয়াবিয়া যেহেতু উসমানের ﷺ আত্মীয় এবং তার পদের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, তাই তাকে খলিফা ঘোষণা করছি।[৯২]

ফলে নতুনভাবে ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং আলির ﷺ দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল আলির ﷺ পক্ষে থাকে (যারা শিয়া নামে পরিচিত হয়), অপর দল বিদ্রোহী হয়ে যায়। এই বিদ্রোহী-গোষ্ঠী পরবর্তীতে খাওয়ারিজ বা খারিজি নামে

---

[৯২] বিশুদ্ধ বর্ননা থেকে এই দুই সাহাবির আলোচনায় বসা প্রমানিত হলেও তাদের কথোপকথনের বিস্তারিত বিবরণ নেই এসব বর্ননায়। বিশুদ্ধ বর্ননায় এমন কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই, যেখানে হযরত আমর ইবনুল আস ﷺ কুবুদ্ধি খাটিয়ে হযরত মুয়াবিয়াকে ﷺ ক্ষমতায় বহাল রাখতে চেয়েছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)। এই ধরনের বর্ননাগুলো তাবারিসহ ঐতিহাসিকদের মধ্যে যারাই এনেছেন তাদের বেশিরভাগ বর্ননা এসেছে আবু মিখনাফের হাতে ধরে সে ছিল কট্টর শিয়া। এসব বিষয়ে তার বর্ননা গ্রহনযোগ্য নয়। আবু মিখনাফ সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাইন বলেছেন, সে তো আমর বিন শিমারের চেয়েও জঘন্য। (*আত তারিখ*, ১/৩২৮)। তাবারি এই ঘটনার কয়েকটি সনদ এনেছেন ইবনু শিহাব যুহরি থেকে। তিনি একজন বড় মুহাদ্দিস কিন্তু তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন, ফলে তার বর্ননাগুলো মুরসাল। আর এসব বিষয়ে ইবনু শিহাব যুহরির মুরসাল গ্রহনযোগ্য নয়। ইয়াহইয়া ইবনু মাইন বলেছেন, যুহরির মুরসাল ধর্তব্য নয়। (*আল মারাসিল*, ৩)

পরিচিতি লাভ করে। খারিজিরা তাদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাবকে খলিফা বানিয়ে নেয়।

আলি ﷺ যখন দেখতে পেলেন, খারিজিরা ফিতনা বাড়াচ্ছে এবং সঠিক পথে বাধা তৈরি করছে, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে নতুন অভিযান পরিচালনা করেন। ৩৭ হিজরিতে নাহরাওয়ান নামক স্থানে খারিজিদের বড় অংশকে শেষ করে দেন—অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। খারিজিদের পরাজিত করে আলি ﷺ ইরাকের কুফা নগরীতে নিজ শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে মুআবিয়া ﷺ খিলাফত গ্রহণের জন্য সিরিয়ায় বসে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে প্রহর গুনতে থাকেন।

সারকথা, আলির ﷺ এবং মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ানের ﷺ মধ্যবর্তী সালিশ দ্বন্দ্ব-নিরসনে কোনো ভালো ফলাফল দেয়নি, বরং এর ফলে মুসলমানদের মাঝে আরও বিদ্রোহ ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়।

আলির ﷺ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য

আলি বিন আবি তালিব ﷺ কখনো মূর্তিকে সিজদা করেননি এবং আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করেননি; যার ফলে তার নামের সাথে 'কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু' লকব দেওয়া হয়। হিজরতের সময় রাসূলের বিছানায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে ছদ্মবেশে শুয়ে ছিলেন। বিয়ে করেন রাসূলের ﷺ মেয়ে ফাতিমাকে ﷺ। হাসান ও হুসাইন তার দুই পুত্র-সন্তান। সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সুমিষ্টভাষী ছিলেন আলি ﷺ।

জীবদ্দশায় তিনি কখনো কোনো যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেননি। যার সাথেই যুদ্ধে লড়াই করেছেন, বিজয়ী হয়েছেন। বদর যুদ্ধে তিনিই সর্বপ্রথম লড়াই শুরু করেন। উহুদ ও হুনাইন যুদ্ধে রাসূলের ﷺ সাথে যারা রণাঙ্গনে অটল ছিলেন, তিনি তাদেরই একজন। প্রায় সাহাবী বিভিন্ন বিষয় জানতে এবং দ্বীনি সমাধান পেতে তার শরণাপন্ন হতেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ব্যাপারে বলেন: আলি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কাজি। রাসূলের ওফাতের সময় তিনি যে-ছয়জনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন,—উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ ভাষ্যমতে—হযরত আলি ﷺ তাদেরই একজন।[৯৩]

---

[৯৩] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*: ৩/১০; *তারিখুল খুলাফা*, সুয়ুতি: ১৬৬; *ফাতহুল বারি*: ৭/২৩৬; *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ২/৯১; *তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত*: ১/২৪৫; *ফাজায়িলুস সাহাবাহ*: ১১০০

খারিজিদের চক্রান্ত ও তার পরিণতি

খারিজিরা তিনজন—আলি বিন আবি তালিব ﷺ, মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ﷺ এবং আমর ইবনুল আসকে ﷺ—হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তিন খারিজি কাবায় বসে সিদ্ধান্ত নেয়, আলোচ্য তিন সাহাবীকে একই দিনে হত্যা করা হবে। তারা তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে ১৭ রমযানকে নির্ধারণ করে। সিদ্ধান্ত হয়, তারা তিনজন এই তিন সাহাবীকে স্বতন্ত্রভাবে হত্যা করবে। ফলে আবদুর রহমান বিন মুলজিম আলির ﷺ হত্যার দায়িত্ব নেয়। বারাক বিন আবদুল্লাহ তামিমি মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের ﷺ হত্যার দায়িত্ব নেয় এবং আমর বিন বকর তামিমি আমর ইবনুল আসের ﷺ হত্যার দায়িত্ব নেয়।

নির্ধারিত দিনে খারিজি এই তিন ব্যক্তি তিন সাহাবীকে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়। আবদুর রহমান বিন মুলজিম আলিকে ﷺ—ফজর নামাজের জন্য বের হলে পথে আক্রমণ করে—হত্যা করে। আমর ইবনুল আস ﷺ অসুস্থতার কারণে সে-দিন—১৭ রমযান—ঘর থেকে নামাযের জন্য বের হননি; তার স্থলে তার নায়েব খারিজা বিন আবু হাবিবা বাইরে বের হন। আমর বিন বকর তামিমি খারিজাকে আমর ভেবে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলে। এ-দিকে, বারাক বিন আবদুল্লাহ মুআবিয়া বিন সুফিয়ানকে ﷺ তরবারি দিয়ে আঘাত করে; এতে মুআবিয়া ﷺ মারাত্মকভাবে আহত হন—যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হন।[৯৪]

এভাবেই খারিজিরা তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। আলি বিন আবি তালিব ﷺ ৪০ হিজরির ১৭ রমযান (৬৬১ ইং) শহিদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে কুফা নগরীতে দাফন করা হয়।[৯৫]

হাসানের ﷺ বাইআত ও ইস্তফা

আলি বিন আবি তালিবের ﷺ মৃত্যুর দুই দিন পর তার সন্তান হাসান বিন আলির ﷺ কাছে লোকেরা বাইআত গ্রহণ করে। হাসান বিন আলির ﷺ কাছে যে-ব্যক্তি সর্বপ্রথম বাইআত গ্রহণ করে, তিনি হলেন আজারবাইজানের গভর্নর কায়স বিন সাআদ বিন উবাদা। কায়স আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নতের ওপর ভিত্তি

---

[৯৪] *তারিখে তাবারি:* ৬/৫৬-৬২

[৯৫] *আল-মুনতাজাম:* ৫/১৭৮; *তাবাকাতে ইবনে সাআদ:* ৩/৩৮; *তারিখে বাগদাদ:* ১/১৩৮

করে হাসান বিন আলির ﷺ কাছে বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর কুফা নগরীর অন্য সব লোক একে একে হাসানের ﷺ কাছে বাইআত গ্রহণ করে।[৯৬]

এ-সময় কয়েকজন সেনাপতি হাসান বিন আলিকে ﷺ মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের সাথে যুদ্ধ করা প্রয়োজন বলে প্ররোচিত করে। কিন্তু হাসান বিন আলি ﷺ কোনো ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন না। তিনি মনে করেন, মুসলমানদের বিভক্তি নাগরিক ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং উত্তম সিদ্ধান্ত হলো, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং মুসলমানদের রক্তের হেফাজত করতে তাদের সাথে সন্ধি করে নেওয়া।[৯৭]

দীর্ঘ কয়েক মাসব্যাপী বেশ কয়েকটি আলোচনা-পর্যালোচনা করে একপর্যায়ে হাসান বিন আলি এবং মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের মাঝে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিলো:

হাসান ﷺ মুআবিয়ার ﷺ জন্য খিলাফত থেকে পদত্যাগ করবেন।

মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ﷺ ইসলামি শরিয়ত প্রয়োগ করবেন। শুরা-পরামর্শ তথা মুসলমানদের নির্বাচনের মাধ্যমে তার পরবর্তী খলিফা নির্ধারিত হবে। আহলে বাইতের দেখভাল এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব তিনি নিজেই নেবেন। হাসানকে ﷺ কুফার বাইতুল মাল থেকে ৫ হাজার দিরহাম গ্রহণের অনুমতি দেবেন।

সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং তার বন্ধু আমর ইবনুল আস ﷺ ৪১ হিজরিতে কুফায় উপস্থিত হন; তখন হাসান বিন আলি ﷺ তার সাথিদের নিয়ে মুআবিয়ার ﷺ কাছে বাইআত গ্রহণ করেন। এই বছর কালিমার একতা পূর্ণ হওয়ায় বছরটাকে 'আমুল জামাআ' বলা হয়।[৯৮]

এরপর হাসান বিন আলি ﷺ তার ভাই হুসাইন ﷺ এবং তাদের চাচা আবদুল্লাহ বিন জাফরকে সাথে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন। তিনি ৪৯ হিজরি (৬৬৯ ইং) সনে মদীনাতেই ওফাত লাভ করেন। তার আম্মা ফাতিমাতুয যাহরার ﷺ কবরের কাছে 'বাকি' নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়।[৯৯]

---

[৯৬] দ্রষ্টব্য—*সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৩/১০২; *উসদুল গাবাহ*: ৪/৪৫০

[৯৭] দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি*: ২৭০৪; *আল-মুসতাদরাক*: ৩/১৭০; *মিনহাজুস সুন্নাহ*: ৪/৫৩৬

[৯৮] দ্রষ্টব্য—*ফাতহুল বারি*: ১৩/৭০; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৩/২৬৪

[৯৯] দ্রষ্টব্য—*আল-ইসতিআব*: ১/৩৮৪; *আল-ইসাবাহ*: ২/৬৮; *মারবিয়াতু খিলাফাতি মুয়াবিয়া*: ৪০২

ন্যায়পর খলিফাদের বিজয়ের প্রভাব

১১ হিজরিতে রাসূলের ওফাতের পর থেকে ৪০ হিজরি পর্যন্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে ইসলামি রাষ্ট্র সর্বত্র প্রশস্ততা লাভ করে। আরব-উপদ্বীপ, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, ইরাক, পারস্য, ককেশাশের রাজ্যসমূহ, বারকা, ত্রিপোলি, সাইপ্রাস এবং রোডস ইত্যাদি অঞ্চল মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। পতন হয় পারস্য-সাম্রাজ্যের। উৎপাটন করা হয় বাইজান্টাইন-সাম্রাজ্যের (রোমান) শেকড়।

খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়ে ইসলামের প্রচার-প্রসারও তীব্র বেগে চলমান ছিলো। শান্তির ধর্ম ইসলামের পতাকাতলে আসে আরব কর্তৃক বিভিন্ন বিজিত অঞ্চলের লোকেরা; তারা নিজেদের জীবন-যাপন ইসলামি শরিয়তের ছাঁচ ও আঙ্গিকে গঠন করে; ইসলামের স্বাধীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা এবং সমতার মতো নানা বৈশিষ্ট্যের প্রতি তারা আকৃষ্ট ছিলো।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের ﷺ যুগে মসজিদ-নির্মাণ এবং মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পৃথক পৃথক শহর তৈরি করা হয়; এমনিভাবে তার যুগে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে নিযুক্ত করা হয় বিভিন্ন মন্ত্রী ও উপদেষ্টা। ইসলামের বিজিত অঞ্চলসমূহে বিস্তার ঘটে আরবি-ভাষার। এ-সব অনারব অঞ্চলের অধিবাসীরাও আরবি-ভাষা শিখতে আগ্রহী হয়; ফলে আরব-মুসলমান কর্তৃক তাদের মাঝে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এই আরবি-ভাষা-শিক্ষা যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

উমাইয়া খিলাফত

উমাইয়া বলতে উমাইয়া বিন আবদে শামসকে বোঝায়, যিনি জাহেলি-যুগে কুরাইশ গোত্রের একজন সম্মানিত নেতা ছিলেন। সম্মান ও মর্যাদায় তিনি ছিলেন তার চাচা হাশিম বিন আবদে মানফের সমপর্যায়ের। তাই তারা জাহেলি-যুগে কুরাইশের নেতৃত্বদানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। ইসলামেও উভয় পরিবারের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকে।[১০০]

মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান

বিখ্যাত সাহাবী মুয়াবিয়াকে ﵁ উমাইয়া-খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়;[১০১] তিনিই ছিলেন উমাইয়াদের মধ্য হতে ইসলামের প্রথম খলিফা। মক্কায় হিজরতের ১৫ বছর পূর্বে তার জন্ম। মক্কায় বিজয়ের দিন তিনি, তার পিতা ও ভাই, তার মা হিন্দ এবং অবশিষ্ট উমাইয়ারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন—যদিও ইসলাম-গ্রহণে অগ্রগামিতার মর্যাদা এবং রাসূলের সহযোগিতায় তারা হাশেমি পরিবারের সমপর্যায়ের ছিলেন না। মুয়াবিয়া ﵁ ফিলিস্তিন বিজয়াভিযানে অংশ নেন।[১০২] খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ তাকে জর্ডান ও দামেশকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। উসমান ﵁ খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে সমগ্র শাম[১০৩] ভূখণ্ডের প্রশাসকের দায়িত্ব অর্পণ করেন মুয়াবিয়ার ﵁ হাতে। উসমানের ﵁ শাহাদাতের পর তিনি নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন এবং আপোসচুক্তির পর খিলাফতের দায়িত্ব পেয়ে খিলাফতকেন্দ্র দামেশকে স্থানান্তর করেন।

---

[১০০] *ইকদুল ফারিদ*: ২/৩১

[১০১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৩/১৩৭; তারিখু খলিফা: ২০৩

[১০২] দ্রষ্টব্য—বালাযুরি, *ফুতুহুল বুলদান*:১২৩

[১০৩] প্রাচীন শাম বর্তমানে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান এবং ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনকে (ওয়েস্ট ব্যাংক, গাজা স্ট্রিপ, উপকূলীয় এলাকা আল-জউফ এবং সৌদি আরবের উত্তর সীমান্ত অঞ্চল) অন্তর্ভুক্ত করে।

তার শাসনামলের বিজয়াভিযানসমূহ

মুয়াবিয়া ﷺ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় সংস্কার এবং ইসলামের বিজয়াভিযান বিস্তৃত করার প্রতি খুবই মনোযোগী ছিলেন। এ-লক্ষ্যে তিনি বিশিষ্ট তাবেয়ি মুহাল্লাব বিন আবি সুফরাকে সিন্ধু অভিমুখে অভিযানের নির্দেশ দেন। মুহাল্লাব আফগানিস্তান আক্রমণ করেন এবং ৪৪ হিজরি (৬৬৫ ইং) সনে কাবুল দখলে নেন। সেখান থেকে তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর শহর পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত রাখেন; সেনা প্রেরণ করা হয় খুরাসানেও। একপর্যায়ে সমরকন্দের কর্তৃত্বও লাভ করে মুসলিম মুজাহিদরা।[১০৪]

মুয়াবিয়া ﷺ নৌবাহিনীর শক্তি-বৃদ্ধিতেও বিশেষ তৎপর ছিলেন। এ-বাহিনীর জাহাজের সংখ্যা ছিলো ১৭০০টি। এ-সব যুদ্ধজাহাজের সাহায্যে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় পথে রোডস, সাইপ্রাস এবং গ্রিক দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশ জয় করেন। ৪৯ হিজরিতে ইসলামি বাহিনী কন্সটান্টিনোপলকে সমতল ও জলপথে ঘিরে রেখেছিলো। তবে তাদের প্রতিরক্ষা-প্রাচীরের দৃঢ়তা এবং প্রকৃতিগতভাবে দুর্ভেদ্য অবস্থানের কারণে তাদের পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, এটি ছিলো রোমান-সাম্রাজ্যের (বাইজেন্টাইন) রাজধানী।[১০৫]

উকবা বিন নাফের নেতৃত্বে ইসলামি বিজয়-অভিযান আফ্রিকায় বিস্তৃত হয়। ৬৭০ সালে তিনি ট্যানজিয়ার জয় করেন এবং সেখান থেকে চলে যান তিউনিশিয়ায়; সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন কায়রাওয়ান শহর। ৫৫ হিজরি (৬৭৫ ইং) সনে সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলেন।[১০৬]

মুয়াবিয়ার ﷺ অবদান

মুয়াবিয়া ﷺ ছিলেন একজন বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও রাজনীতিসচেতন মানুষ।[১০৭] একটি সফল রাষ্ট্র সুসংগঠিত করতে সক্ষম হন তিনি। তার আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় রেজিস্ট্রি-

[১০৪] দ্রষ্টব্য—বালাযুরি, *ফুতুহুল বুলদান*: ৪৩৯-৪৪০

[১০৫] দ্রষ্টব্য—বালাযুরি, *ফুতুহুল বুলদান*: ১৬০

[১০৬] দ্রষ্টব্য—ইবনে আসির, *আল-কামিল*: ৩/১৬৭

[১০৭] হযরত উম্মে হারাম ﷺ বলেন, "আমি রাসূলকে ﷺ বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের সর্বপ্রথম সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাহিনীর জন্য জান্নাত অবধারিত।" (সহিহ বোখারি, হা. ২৯২৪) এ-হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাল্লাব (ﷺ) বলেন, 'হাদিসটিতে হযরত মুয়াবিয়ার ﷺ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। কেননা হযরত মুয়াবিয়াই ﷺ ছিলেন ওই বাহিনীর সিপাহসালার।' (ফাতহুল বারী: ৬/১০২) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি উমায়রা ﷺ বলেন, 'রাসূল ﷺ মুয়াবিয়ার জন্য এ-দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, মুয়াবিয়াকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন ও তাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে

কার্যক্রম। দেশব্যাপী ডাক-বিভাগের প্রচলনও ঘটে তার সময়কালে। মুআবিয়া ﵁ এর আগে খিলাফত ছিলো শুরা-ভিত্তিক। ।[১০৮]

আরবদের তিনি কাছে রাখতেন এবং বিভিন্ন প্রদেশ-পরিচালনায় তাদের অগ্রাধিকার দিতেন। তাদের মধ্য থেকে বেছে নিতেন উপযুক্ত গভর্নরদের। তাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না-পেলে কঠোরতা আরোপ করতেন না।

সহনশীলতা ও ক্ষমার ক্ষেত্রে এক অনুপম উদাহরণ ছিলেন মুয়াবিয়া ﵁। এক ব্যক্তি মুয়াবিয়াকে ﵁ তীব্র নিন্দাকর কিছু কথা শোনালো (তিনি লোকটিকে কিছুই বলেননি)। আমির মুয়াবিয়াকে ﵁ বলা হলো—'আপনি তো লোকটিকে পরাভূত করতে পারতেন!' তিনি বলেন, 'আমি কোনো অধীনস্থ লোকের অন্যায়ের কাছে আমার সহনশীলতা সঙ্কীর্ণ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করি।'[১০৯]

তিনি তার চিন্তাধারার প্রকৃতি জানান দিতে গিয়ে বলেছেন, 'চাবুক দ্বারা আমার কার্য সমাধা হলে তরবারি উত্তোলন করি না; জবানেই কার্য সমাধা হলে চাবুক হাতে নিই না।'

তিনি মুসলিম-বাহিনীকে সুশৃঙ্খল রূপ দেন ও ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পর্তুগাল থেকে চিন পর্যন্ত এবং আফ্রিকা থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ৬৫ লাখ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চল তার শাসনামলে ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে ।[১১০]

মুয়াবিয়া ﵁ খিলাফত তার বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখাটা সঠিক মনে করেছিলেন। এ-লক্ষ্যে তিনি তার বিশ্বস্ত লোকদেরকে তার পুত্র ইয়াযিদের প্রতি

কবুল করুন।' (তিরমিজি, হা. ৩৮৪২)

একবার মুয়াবিয়া ﵁ রাসূল ﷺ উজু করার সময় পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন; তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, 'হে মুয়াবিয়া, যদি তোমাকে আমির নিযুক্ত করা হয়, তা হলে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ইনসাফ করবে।' মুয়াবিয়া ﵁ বলেন, 'সে-দিন থেকেই আমার বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, এ-কঠিন দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়বে।' (মুসনাদে আহমাদ হা. ১৬৯৩৩) ইবনে আব্বাসের ﵁ সূত্রে বর্ণিত—'একদিন জিবরাঈল ﵇ রাসূলের ﷺ কাছে এসে বললেন, 'হে মুহাম্মদ ﷺ, মুয়াবিয়াকে সদুপদেশ দিন; কেননা, সে আল্লাহর কিতাবের আমানতদার ও উত্তম আমানতদার।' (আল-মুজামুল আওসাত, হা. ৩৯০২)

[১০৮] দ্রষ্টব্য—তারিখুল ফাখরি: ৯৭; তারিখুল ইয়াকুবি: ২/২৭৯; ওয়াফাউল উয়াফা: ২/১১৭

[১০৯] দ্রষ্টব্য—*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১১/৪৪১

[১১০] দ্রষ্টব্য—তারিখে ত্বাবারি, মুজামুল বুলদান: ৪/৩২৩; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৩/১৫৭

আনুগত্য গ্রহণের আহ্বান জানান। রাজধানী দামেশকে বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সাধারণ সভায় এই আনুগত্যের শপথ সংঘটিত হয়েছিলো; এভাবেই ইয়াযিদ তার খিলাফতের উত্তরসূরি হন।

মুয়াবিয়া ﵁ মৃত্যুর পূর্বে হিজাযবাসীকে সম্মান জানানো, ইরাকের জনগণের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শামের জনগণের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণের ওসিয়ত করেন।[১১১] ৬০ হিজরিতে (৬৮০ ইং) তিনি দামেশকে ইন্তেকাল করেন। বিশ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন শেষে এখানেই তিনি সমাহিত হন।[১১২]

ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার খিলাফত

মুয়াবিয়ার ﵁ ইন্তেকালের পর ইয়াযিদের হাতে মুসলমানদের খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশিদিনের কিছু সংখ্যক সন্তান এবং আরও কিছু ব্যক্তি এই বাইআতে অংশ নেননি। ইয়াযিদ এই সংবাদ সম্পর্কে জানতে পেরে মদীনায় নিয়োজিত তার প্রশাসক ওয়ালিদ বিন উতবাকে এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, 'অবিলম্বে যেন তাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়।' প্রশাসক ওয়ালিদ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও আবদুল্লাহ বিন উমরের ﵁ আনুগত্য গ্রহণ করতে সক্ষম হন। তবে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ﵁ এই আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং চলে যান মক্কায়।[১১৩]

অনুরূপভাবে হুসাইন বিন আলিও ﵁ ইয়াযিদের আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ওয়ালিদকে বললেন, 'আমার মতো লোক গোপনে আনুগত্যের স্বীকৃতি দিতে পারে না। তাই যখন তুমি লোকদের কাছে যাবে এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাবে, তখন আমার থেকেও আনুগত্যের স্বীকৃতি নেবে।' তারপর তিনি মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান।

---

[১১১] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৬/২৪১; হাক্কি ইসমাইলম আল-ওয়াসিয়াতুস সিয়াসিয়া ফিল আসরিল আব্বাসি: ৪৬

[১১২] দ্রষ্টব্য—আল-ইসাবাহ: ৬/১৫৫; *তারিখে তাবারি*: ৬/২৪১

[১১৩] দ্রষ্টব্য—*আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১১/৪৬৭; আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল উমাবি: ১৩০

কারবালার বিয়োগান্ত ট্র্যাজেডি

ইরাকের শিয়া-সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন চিঠিপত্রের মাধ্যমে হুসাইন বিন আলির ﷺ হাতে বাইআত হবার আগ্রহে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছিলো। এই প্রেক্ষিতে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হুসাইন ﷺ আহলে বাইতের সদস্যবৃন্দ এবং তার অনূর্ধ্ব ৮০ জন অনুসারীকে নিয়ে ইরাক অভিমুখে রওনা হন। কারবালায় পৌঁছে তিনি উমর বিন সাআদের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন; এই বাহিনীকে—কুফায় নিয়োজিত—ইয়াযিদের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রেরণ করেছিলো। তারা হুসাইন ﷺ ও তার দলের ওপর অবরোধ আরোপ করে; এমনকি তাদেরকে পানি পর্যন্ত সরবরাহ করতেও বাধা দিচ্ছিলো।[১১৪]

তারপর হুসাইন ﷺ তাদের নেতাকে রক্তপাত ও খুনোখুনি বন্ধের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করবো। তোমরা এই তিনটির মধ্যে যে-কোনো একটি আমার জন্য মঞ্জুর করো। আমি যে-দিক থেকে এসেছি, সে-দিকেই আমাকে ফিরে যেতে দাও—আমি মক্কায় গিয়ে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করবো। আমাকে কোনো একটি সীমান্তের দিকে বেরিয়ে যেতে দাও—আমি সেখানে পৌঁছে কাফিরদের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করবো। তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে দাও এবং আমাকে সোজা ইয়াযিদের কাছে দামেশকে যেতে দাও।'

সেনাপতি আমর বিন সাআদ এ-সব প্রস্তাব মানলো না। তারা হুসাইনের ﷺ বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো; তাদের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। যুদ্ধ শেষে হুসাইন ﷺ এবং তার সব সাথি শাহাদাত বরণ করেন। এ-অসম যুদ্ধে একমাত্র ছেলে যাইনুল আবেদিন ﷺ ছাড়া সবাই শহিদ হন। তারা আহলে বাইতের ১৬ জন পুরুষ এবং হুসাইনের ﷺ ৬৪ জন সহযোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হুসাইন ﷺ মৃত্যুর আগ-মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান। হুসাইনের ﷺ ছিন্ন মস্তক বর্শাফলকে বিদ্ধ করে দামেশকে পাঠানো হয়। ইয়াযিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ছিন্ন মস্তক প্রত্যার্পণ করলে কারবালা-প্রান্তরে তাকে কবরস্থ করা হয়। ইতিহাসে এটি কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা হিসেবে পরিচিত। ঘটনাটি ৬১ হিজরির ১০ মুহাররম (৬৮০ ইং) সংঘটিত হয়।[১১৫]

---

[১১৪] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ২৬৬-৩১১; *আল কামিল ফিত তারিখ*: ২/৫৪৬
[১১৫] দ্রষ্টব্য—প্রাগুক্ত

মদীনা আক্রমণ ও মক্কা অবরোধ

কারবালায় গণহত্যার ফলে সমস্ত ইসলামি রাজ্যে ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ দানা বাঁধে। এর ফলে নড়বড়ে হয়ে ওঠে তার খিলাফতযন্ত্র। বিশেষ প্রভাব পড়ে হিজাযে। কেননা, এখানকার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি মুয়াবিয়া ﷺ কর্তৃক ইয়াযিদকে খিলাফতের উত্তরসূরি মনোনয়নের ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি।

এমতাবস্থায় ইয়াযিদ মদীনার জনগণের মনোতুষ্টি ও তাদের প্রতি সহানুভূতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এ-লক্ষ্যে তিনি মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে তার কর্মকর্তাকে চিঠি লিখে পাঠান। কর্মকর্তা নির্দেশ পালন করেন এবং আবদুল্লাহ বিন হানযালার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দামেশক পাঠান। কিন্তু তারা সেখানে ভালো কিছু দেখতে পাননি। ফলে তারা ফিরে আসেন ভগ্ন মনোরথে।[১১৬]

মদীনার জনগণ ইয়াযিদকে উৎখাতের ঘোষণা দেয়। বহিষ্কার করে তার কর্মকর্তাদের। জবাবে ইয়াযিদ মুসলিম বিন উকবার নেতৃত্বে প্রেরণ করেন দশ হাজার সেনাবাহিনীর বিশাল বহর। বিনা দ্বিধায় শহরটিতে এসে পৌঁছে তারা এবং হাররা নামক এক দিক থেকে তাদের অবরোধ করে রাখে। মদীনাবাসীকে তারা খলিফার আনুগত্যের স্বীকৃতি দিতে মাত্র তিন দিন সময় বেঁধে দিলো। শেষ পর্যন্ত রাসূলের শহরে তারা হামলা করে। অত্যন্ত বীরত্ব নিয়ে এ-হামলা মোকাবেলা করে মদীনাবাসী। কিন্তু মুসলিম বিন উকবার তরবারীর সামনে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়। এই হামলায় মদীনার অনেক যুবক ও প্রধান ব্যক্তিগণ ব্যক্তি নিহত হন। মুসলিম বিন উকবা তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় অবাধে হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালালো। ইতিহাসে এই যুদ্ধ হাররার যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ, যা সংঘটিত হয় ৬৩ হিজরি (৬৮৩ ইং) সনে।[১১৭]

উমাইয়া-সৈন্যবাহিনী মদীনা শহর ধ্বংস করার পর আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরকে ﷺ দমন করতে মক্কায় রওনা করে; এই বিখ্যাত সাহাবীই হুসাইন বিন আলির ﷺ শাহাদাতের পর নিজের খিলাফতের দিকে জনগণকে আহ্বান করছিলেন।

হুসাইন বিন নুমাইরের নেতৃত্বে ইয়াযিদের সেনাবাহিনী তাকে দমন করতে মক্কায় পৌঁছলো। তারা কামানের গোলা বর্ষণ করতে আরম্ভ করলো এবং মক্কাবাসীকে

[১১৬] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৩৭৮-৩৭৯

[১১৭] দ্রষ্টব্য—*আল কামিল ফিত তারিখ*: ৩/৪৪-৪৬

অবরুদ্ধ করে রাখলো। একপর্যায়ে কামানের শেলগুলো কাবার দেয়ালে আঘাত করে ও আগুন ধরে যায়। বিন যুবাইর এবং কাবাবাসী তা রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং উমাইয়া-বাহিনীকে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। এ-সময় মারা যান খলিফা ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া। অধিনায়ক হুসাইন বিন নুমাইর তার মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে দুই মাস মক্কা অবরোধ করে সিরিয়ায় ফিরে আসেন।[১১৮]

---

[১১৮] শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া ﵀ ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া সম্পর্কে বলেন, 'ইয়াযিদ সম্পর্কে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত; দুই দল অতি বাড়াবাড়ি করে, আরেকদল মধ্যপন্থী। সীমাহীন বাড়াবাড়ি যারা করেন, তারা মনে করেন—তিনি কাফির ও মুনাফিক ছিলেন। তিনি রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রতিশোধ নিতে সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন। তার মধ্যে দাদা উতবা, দাদার ভাই শাইবা, খালু ওয়ালিদ ইবনে উতবা ও অন্যান্য যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্যরা বদরের যুদ্ধে 'হত্যা' করেছিলো, সে-'হত্যা'র প্রতিশোধ নিতে সর্বদা কাজ করতো। এ-ধরনের আকিদা শিয়া-রাফেদি-সম্প্রদায়ের লোকেরা পোষণ করে থাকে; এরা (যারা বর্তমানে ইরান-ইরাকে ক্ষমতাশীল) আবূ বকর, উমর ও উসমানের রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো সাহাবীদেরকে কাফির বলে থাকেন; ইয়াযিদকে কাফির বলা তাদের জন্য আরও অধিক সহজ।

দ্বিতীয় সীমালঙ্ঘনকারী দল মনে করেন—তিনি একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ইমাম ছিলেন। তিনি রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোলে নিয়েছেন ও তার জন্য বরকতের দুয়া করেছেন; এমনকি তাদের কেউ কেউ তাকে আবূ বকর ও উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উপরে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ তাকে নবী পর্যন্ত বলে থাকেন (এ-মতের অনুসারীরা বর্তমানে ইয়াযিদিয়্যাহ ফিরকা নামে ইরাকে বিখ্যাত)। যাদের সামান্য আকল, জ্ঞান ও পূর্বসূরিদের সম্পর্কে ধারণা আছে, তারা সবাই জানেন যে, এ-দু' দলই গোমরাহ ও বাতিল আকিদা পোষণকারী। এ-কারণেই যাদের সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তারা ও জ্ঞানী-গুণীগণ এ-ধরনের মত পোষণ করেন না।

তৃতীয় দল মনে করেন—তিনি মুসলিম রাজা-বাদশাদের একজন; তার দোষ-গুণ দুটোই ছিলো। তিনি উসমানের রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাফির ছিলেন না। তবে তার কারণেই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হন এবং মদিনার আহলে হাররার সাথে যা ঘটেছিলো, তার জন্য তিনিই দায়ী। তিনি সাহাবী বা আল্লাহর ওলি ছিলেন না। এটি আকল, ইলম, সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞাত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত রায়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তার ব্যাপারে তিন মতে বিভক্ত। কেউ তাকে লানত দিয়ে থাকে; আবার কেউ তাকে গালিও দেন না, আবার ভালোও বাসেন না—এটি ইমাম আহমদের ﵀ মত। এ-রায়ের সাথে তার অনুসারী ও অন্যান্য অধিকাংশ মুসলমানগণ একমত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদের ﵀ ছেলে সালিহ একদা পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতিপয় লোক বলছে যে, তারা ইয়াযিদকে ভালোবাসে'; তখন তিনি বললেন, 'হে প্রিয় বৎস, যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, সে কি তাকে ভালোবাসতে পারে?' তখন পুত্র বললেন, 'পিতা, তা হলে আপনি কেন তাকে লানত দেন না?' তিনি বললেন, 'প্রিয় বৎস, তুমি কি কখনো তোমার বাবাকে কাউকে লানত দিতে দেখেছো?

খিলাফতের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

৬৪ হিজরি (৬৩৮ ইং) সনে ইয়াযিদের মৃত্যুর পর বনু উমাইয়া ও আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের মাঝে খিলাফতের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। উল্লেখ্য, বিন যুবাইর ﵁ হিজাযবাসীর আনুগত্য অর্জনে তত দিনে সফল হয়ে উঠেছেন।

এ-দিকে, ইয়াযিদ তার পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়াকে খিলাফতের উত্তরসূরি বানিয়ে যান। দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ছিলেন একজন মুত্তাকি পরহেজগার যুবক। বনু হাশিমের লোকজনকে তিনি ভালোবাসতেন। কিন্তু তার খিলাফতকাল ছিলো মাত্র চল্লিশ দিন।[১১৯] মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে ঘরে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। তিনি বনু উমাইয়া বা অন্য কাউকে তার পরবর্তী খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে যাননি; বরং খিলাফতের ব্যাপারটি তিনি মুসলমানদের শুরা-পদ্ধতির মাঝে রেখে যান। রোগশয্যায় ১০ দিন আপন ঘরে কাটানোর পর তিনি পরম করুণাময়ের সান্নিধ্যে চলে যান।

হিজাযে আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের বাইআত

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ﵁ ছিলেন একটি ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তার পিতা হলেন মহান সাহাবী যুবাইর বিন আওয়াম ﵁। তার মা আবু বকর সিদ্দিক-তনয়া আসমা ﵂। বিন যুবাইর একজন প্রসিদ্ধ আলিম, সাহসী বীর ও পরহেজগার হিসেবে সমধিক পরিচিত। সবাই তাকে ভালোবাসতো এবং তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলো। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর হিজাযবাসী তার কাছে খিলাফতের আনুগত্যের শপথ নেয়। তার প্রভাব ছিলো অতুলনীয়। ইরাক, মিশর, ইয়েমেন এবং পারস্যের জনগণও তার হাতে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। মোটকথা, কেবল শাম দেশ ছাড়া গোটা মুসলিম-বিশ্ব ছিলো তার নিয়ন্ত্রণে বরং শামেও তার অনেক সহায়ক ও সমর্থক ছিলো।[১২০]

আবূ মুহাম্মদ মাকদিসীকে ﵀ ইয়াযিদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমার কাছে এ-মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তাকে গালমন্দও করা যাবে না, আবার ভালোও বাসা যাবে না। আমার কাছে আরও সংবাদ পৌঁছেছে যে, আমার পূর্বপুরুষ আবূ আব্দুল্লাহ ইবন তাইমিয়াকে ﵀ ইয়াযিদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, 'আমরা তার সম্পর্কে বেশি বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি কোনোটিই করবো না।' এটিই ন্যায়সঙ্গত ও উত্তম কথা।' (মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম: ৪/৪৮১-৪৮৪)

[১১৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১১/৬৬৩

[১২০] দ্রষ্টব্য—আবদুল্লাহ বিন উসমান, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ওয়াল উমাবিয়্যিন: ৭০-৭১; তাবাকাতে ইবনে সাআদ: ৫/১৪৭

শামেও তার প্রচুর অনুসারী ও সহযোগী ছিলো। তারা বারবার তাকে আনুগত্যের শপথ করানোর জন্য জোর দিচ্ছিলো। বিন যুবাইর তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে শাম অভিমুখে রওনাও হয়েছিলেন। কিন্তু শামের পক্ষে-বিপক্ষের সকলে তার হাতে আনুগত্যের শপথ নেবে কি না, এ-ব্যাপারে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন এবং কিছুটা শঙ্কা বোধ করছিলেন। কারণ, অঢেল অর্থ ও আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত উমাইয়াদের তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন না। তাই তিনি হিজাযেই থেকে যান এবং এখানে তার খিলাফতকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা ৭৩ হিজরি পর্যন্ত মোট ৯ বছর যাবৎ বহাল ছিলো।

শামে মারওয়ান ইবনুল হাকামের বাইআত

যে-সময়ে হিজাযে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর খিলাফতের বাইআত নেন, সে-সময় উমাইয়ারা দেখতে পেলো তিনি শামের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন না। এটাকে সুযোগ মনে করলো তারা। মারওয়ান ইবনুল হাকামের দিকে ঝুঁকে পড়লো উমাইয়ারা এবং ৬৪ হিজরি (৬৮৪ ইং) সনে তার হাতে খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করলো।

জর্ডান ও হুরানের প্রশাসকরা ছিলেন উমাইয়াদের পক্ষে। মারওয়ান এ-সব দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে ছয় হাজার সৈন্যবাহিনীকে রণসাজে সাজিয়ে দাহহাক বিন কায়স ফিহরি ﷺ-এর নেতৃত্বে-থাকা আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালেন। উভয় পক্ষ দামেশকের পূর্বে অবস্থিত মারজ রাহিতে অবস্থান নেয়। ২০ দিন ধরে চলমান এই যুদ্ধে মারওয়ান ইবনুল হাকামের বাহিনী জয়লাভ করে।

এতে পোক্ত হয়ে যায় মারওয়ানের ক্ষমতা। তিনি শামের খলিফা হিসেবে নিজের পদ সুদৃঢ় রাখতে সক্ষম হন। এরপর তিনি আরেকটি বিশাল সেনাবাহিনী পাঠান মিশরে। সেখানে অভিযান চালিয়ে আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তার প্রশাসক আবদুর রহমান বিন হাজদামকে পদচ্যুত করা হয়।

এভাবে মারওয়ান ইবনুল হাকাম উমাইয়াদের পক্ষ হতে সিরিয়া ও মিশরের একচ্ছত্র নেতৃত্ব লাভ করেন। যখন মারওয়ানের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তার পরে খিলাফত পরিচালনার জন্য যথাক্রমে তার দুই ছেলে আব্দুল মালিক ও আব্দুল আযিযের পক্ষে জনগণের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নেন। এর কয়েক দিন পর ৬৫ হিজরি (৬৮৫ ইং) সনে তিনি দামেশকে মারা যান।

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ২৬ সালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে ফিকহ শেখেন। হিফজ করেন পবিত্র কুরআন মাজিদ। সাহিত্য ও কবিতায়ও উৎকর্ষ লাভ করেন তিনি।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি খিলাফত গ্রহণকালে তার ভাই আবদুল আযিয ছিলেন মিশরের গভর্নর। রাজত্বকালে তিনি নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধিতে অনন্য কীর্তি স্থাপন করেন। তন্মধ্যে রয়েছে: নীল নদের পরিমাপ নির্ধারণ, ফুসতাতে অবস্থিত আমর ইবনুল আস মসজিদ সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ড। তিনি হুলওয়ানকে তার রাজধানী নির্ধারণ করেন।

খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে মনোযোগী হন এবং রাষ্ট্রদ্রোহ ও দুর্নীতি দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। বিচক্ষণতা ও কঠোরতার মাধ্যমে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি দৃঢ় রূপ দিয়েছিলেন তিনি। আসন্ন বিপদকে নস্যাৎ করে উমাইয়া বংশের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করায় তাকে 'উমাইয়া সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[১২১]

কুফা'র নিয়ন্ত্রণ

শাম ও মিশরের অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের পর আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ওইসব এলাকায় সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে তা আয়ত্তে নেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নেন, যেগুলোতে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ﷺ নিয়োগকৃত প্রশাসকরা রাজ্য পরিচালনা করছিলো। এ-ছাড়া আফ্রিকার বার্বারদের দমন, ইরাকের খারিজি ও আলাভিদের দমনের লক্ষ্যেও তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

সে-সময় ইরাকে বিন যুবাইরের সমর্থকদের সাথে মুখতার বিন আবি উবাইদ সাকাফির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিলো। সে হুসাইন ইবনে আলির মহব্বতের দাবি করে তার হত্যাকারীদেরকে এবং ইরাকে উমাইয়াপন্থিদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তার সকল শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভে সক্ষম হন। ৬৭ সালে মসুলের নিকটবর্তী এলাকায় আবদুল্লাহ বিন যিয়াদের নেতৃত্বে উমাইয়া-সৈন্যদের পরাজিত করেন। ওই যুদ্ধে মুখতারের সেনাপতি ইবরাহিম বিন আশতার নাখায়ির

---

[১২১] *আল হুররিয়া আও আততুফান*: ১২৩; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৪/২৪৯; আবি ইয়ালা, *আল আহকামুস সুলতানিয়া*: ৭-৮

হাতে আবদুল্লাহ নিহত হন। ইয়াযিদের শাসনামলে আবদুল্লাহ ছিলেন কুফার গভর্নর। হুসাইন বিন আলি ﷺ শাহাদাত বরণ করলে তার নির্দেশে হুসাইনের মস্তক ছিন্ন করা হয় এবং ইয়াযিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের ভয় ছিলো, তিনি কুফার ওপর কর্তৃত্ব হারাবেন। তাই তিনি তার ভাই মুসআবের নেতৃত্বে একটি চৌকশ সেনাবাহিনী সেখানে পাঠান। বসরা থেকে মুহাল্লাব বিন আবি সুফরার বাহিনীও তার সাথে যোগ দেয়। ভয়াবহ এই যুদ্ধে মুখতারের বাহিনী পরাজিত হয়। তারা পালিয়ে যায় শহরের অভ্যন্তরে। হত্যা করা হয় তাদের বহু লোককে।

যুদ্ধ শেষে মুসআব বিন যুবাইর কুফার কর্তৃত্ব হাতে নেন এবং এর পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। এমন সময়ে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সেনাবাহিনীর শাম থেকে ইরাক চলে আসে। তারা মুসআবের সমর্থকদের পরাজিত করার পর প্রবেশ করে কুফায়। মুসআব, তার পুত্র ইসা, ইবরাহিম বিন আশতার এবং তাদের সহযোগীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে ৭১ হিজরিতে কুফায় বিন যুবাইরের শাসন শেষ হয়ে যায়। তারপর এখানকার অধিবাসীরা খলিফা আবদুল মালিকের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। বিখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব বিন আবি সুফরাও যোগ দেন তাদের দলে। এরপর সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্যে খারিজিদের দমনে চালানো হয় প্রচণ্ড লড়াই। কেননা, তারা খিলাফতের মাঝে মারাত্মক বিঘ্নতা সৃষ্টি করছিলো। উপর্যুপুরি লড়াইয়ে তারা পরাজিত হতে থাকে।[১২২]

বিন যুবাইরের হাত থেকে হিজায পুনরুদ্ধার

আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সামনে কেবল মক্কায় অবস্থানকারী খলিফা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ব্যতীত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না। তিনি তাকে দমন করার লক্ষ্যে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফির নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। হাজ্জাজ মক্কা অবরোধ করে পাহাড় থেকে কামানের সাহায্যে বোমা বর্ষণ করতে শুরু করেন। মক্কাবাসীর নিরাপত্তার জন্য তারা আবদুল মালিকের আনুগত্যের শর্তা বেঁধে দেয়। কামানের শেল দ্বারা আঘাত করতে থাকে পবিত্র কাবায় এবং অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর উমাইয়া সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যান। তার কিছু সমর্থক হাজ্জাজের পক্ষে গিয়ে যোগ দেয়, তার দুই ছেলে

[১২২] দ্রষ্টব্য—ইবনে নাবাতাহ, *সারহুল উয়ুন:* ১১৩; *আল-ফুতুহ:* ৭/১৪; *আল কামিল ফিত তারিখ:* ৩/১২৮

হাজ্জাজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এত কিছু সত্ত্বেও তিনি হাজ্জাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। একপর্যায়ে ৭৩ হিজরি (৬৯২ ইং) সনের জুমাদাল উলায় তিনি শহিদ হন।[১২৩]

তার শাহাদাতের পর আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা একচ্ছত্র হয়ে যায়। কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়াই গোটা ইসলামি বিশ্ব চলে আসে তার নিয়ন্ত্রণে। পুরস্কারস্বরূপ আবদুল মালিক ৭৫ হিজরিতে তার সেনাপতি হাজ্জাজকে ইরাকের গভর্নর হওয়ার দায়িত্ব দেন। হাজ্জাজ ছিলেন খুবই কঠিন ও দৃঢ় প্রকৃতির লোক। ইরাকের যাবতীয় বিদ্রোহ-বিপ্লব তিনি শক্তহাতে নির্মূল করতে সক্ষম হন।

ইবনে আশআসের বিপ্লব ও পতন

ইরাকে খারিজিদের বিভিন্ন বিপ্লব এবং ফিতনা হাজ্জাজ প্রায় দমন করেই ফেলছিলেন। ঠিক এসময় আরেক ক্ষমতাধর ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তিনি ছিলেন ইবনে আশআস। কাবুল শহর দখল করতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন আবদুর রহমান বিন আশআসের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন, হঠাৎ করে আব্দুর রহমান তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে!

তৎকালীন কাবুলের গভর্নর ছিলো রুতবেল—যে রাষ্ট্রীয় কর দিতে অস্বীকার করতো। বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারি এবং বিভিন্ন আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন: বিন আশআস পরিপূর্ণভাবে রুতবেলের শহর কাবুল দখল না-করে কিছু গনিমতের মালে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জানতে পেরে ব্যথিত হন এবং তাকে নির্দেশ দেন পুনঃআক্রমণ করে কাবুল দখল করতে।

আবদুর রহমান বিন আশআস হাজ্জাজের কথা না-মেনে তার বাহিনী নিয়ে প্রথমে বসরায় এবং পরবর্তীতে কুফা নগরীতে চলে যায়। লোকেরা হাজ্জাজের নেতৃত্বে ত্যাগ করে আবদুর রহমান বিন আশআসের কাছে বাইআত হয়। ফলে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হয়ে আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। দায়রে-তিরা নামক স্থানে পৌঁছে হাজ্জাজ শাম থেকে সাহায্য-সহযোগিতা চান। তৎক্ষণাৎ এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান। ৮৩ হিজরি (৭০২ ইং) সনের

[১২৩] দ্রষ্টব্য—*আনসাবুল আশরাফ*: ৫/৩৫৮; *আল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আল মুফতারা আলাইহি*: ৫৪; *আল-খারাশি*, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর: ১৯১; *তারিখে তাবারি*: ৩/৭৩; *আল কামিল ফিত তারিখ*: ৩/৭৩

জুমাদাস সানিয়ার দায়রে-জামাজিম নামক স্থানে এই প্রেরিত সৈন্যবাহিনী আবদুর রহমান বিন আশআসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষ ও যুদ্ধ ১০০ দিন পর্যন্ত চলমান থাকে।

পরিশেষে উমাইয়া-সৈন্যদের বিজয় হয়। আবদুর রহমান বিন আশআস রুতবেলের সাহায্য পেতে বাহিনী নিয়ে পলায়ন করে কাবুলে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রুতবেলের কাছে কর মাফ করে দেওয়ার বিপরীতে আবদুর রহমানের ছিন্ন মস্তক চেয়ে চিঠি লেখেন। রুতবেল হাজ্জাজের আনুগত্য স্বীকার করে আবদুর রহমানকে হত্যা করে এবং তার মস্তক প্রেরণ করে হাজ্জাজের কাছে।[১২৪]

বার্বারের পতন ও বিজয়ের পুনরারম্ভ

ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার শাসনামলে ৬৩ হিজরি (৬৮৩ ইং) সনে উকবা বিন নাফে তানজাহ শহর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আউরাস পাহাড়ের কাছে খ্রিস্টান রাজা বার্বার তার ওপর আতর্কিত হামলা করে। এই অতর্কিত হামলায় উকবা বিন নাফে নিহত হন। উকবাকে হত্যা করে রাজা বার্বার কায়রাওয়ান শহরে রাজত্ব কায়েম করে এবং কায়রাওয়ানকে তার পরবর্তী আরও বিভিন্ন অভিযানের মূল ঘাঁটি বানিয়ে নেয়।

উকবার মৃত্যু আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের দিগ্বিজয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। হাসসান বিন নুমানের মাধ্যমে তিনি নতুনভাবে অভিযান শুরু করেন। বার্বারদের[১২৫] পরাজিত করে উকবার জয়কৃত শহরগুলো পুনরায় জয় করা এবং রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে হাসসান বিন নোমানের নেতৃত্বে আবদুল মালিক এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। হাসসান বিন নোমান বারকা শহর দখল করেন। পরবর্তীকালে তিনি ৬৯৫ সালে বাইজেন্টাইন সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে কার্থেজ শহর বিজয় করেন। এভাবে ৬৯৮ সালে হাসান বিন নোমানের নেতৃত্বে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত উমাইয়া আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হয়।

---

[১২৪] দ্রষ্টব্য—*সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৪/১৮৩; *তারিখে তাবারি*: ৭/২১৮-২৩৩; তারিখু খলিফা: ২৭৭

[১২৫] আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত নীলনদের পশ্চিম পাশে বসবাসকারী একটি জাতিগোষ্ঠী। বার্বাররা ইসলামের পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বার্বাররা নিজেদের স্বজাতীয় 'বার্বার' ভাষা কথা বললেও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাবে আলজেরিয়া, মরক্কো এবং তিউনিসিয়ার অধিকাংশ বার্বার উচ্চ শিক্ষা বা ব্যাবসায়িক কাজের জন্য ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষা ব্যবহার করে। —*The Berbers (The Peoples of Africa).*

হাসসান বিন নুমান এটলাস পর্বতমালায় তার জয়যাত্র অব্যাহত রাখেন। সেখানে বিভিন্ন বারবার কবীলার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। সবচেয়ে মারাত্মক ছিলো কাহিনা নাম্নী এক নারীর কবীলার সঙ্গে। নামের এক আলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন নারীর নেতৃত্বে এই বারবার কবীলা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে হাসসান বিন নোমান প্রাথমিকভাবে পরাজিত হন। এ-সময় কাহিনা তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে: তোমরা ফসলাদি পুড়ে দাও এবং এই ভূমিকে অকেজো করে দাও, যাতে আরবরা এখান থেকে উপকৃত হতে না পারে।

৭০২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮৭ হিজরিতে কার্থেজ থেকে ১২৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত তাবার্জা শহরে বিন নোমান এবং কাহিনার মাঝে পুনরায় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বার্বার ও কাহিনা পরাজিত ও নিহত হয় এবং বিন নোমান অস্বাভাবিক বিজয় লাভ করেন।

মুসলমানদের এই মহান বিজয়ের পর বার্বাররা আসে ইসলামের ছায়াতলে। তারা গভীরভাবে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়। ফলে তাদের জীবন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় স্থিতিশীলতা আসে।

আবদুল মালিকের সংস্কারকর্ম

মসজিদে সাখরা ও কুবাহ নির্মাণ

৬৫ থেকে ৮৬ হিজরি পর্যন্ত এই দীর্ঘ খিলাফতকালে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। তার উল্লেখযোগ্য কিছু সংস্কার কার্যক্রম:

- তিনি পূর্ববর্তী ইসলামি শাসনামল থেকে চলে-আসা ফারসি, গ্রিক ও কিবতি ভাষায় লেখা সরকারি কাগজপত্র আরবি-ভাষায় রূপান্তর করেন।[১২৬]
- রাষ্ট্রীয় মুদ্রায় নতুনত্ব তৈরি করেন। আরবীয় দিনার, দিরহাম এবং ফুলুসকে মুদ্রা হিসেবে সীমাবদ্ধ করে দেন। দিনার ছিলো স্বর্ণমুদ্রা, দিরহাম ছিলো রুপার মুদ্রা এবং ফুলুস ছিলো তামার মুদ্রা।[১২৭]

[১২৬] দ্রষ্টব্য—*আল ইসলাহাতুল মালিয়া ওয়াত তানযিমাতুল ইদারিয়া*: ১৬৯
[১২৭] দ্রষ্টব্য—*আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আল মুফতারা আলাইহা*: ৪২৮; *তারিখু বিলাদিশ শামিল ইকতিসাদি ফিল আসরিল উমাবি*: ৩২০; *তাজদিদুদ দাওলাতিল উমাবিয়া*: ১৬৫

বায়তুল মাকদিসে মসজিদে কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণ তার অন্যতম সংস্কার কর্মকাণ্ডের নিদর্শন। ৭৩ হিজরিতে সুদক্ষ কয়েকজন কারিগর দ্বারা এই মসজিদের কাজ সমাপ্ত হয়। রাজা বিন হাইওয়া এবং ইয়াযিদ বিন সালাম—এই দুই প্রকৌশলীকে এই মসজিদ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। দীর্ঘ সাত বছর তাদের তত্ত্বাবধানে মসজিদের কাজ শেষ হয়। বিচিত্র মনিমুক্তায় কুব্বার দেয়াল ও ছাদ সুসজ্জিত করা হয়। মসজিদে কুব্বার দরজা আবৃত করা হয় স্বর্ণের পাত দিয়ে দিয়ে। মসজিদের অভ্যন্তর স্বর্ণ-রুপা-খচিত বাতি প্রজ্জ্বলন করে সুসজ্জিত করা হয়। সে-সময় পর্যন্ত এর থেকে সুন্দর কোনো দালান বা মসজিদ ছিলো না। মসজিদে কুব্বাতুস সাখরা ইসলামের ইতিহাসে প্রাচীন উৎকৃষ্ট স্থাপত্যশৈলী হিসেবে এখনো মাথা উঁচু করে আছে।[১২৮]

এ-ছাড়াও খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তার শাসনামলে বেশ কিছু সংস্কারধর্মী কাজ করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি তার দুই পুত্র ওয়ালিদ এবং তার পরে সুলাইমানকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে যান। ৭০৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮৬ হিজরিতে তিনি দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামল

৮৬ হিজরিতে পিতা আবদুল মালিক ইন্তেকালের পর পুত্র ওয়ালিদ খলিফা নিযুক্ত হন। তার শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্রের পূর্বে সিন্ধু নদ ও চীনের সীমানা থেকে শুরু করে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ওয়ালিদের শাসনকাল ছিলো সমৃদ্ধি, বিজয় ও সংস্কারের কাল।[১২৯]

তুর্কিস্তান ও সিন্ধু বিজয়

তুর্কিস্তান এবং সিন্ধু বিজয় করতে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সৈন্যবাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৮৬ হিজরি (৭০৫ খ্রিস্টাব্দ) সনে মুফাজ্জাল বিন মুহাল্লাবের স্থলে কুতায়বা বিন মুসলিম

---

[১২৮] দ্রষ্টব্য—*তাজদিদুদ দাওলাতিল উমাবিয়া*: ২০০, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১২/৪০-৪১; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৪/২৪৭

[১২৯] মুহাম্মাদ জিয়াউদ্দিন, *আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান*: ২০৮-২০৯

বাহেলিকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই কুতায়বার নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী তুর্কিস্তান অভিমুখে রওনা করে। তুর্কি সৈন্যদের বিরুদ্ধে কুতায়বা এই অভিযানে সফল হন। এবং বুখারার শাসককে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং সাহসিকতার সাথে তিনি তুর্কিস্তান বিজয় করেন। অতঃপর ৯৩ হিজরি (৭১২ খ্রিস্টাব্দ) সনে তিনি খাওয়ারিজম দেশে প্রবেশ করে বিজয় করেন সমরকন্দ। এই বিজয়ের পর তিনি সেখানকার পূর্ববর্তী সব মূর্তি ভেঙে ফেলেন এবং পূর্ণভাবে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটান।কুতাইবার এই বিজয়ের ফলেই তুর্কিস্তানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।[১৩০]

৮৯ হিজরি (৭০৮ খ্রিস্টাব্দ) সনে কুতায়বা যখন মা-ওয়ারাউন নাহর (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) বিজয় করে যাচ্ছিলেন, তখন একই সময়ে ভারতবর্ষ বিজয়ের জন্য মুহাম্মাদ বিন কাসিম সাকাফি তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম পশ্চিম উপকূল দিয়ে প্রথমে দেবল শহর (বর্তমান করাচি) বিজয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর তিনি বিরুন শহরে অভিযান চালিয়ে বিজয় লাভ করেন। ৭১২ সালেই তিনি ভারতবর্ষের সিন্ধু রাজ্য আক্রমণ করেন।

রাজা দাহিরের সাথে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের কঠিন যুদ্ধ হয়। রাজা দাহির এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং পরাজিত হয় সদলবলে। ঈমানি শক্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে মুহাম্মাদ বিন কাসিম দক্ষিণ পাঞ্জাবের মুলতান শহর আক্রমণ করেও বিজয়ী হন। মুলতান বিজয় করে তিনি প্রচুর গনিমতের সম্পদ অর্জন করেন। মূর্তিতের সামনে উপস্থাপন-করা হিন্দুদের অনেক স্বর্ণ-রুপাও মুসলমানদের হস্তগত হয়।[১৩১]

[১৩০] দ্রষ্টব্য—*সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৪/৪১০

[১৩১] নোট: জনসাধারণের মধ্যে সিংহভাগ মুসলিমদের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও, সিন্ধুর রাজা দাহির মুসলিমদের এই অগ্রযাত্রার বিরোধিতা করেন এবং মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ৭১২ সালে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শেষ হয় রাজা দাহিরের শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে। এই বিজয়ে পুরো সিন্ধু মুসলিমদের অধীনে চলে আসে।

উল্লেখ্য যে, সিন্ধুর জনসাধারণকে ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। বরং প্রকৃতপক্ষে, কারও দৈনন্দিন জীবনে কোনো পরিবর্তনই আসেনি। মুহাম্মাদ বিন কাসিম তার অধীনস্থ হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিরাপত্তা দেন এবং ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেন। উদাহরণস্বরূপ, আগের মতোই ব্রাহ্মণরা কর সংগ্রহের দায়িত্বে আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাদের মঠ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। ধর্ম পালনের এই স্বাধীনতা এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার কারণে, অনেক শহরের অধিবাসীরা গান-বাজনার মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন কাসিম এবং তার বাহিনীকে অভিবাদন জানায়।

ধারাবাহিক জয়ের মাধ্যমে মুসলিম সেনারা একই পদ্ধতিতে হিন্দুস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। সমাজের ধর্মীয় এবং সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করা ছাড়াই গজনির সুলতান মাহমুদ এবং

বই হোক, মুলতান বিজয়ের পর মুহাম্মাদ বিন কাসিম পূর্ণ ভারতবর্ষ বিজয় করতে অগ্রসর হলে তার কাছে তার মামা[১৩২] হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যুর খবর পৌঁছে। এর কিছু দিন পর খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের ইন্তেকাল হয়। ফলে ভারতবর্ষে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বিজয়ের ধারাবাহিকতা এবং ইসলামের সম্প্রসারণ স্থগিত হয়ে যায়।

আন্দালুসিয়া বিজয়ের পর্যায়ক্রম

কুতায়বা বিন মুসলিম যখন তুর্কিস্তান বিজয় করছিলেন এবং মুহাম্মাদ বিন কাসিম সাকাফি যখন সিন্ধু বিজয় করছিলেন, তখন আফ্রিকার গভর্নর মুসা বিন নুসাইর উত্তর-আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের জন্য অভিযান চালান। তিনি মরক্কোতে অবস্থিত সিউটা ছাড়া উপকূল থেকে বাইজেন্টাইনদের সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এটি ছিলো স্পেনের প্রাক্তন রাজা গিতশার সমর্থক গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ানের উপনিবেশ, যাকে গোথের একটি দল ক্ষমতাচ্যুত করে হত্যা করেছিলো। পরবর্তীকালে এই সিউটা রড্রিক (আরবদের ভাষায় লজরিক) নিজ দখলে নিয়ে নেয়।

মূসা বিন নুসাইরের প্রথম বাহিনী যখন সিউটা পৌঁছেছিলো, তখন শাসক জুলিয়ান মূসাকে ডেকে এনে আন্দালুসিয়ায় আক্রমণ করার পরামর্শ দেয়। এমনকি গোথ এবং তাদের রাজা রড্রিকের বিরুদ্ধে এই আক্রমণে যোগ দেওয়ার অঙ্গীকারও করে। মূসা বিন নুসাইর তার আবেদনে অবাক হয়ে আমিরুল মুমিনিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে জুলিয়ানের প্রস্তাবের কথা জানান।

খলিফা ওয়ালিদ মূসার আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা মেনে নেন এবং মূসাকে সার্বিকভাবে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। কেননা, সিউটার গভর্নর জুলিয়ান পরিকল্পনা বা কৌশলের মধ্য দিয়ে ধোঁকাবাজিও করতে পারে।[১৩৩]

জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে, এ-কথা সত্যি হলে উল্লেখিত অঞ্চলগুলোতে মুসলিম-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকতো না।

ইসলাম হচ্ছে উপমহাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উপমহাদেশ এখন এক বহুজাতিক ও বহু ধর্মের মানুষের অঞ্চল। এখানে ইসলামের অবস্থান কেমন, তা উপলব্ধি করা খুবই জরুরি। ইসলামকে অনেকে এমনভাবে আখ্যা দেন, যেন এটি যুদ্ধ-বিগ্রহের ধর্ম; আবার অনেকে বলেন, এটি একটি বিদেশি ধর্ম। এ-ধরনের দাবিকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচারের মাধ্যমেই মোকাবেলা করতে হবে।

[১৩২] সঠিক বর্ণনামতে হাজ্জার তার মামা নন চাচা ছিলেন- সম্পাদক

[১৩৩] *আল কামিল ফিত তারিখ*: ৩/৮২-৮৫

পরীক্ষামূলক অভিযান

সিউটার গভর্নর জুলিয়ানের অভিপ্রায়ের সত্যতা যাচাই করতে মূসা বিন নুসাইর আন্দালুসিয়ায় পরীক্ষামূলক একটি ক্ষুদ্র অভিযান চালান। ৯১ হিজরির (৭১০ খ্রিস্টাব্দ) সনে একজন বারবারী মুসলিম তারিফ বিন মালিকের নেতৃত্বে পাঁচ শ সৈনিক বাহিনীসহ এই অভিযান প্রেরণ করা হয়। গভর্নর জুলিয়ান এই অভিযানে বেশ কিছু জাহাজ দিয়ে সহযোগিতা করে। মূসা সর্বোত্তম উপায়ে তার এই অভিযান সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অভিযান শেষে তারিফ বিন মালিক গোথ গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা এবং তাদের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের ব্যাপারে মূসা বিন নুসাইরের কাছে সংবাদ পাঠান। এই ক্ষুদ্র অভিযান জুলিয়ানের অভিপ্রায়কে সত্যায়িত করে এবং গোথদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় মুসলমানদের জন্য আন্দালুসিয়া বিজয় সহজ হয়ে যায়।

তারিক বিন যিয়াদের স্পেন বিজয়

মূসা বিন নুসাইর যখন প্রায় ৭ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে আন্দালুসিয়া বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন, তখন তারিক ছিলেন তানজাহের গভর্নর। ঐতিহাসিক বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, তারিক ছিলেন মূসা বিন নুসাইরের আজাদকৃত দাস। মূসা তারিককে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বার্বার ও রোমানদের বিপক্ষে অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এ-ছাড়াও তিনি তার বেশ কিছু অভিযানে তারিককে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

৭১১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৯২ হিজরিতে জুলিয়ানের সহায়তায় তারিক স্পেনের একটি প্রণালী অতিক্রম করেন, যা বর্তমানে জিব্রাল্টার নামে পরিচিত। জিব্রাল্টার নামটি আসলে আরবি 'জাবালে তারিক' থেকে উদ্ভূত—যার অর্থ 'তারিকের পাহাড়'; অর্থাৎ তারিকের নামানুসারেই জিব্রাল্টারের নামকরণ করা হয়। জিব্রাল্টারে পৌঁছেই তারিক বিন যিয়াদ তার এবং তার সৈন্যদের বহনকারী সব জাহাজ পুড়িয়ে দেন, যাতে শত্রুদের আক্রমণের মুখে তার বাহিনী পিছু হটতে না-পারে।

বহনকারী সব জাহাজ পুড়িয়ে তারিক তার সৈন্যদের সম্মুখে স্মরণীয় একটি বক্তব্য পেশ করেন:

> "হে প্রিয় সৈন্যদল, কোথায় পালাবে তোমরা? তোমাদের পেছনে সাগর আর সামনে শত্রু। তোমাদের কাছে আছে কেবল দৃঢ়তা এবং সাহস। মনে

> রেখো, এ-দেশে তোমরা ইতরের দস্তরখানে বসা ইয়াতীমের চেয়েও অসহায়। তোমাদের সামনে শত্রু, যাদের সংখ্যা অগণিত- যাদের অস্ত্রও বেশি। কিন্তু তোমাদের শুধু তরবারি ব্যতীত কিছুই নেই। তোমরা বেঁচে থাকতে পারবে কেবল যদি শত্রুর হাত থেকে নিজেদের খাবার ছিনিয়ে আনতে পারো। যদি তোমরা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, তবে জয় নিশ্চিত। ভেবো না, আমি তোমাদের বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে যাবো। আমিই সবার সামনে থাকবো এবং আমার বাঁচার সম্ভাবনাই সবচেয়ে ক্ষীণ।"

তারিকের এই অগ্নিঝরা বক্তব্যে উপস্থিত সৈন্যদের মন সাহসে ভরে যায়। প্রতিটি সৈন্য বীরত্ব ও সাহসিকতায় চলে যায় সেনাপতি তারিকের কাতারে।[১৩৪]

রড্রিক-বাহিনীর পরাজয়

তারিক বিন যিয়াদ রড্রিকের অসংখ্য অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলার প্রস্তুতি নেন। এরপর উভয় বাহিনী গুয়াডেল্ট নদীর তীরে বর্তমান মেডিনা সিডোনিয়া শহরের কাছে মুখোমুখি হয়। দীর্ঘ সাত দিন সংঘর্ষ চলার পর অষ্টম দিনে বিজয়ী হয় মুসলিম-বাহিনী। রড্রিক-বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। রাজা রড্রিক পলায়ন করতে গিয়ে স্পেনের জেরেয নামক স্থানে পানিতে ডুবে মারা যায়।

গুয়াডেল্টের বড় যুদ্ধের পর তারিক বিন যিয়াদ মূসাকে বিজয়ের সংবাদ পাঠান। মূসা বিন নুসাইর তাকে আর সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করেন। কিন্তু তারিক মূসার কথা না-মেনে স্পেনের রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি কর্ডোভা এবং সেভিলাসহ বিভিন্ন শহর বিজয় করেন।

মাত্র পাঁচ মাসে এ-সব বড় বড় বিজয়ের মাধ্যমে তারিক বিন যিয়াদ স্পেনের অধিকাংশ শহর ইসলামের অধীনে নিয়ে আসেন। ফলে তারিকের স্পষ্ট বিজয় দিগ্বিদিক বিস্তৃতি লাভ করে।

---

[১৩৪] *আল ফান্নুল আসকারিল ইসলামি*: ৩৫২; *ওয়াফিয়াতুল আয়ান*: ৫/৩২১-৩২২ বর্ণনাটি *ওয়াফিয়াতুল আয়ান* এ এসেছে। তবে আধুনিক গবষকদের মতে এটি বানোয়াট ঘটনা। ড. রাগিব সিরজানি তার *কিসসাতু আন্দালুস* গ্রন্থে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মূসা বিন নুসাইরের অংশগ্রহণ

তারিক বিন যিয়াদের স্পেন বিজয়ে মূসা বিন নুসাইরও শরিক ছিলেন। তারিকের প্রাথমিক বিজয় সংবাদ পেয়ে মূসা বিন নুসাইর বাকি বিজয়কার্য সম্পাদন করতে ৯৩ হিজরি (৭১২ খ্রিস্টাব্দ) সনে আরও ১৮ হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনে আসেন। তিনি প্রথমে সেভিলা শহরে প্রবেশ করে ঘেরাও করে সেখানকার লোকজনকে আনুগত্য স্বীকার করান। এই শহর তারিক জয় করেছিলেন। কিন্তু তারিকের চলে যাওয়ার পরে তারা বিদ্রোহ করেছিলো। এরপর একে একে কার্মুনা, সাবার্না এবং মেরিডা শহর বিজয় করেন। এখানেই মূসার সাথে তারিক বিন যিয়াদের সাক্ষাৎ হয়। মূসা বিন নুসাইর স্পেন বিজয়পরবর্তী বিজয়ে তার আদেশ অমান্য করায় তারিককে ভর্ৎসনা করেন এবং প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তাদের উভয়ের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে উভয় নেতার মধ্যবর্তী ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। সর্বোপরি তারা দুজন মিলে সমগ্র স্পেন বিজয় করতে সক্ষম হন।[১৩৫]

স্পেন বিজয়ের সহযোগী কারণসমূহ

মুসলমানরা তাদের সাহসিকতা, যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার কারণেই স্পেন বিজয়ে সফল হতে পেরেছিলো। তবে এ-ছাড়াও কিছু কারণ তাদের এই বিজয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে:

- গোথ রাজাদের স্বৈরাচার এবং জনগণের নিপীড়ন।
- নাগরিকদের উপর বাড়তি কর আরোপিত হয়।
- গোথরা সমাজের এক শ্রেণীর মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিলো, যারা ক্রীতদাস গোষ্ঠী হিসেবেই পরিচিত ছিলো।
- গোথদের পক্ষ থেকে ইহুদি জনসাধারণকে খ্রিস্টধর্ম অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়। খ্রিস্টধর্ম অনুসরণ না-করলে তাদেরকে দেশান্তরের হুমকি দেওয়া হয়।
- গোথের রাজপরিবার এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাঝে মতবিরোধ এবং ঝগড়া সৃষ্টি হয়।

[১৩৫] দ্রষ্টব্য—*আত-তারিখুল আন্দালুসি*: ৮৩; *আল বায়ানুল মাগরিব*: ২/১৬; *আল আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল উমাবি*: ৩১৬

ওয়ালিদের শেষ সময়ে তিনি তার ছেলে আবদুল আযিযকে খিলাফতের ভার প্রদান করতে চান—যদিও তার পিতা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ওসিয়ত করেছিলেন, যেন ওয়ালিদ তার পরবর্তী খলিফা তার ভাই সুলাইমানকে বানিয়ে যায়। কিন্তু ওয়ালিদ তার বাবার কথা অমান্য করে স্বজাতির নেতৃবৃন্দেরকে তার ছেলে আবদুল আযিযের কাছে বাইআত হওয়ার আহ্বান করেন। ওয়ালিদের কথা কেবল কয়েকজন নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করে নেয়। তখন তিনি তার ভাই সুলাইমানকে জেরুজালেম থেকে এসে তার ছেলে আবদুল আযিযের কাছে বাইআত হওয়ার জন্য চিঠি লেখেন। সুলাইমান ওজর দেখিয়ে ও অসুস্থ হওয়ার ভান ধরে আবদুল আযিযের কাছে বাইআত হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানান। খলিফা ওয়ালিদ সুলাইমানকে বিশ্বাস না-করে তিনি নিজেই তার কাছে গিয়ে তাকে সিংহাসনের অধিকার থেকে জোরপূর্বক অব্যাহতি দেয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু এরই মধ্যে তার মৃত্যুর ডাক চলে আসায় তার ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। ৭১৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৯৬ হিজরিতে জমাদিউস সানিতে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ইন্তেকাল করেন।

সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের শাসনামল

৯৬ হিজরি (৭১৫ খ্রিস্টাব্দ) সনে ওয়ালিদের ভাই সুলাইমান খিলাফত লাভ করেন। খিলাফতের আসনে বসেই সুলাইমান সে-সব লোকজনের থেকে প্রতিশোধ নিতে চান, যারা তার ভাইয়ের ছেলে আবদুল আযিযকে খলিফা বানানোর ইচ্ছায় ইতিবাচক মত পোষণ করেছিলো। এদের মধ্যে ভারতবর্ষের সিন্ধু-বিজয়ী মুহাম্মাদ বিন কাসিম সাকাফিও ছিলেন। সুলাইমান মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এখানেই মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মৃত্যু হয়।

অনুরূপভাবে সুলাইমান ট্রান্সঅক্সানিয়া-বিজয়ী কুতাইবা বিন মুসলিমকেও ক্ষমতাচ্যুত করেন। পরবর্তীকালে কুতাইবা চিনের সীমানায় প্রবেশ করলে সেখানে তার ছেলে এবং ভাই-বোনদের সাথে তাকে হত্যা করা হয়। [১৩৯] মূসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন যিয়াদকেও খলিফা সুলাইমান কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যে-সমস্ত নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্রীয় পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলো, তাদেরকে সুলাইমান পুনরায় ক্ষমতার আসনে বসান। ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যাকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিলো।

---

[১৩৯] মূলত কুতাইবা নিজেই বিদ্রোহ করেছিল। এই বিদ্রোহ দমনের সময় তিনি নিহত হন।

কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের প্রয়াস

কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের জন্য সুলাইমান বিন আবদুল মালিক তার ভাই মাসলামার নেতৃত্বে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। ৭১০ সালে (খলিফা ওয়ালিদের যুগে) মাসলামা তার বাহিনী নিয়ে কন্সটান্টিনোপল থেকে ২২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি স্থানে অবতরণ করে। মাসলামা তার বাহিনীকে নিয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও কন্সটান্টিনোপল বিজয় করতে সক্ষম হননি। সুলাইমান তার ভাইয়ের শুরু-করা এই অভিযানকে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে নিজেই সাহায্যের জন্য বের হয়ে যান। কিন্তু মানবিজ এবং আন্তাকিয়ার মাঝামাঝি দাবিক নামক স্থানে পৌঁছে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অসুস্থতার কারণে তার সমুখযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি যখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী, তখন তিনি তার খিলাফতের ভার সন্তানদের কাছে দিতে চাইলেন; কিন্তু তখনো তার সবচেয়ে বড় ছেলে ছিলো মাত্র ১৮ বছর বয়সী; ফলে তিনি তার খিলাফতের ভার তার চাচাতো ভাই উমর বিন আবদুল আযিযকে প্রদান করে তার পরবর্তী খলিফা তার ভাই ইয়াযিদকে বানানোর ওসিয়ত করে যান।

৯৯ হিজরি (৭১৭ খ্রিস্টাব্দ) সনে সুলাইমান বিন আবদুল মালিক কন্সটান্টিনোপল বিজয়ে সক্ষম না-হয়েই মৃত্যুবরণ করেন।

খলিফা উমর বিন আবদুল আযিয

সুলাইমান বিন আবদুল মালিক তার চাচাতো ভাই উমর বিন আবদুল আযিযকে খিলাফতের পদে আসীন করার জন্য তার ইচ্ছার কথা লিখে রাখেন। তাতে সিলমোহর লাগান। বনু উমাইয়ার লোকদেরকে তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করতে ওসিয়ত করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এটি প্রকাশ করেননি। তার মৃত্যুর পর যখন ওসিয়তনামাটি খোলা হয়, তখন উমর বিন আবদুল আযিযের নামে বাইআত গ্রহণের ওসিয়তের ব্যাপারটি জানা যায়। সকলেই এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। কেননা, তাকওয়া, আল্লাহভীতি, ইসলামি শরিয়তের জ্ঞান, উত্তম চরিত্র ও বিনয়-নম্রতায় তিনি ছিলেন অনন্য।[১৪০]

[১৪০] *সিয়ারু আলামিন নুবালা:* ৫/১২৪-১২৬; *মিরআতুয যামান:* ১২/২৩০

নতুন এই খলিফা ৬২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪১] তার পিতা আবদুল আযিয বিন মারওয়ান তার ভাই খলিফা আবদুল মালিকের যুগে মিশরের গভর্নর ছিলেন। তার মা হলেন উম্মে আসিম লায়লা বিনতে উমর ইবনুল খাত্তাব। মদীনার বিশিষ্ট ফকিহগণের নিকট তিনি ফিকহ শেখেন। সেখানে তিনি সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বনু উমাইয়ার খলিফাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র ভূষণের অধিকারী। এ কারণে তাকে 'আল খলিফাতুস সালিহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি একাধারে ছিলেন একজন উত্তম সংস্কারক ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তি। তার পিতামহ উমর ইবনুল খাত্তাব শাসন ব্যবস্থার নীতি অনুসরণ করেন; এমনকি এই নীতি তিনি তার নিত্য জীবন—তথা পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারেও প্রয়োগ করেন।[১৪২]

খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর তিনি দামেশকের জামে উমাবি মসজিদে যান এবং লোকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন:

> "আমি বিচারক নই, তবে আমি একজন ফয়সালাকারী। আমি বিদআত তথা নতুন বিষয়ের উদ্ভাবক নই, আমি একজন অনুসারী। আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। তবে তোমাদের চেয়ে আমার দায়িত্ব বেশি।"[১৪৩]

নামাযের পর খলিফার জন্য নির্ধারিত কিছু সওয়ারী আনা হলে আনা হলে তিনি বলেন আমি আমার বাহন পরিবর্তন করবো না। তিনি সেসব সওয়ারী বিক্রি করে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

শান্তির নীতিমালা

উমর বিন আবদুল আযিয তার খিলাফতের নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করেন মহান আল্লাহর বাণী:

> নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকটাত্মীয়দের দান করার
> আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে

[১৪১] বিস্তারিত: *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১২/৬৭৬; *আল-আসারুল ওয়ারিদাহ আন উমার ইবনি আবদিল আযিয ফিল আকিদা*: ১/৫৪

[১৪২] প্রাগুক্ত

[১৪৩] ইবনুল হাকাম, *সিরাতু উমর ইবনু আবদিল আযিয*: ৩৫-৩৬

> নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। সুরা নাহল: আয়াত ৯০

তিনি স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি, দল ও পক্ষপাতিত্ব নীতি পরিত্যাগ করেন। প্রজাবাৎসল্য ও ধর্মভীরু খলিফা উমাইয়া বংশের প্রতি কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ না-করে সকল শ্রেণির প্রজাদের সমান সুযোগ-সুবিধা দান করতেন। মানবতার সেবা এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাপালনই ছিলো খলিফা দ্বিতীয় উমরের শাসনের মূল মন্ত্র। অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি অত্যাচারী, লোভী ও অযোগ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বরখাস্ত করে তদস্থলে বিশ্বস্ত, পরোপকারী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেন। কেননা, তিনি ছিলেন দলীয়, গোত্র ও বংশীয় স্বার্থের উর্ধ্বে।

উমর বিন আব্দুল আযিয ছিলেন পুরো মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক। তাই তিনি মুসলিম উম্মাহকে দলাদলির উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনা হাতে নেন। প্রশাসনের লোকদেরকে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তাদের মাঝে যারা জুলুমের শিকার তাদের জুলুম দূর করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এভাবে তিনি গোটা রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সব ধরনের বিদ্রোহ দূরীভুত হয়ে যায়। শিয়াদের সঙ্গে তিনি এক ধরনের অলিখিত সন্ধী করেন যে কারণে দেখা যায় তার শাসনামলে শিয়াদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বিদ্রোহ দেখা যায় নি।

নতুন কর বাতিল

বনু উমাইয়ার অন্যান্য খলিফারা অনারব মুসলিমদের কাছ থেকে জিম্মিদের (ইহুদি-খ্রিস্টান) মতো বাড়তি কর গ্রহণ করতেন। উমর বিন আবদুল আযিয রহ. এই নীতি রহিত করেন। শাসনব্যবস্থাকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য উমর ইবনে আবদুল আযিয গোত্রীয় কোন্দল এবং আরব-অনারব বৈষম্য দূরীভূত করার প্রয়াস পান। তিনি মনে করেন, সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণির মানুষের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা না-থাকলে শোষক ও শোষিত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হবে। এ-কারণে তিনি আরব-অনারব মুসলিম এবং মাওয়ালী তথা অনারব মুসলমান যাদেরকে সচরাচর সেবক শ্রেণী হিসেবে দেখা হতো তাদের মধ্যে বৈষম্য দূর করবার সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

খলিফা উমরের পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে মাওয়ালিগণ আরব মুসলমানদের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারতো না—যদিও তারা যুদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতো। খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তিনি মাওয়ালিদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেন। উমর পূর্ববর্তী খলিফাদের ধার্যকৃত কর পরিবর্তন করে মাওয়ালিদের জিজিয়া-কর থেকে অব্যাহতি দেন এবং মাওয়ালিদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন। মহানুভবতা ও উদারতার মূর্তপ্রতীক উমর আহলা, সাইপ্রাস ও নাজরানের খ্রিস্টানদের বার্ষিক করও হ্রাস করেন। তিনি খুরাসান, ইরাক, সিন্ধুদেশের নবদীক্ষিত মুসলমানদের খারাজ ও জিজিয়া-কর থেকে অব্যাহতি দেন।

মালিকদের সম্পত্তি প্রত্যার্পণ

ইসলামি শরিয়তের বিধানাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য তার পূর্ববর্তী খেলাফত-ব্যবস্থায়—উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালে যে-সব জমিদারদের জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি দখল করা হয়েছিলো, তা যথাযথ মালিকদের ফেরত দেওয়ার আদেশ দেন।

উমর ভোগ-বিলাসের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন এবং সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। দৃষ্টান্ত স্থাপন করার লক্ষ্যে খলিফা তার বংশের সকল উমাইয়াকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ বাইতুল মালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তার স্ত্রী ফাতেমাকে বাবা ও ভাইদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মণিমুক্তোখচিত অলঙ্কারাদি বাইতুল মালে জমা দিতে বললে সানন্দে তার আদেশ পালন করা হয়।[১৪৪]

জুলুম দূরীকরণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

খলিফা উমর পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাদের শাসন-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়েছিলেন। খলিফার অনুমতি ব্যতীত কাউকে হত্যা ও অঙ্গচ্ছেদের অনুমতি ছিলো না। এর আগে বিভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশের আদালতে গভর্নরের ইচ্ছা অনুযায়ী বিচার চলতো। তারা বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিতেন; যেমন ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। উমর বিন আবদুল আযিয এই নিয়ম রহিত করেন। এভাবে তিনি অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[১৪৫]

[১৪৪] দ্র. *মালামিহুল ইনকিলাবিল ইসলামি ফি খিলাফাতি উমর ইবনু আবদুল আযিয*: ১১৯-১২০

[১৪৫] দ্রষ্টব্য—আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*: ১৪২; ইবনুল জাওযি, *সিরাতু উমর ইবনু আবদিল আযিয*: ৯৯-১০০; *ফুতুহুল বুলদান*: ১৫৯

শান্তির নীতি ও ইসলাম প্রচার

উমর বিন আবদুল আযিযের যুগে মুসলিম-সাম্রাজ্য জুড়ে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার অনাবিল পরিবেশ বিরাজ করছিলো। তার খিলাফতকাল জুড়ে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিদ্রোহ ছিলো না। দেশ চলছিলো বিশুদ্ধ ইসলামি আইনে।

উমর রাষ্ট্র সম্প্রসারণ অপেক্ষা ধর্ম প্রচারের কাজকে অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা জিজিয়া-কর থেকে রেহাই পাবে এবং মুসলমানদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।' তার এ-নীতির ফলে অতি দ্রুত গতিতে খুরাসান, মধ্য-এশিয়ার বোখারা, সমরকন্দ, খাওয়ারিজম, নিশাপুর এমনকি আফ্রিকার বার্বারদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

তার যুগে বিজয়াভিযানের ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কারণ, তিনি রাজ্যজয়ের চেয়ে নিজের জাতিকে সংগঠিত করার ও জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিষয় পরিশুদ্ধিতে জোর তৎপরতা চালান। এ-কারণে আমরা দেখতে পাই, খলিফা সুলাইমান কর্তৃক কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের লক্ষ্যে প্রেরিত সেনা-কমান্ডার মাসলামা বিন আবদুল মালিকের বাহিনীকে তিনি থামিয়ে দেন। তারা বিজয়-অভিযান না-চালিয়ে শামে ফিরে আসেন।

যে-দেশগুলোতে বিজয়-অভিযান চালানো হয়েছিলো, সেখানকার লোকেরা ভয় ও জোরজবরদস্তি ছাড়াই ইসলামধর্মে প্রবেশ করেছিলো; এমনকি সিন্ধু ও ভারতের রাজাদেরও উমর বিন আবদুল আযিযের পক্ষ থেকে দ্বীনের আহ্বান জানানো হয়েছিলো এবং তারা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছিলেন।

খলিফা উমরের মৃত্যু

খলিফা উমর বিন আবদুল আযিয ﵀ ৩৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। উত্তর সিরিয়ার ১০১ হিজরির রজব মাসে (ফেব্রুয়ারি ৭২০ ইং) তিনি মারা যান। কথিত আছে, তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তার খিলাফতকাল ছিলো দুই বছর পাঁচ মাস। এ-স্বল্প সময়ে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অতুলনীয় সেবা করে যান। খলিফা হবার পূর্বে তিনি প্রতি বছর ৪০ হাজার দিনার আয় করতেন; কিন্তু তিনি খিলাফত লাভ করার পর (বাৎসরিক) মাত্র ৪০০ দিনার সম্পত্তি রেখে বাকি সমুদয় সম্পত্তি জনকল্যাণার্থে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দান করেন।

খলিফা উমর বিন আবদুল আযিযের জীবন ছিলো ন্যায়বিচার, সততা, উদারতা, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তার পিতামহ উমর ইবনুল খাত্তাবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যান তিনি। ফাতিমা বিনতে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ছাড়া আর কাউকে তিনি বিয়ে করেননি।[১৪৬]

কবি জারির উমর ইবনে আবদুল আযিযের মৃত্যুশোকে আবৃত্তি করেছেন

মৃত্যু-ঘোষকগণ আমাদেরকে আমিরুল মুমিনিনের মৃত্যু-ঘোষণা
শোনালো, হে হজ-উমরা পালনকারীদের সর্বোত্তম জন।

আপনি সফলতার সাথে এক গুরুভার বিষয়ের দায়িত্ব বহন করেছেন
এবং তাতে হে উমর, আপনি আল্লাহর নির্দেশমতো চলেছেন।

সূর্য আবৃত, উদিত নয়। আপনার শোকে চন্দ্র ও রাতের তারকারা সব
ক্রন্দনরত।[১৪৭]

তার মৃত্যু-শোকে কবি মুহারিব বিন দিসার আবৃত্তি করেন:

ন্যায়পরায়ণতার কারণে কোনো সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করতে মৃত্যু যদি
সমীহ বোধ করতো, তা হলে হে উমর, তোমাকে মৃত্যু
স্পর্শ করতো না।

শরিয়তের কত ন্যায়সঙ্গত বিধান আপনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা বিলুপ্ত
হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো; আর অন্যান্য সব বিধান আপনার
অপেক্ষায় ছিলো।

হায়, আমার আক্ষেপ এবং আমার সাথে শোকার্তদের আক্ষেপ ওই
সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য, যাদেরকে কবরসমূহ অতর্কিতে
অদৃশ্য করে দেয়।[১৪৮]

[১৪৬] *তারিখে তাবারি:* ৭/৪৭৫; ইবনুল জাওযি, *সিরাতু উমর ইবনু আবদিল আযিয:* ৩১৬-৩১৭; *তাযকিরাতুল হুফফায:* ১/১২০

[১৪৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া:* ১২/৭১৯

[১৪৮] প্রাগুক্ত

বনু উমাইয়া-সাম্রাজ্যের অবক্ষয়

খলিফা উমর বিন আবদুল আযিযের ইন্তেকালের পর অস্তমিত হতে থাকে বনু উমাইয়া-সাম্রাজ্যের আলোকধারা। তাদের মধ্যে যার কাঁধেই খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হতো কেউই খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না। না ছিলো তাদের জবাবদিহিতার মানসিকতা। আনন্দ-বিনোদন আর ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত থাকতেন অধিকাংশ সময়। তাদের অসহায়তা, অপচয়, ঔদ্ধত্য এবং পারস্পরিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফলে রাজ্যে দুর্বলতা ও মন্দা দেখা দিতে থাকে।

ত্রিশ বছর ধরে চলতে থাকা খিলাফতের এই সময়টাতে পাঁচজন বনু উমাইয়ার সদস্য খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্যে কেবল একজন তথা হিশাম বিন আবদুল মালিক শুদ্ধি ও সংস্কারের পথে চলেন। খিলাফতের এই পর্যায়ে যারা ক্ষমতাসীন হন, তারা হলেন:—

দ্বিতীয় ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক

উমর বিন আবদুল আযিযের মৃত্যুর পর (১০১ হি. মোতাবেক ৭২০ ইং) সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের ওসিয়ত অনুসারে ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি উমাইয়া-রাজবংশের একজন দুর্বলতম শাসক হিসেবে পরিগণিত। শাসনামলের শুরুর দিকে তিনি উমর বিন আবদুল আযিযের নীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন; কিন্তু শীঘ্রই বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সামগ্রিক পরিস্থিতি মন্দের দিকে ধাবিত হয়।

এ-সবের কারণ ছিলো রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়। তার শাসনকাল স্থায়ী হয় চার বছর। ১০৫ হিজরি (৭২৪ ইং) সনে তিনি জর্ডানে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[১৪৯]

হিশাম বিন আবদুল মালিক

হিশাম বিন আবদুল মালিক তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর ১০৫ হিজরি (৭২৪ ইং) সনে খিলাফতের মসনদে আসীন হন। তখন তার বয়স ছিলো চৌত্রিশ বৎসর। তার ভাই

[১৪৯] *তারিখে ইয়াকুবি*: ২/৩৭৬; নদবি, *তারিখে ইসলাম*: ২/২০৫

ইয়াযিদ যে-সব বিষয়ে অবহেলা ও অসতর্কতা দেখিয়েছে, তিনি তা সংস্কার ও সংশোধনের চেষ্টা করেন। উমাইয়া সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে তৎপর হন।

খলিফা হিশামের শাসনামলে মাসলামা বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে আরব-সেনারা বেশ কিছু রোমান শহর জয় করেন। তন্মধ্যে রয়েছে (৭৬৬ ইং) কায়সারিয়া, কুনিয়া ও খারশানা শহর। আরব-নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমান-গোষ্ঠীর ওপর তাদের আক্রমণ আরও শক্তিশালী করে। সেই সময়ে নৌবাহিনী-প্রধান ছিলেন আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া এবং তার বিশিষ্ট কমান্ডার ছিলেন আবদুল্লাহ বিন উকবা।

তুর্কিদের আক্রমণ ও পরাজয়

যে-সময়টাতে মুসলিম সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়েছিলো, সে-সময়ে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন হিশাম। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে এ-সব ফিতনা নিরসন করেন। এমন সময়ে তুর্কিস্তানে বিদ্রোহের লক্ষ্যে তুর্কিরা মাওয়ারাউন নাহারে (প্রাচ্যের ট্রান্স-অক্সিয়ানা) সৈন্যসমাবেশ করছিলো। ইতোপূর্বে ৯৩ হিজরিতে কুতায়বা বিন মুসলিম তাদের এ-বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক খুরাসানের আমির আসাদ বিন আবদুল্লাহ আল-কাসরিকে তুর্কিদের শায়েস্তা করতে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেন। উভয় দল ফারগানায় মুখোমুখি হয়। ভীষণ যুদ্ধ হয় সেখানে। তিনি তুর্কিদের চরমভাবে পর্যুদস্ত করেন। শত্রুদের নেতাসহ বহু সংখ্যক সেনা নিহত হয়। ঘটনাটি ঘটে ১০৮ হিজরি (৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) সনে। ফারগানায় তুর্কিদের পরাজয়ের পর রাজা খাকানের নেতৃত্বে তুর্কিরা আজারবাইজান আক্রমণ করে। তখন তার মোকাবেলার উদ্দেশ্যে অঞ্চলটির নেতা হারিস বিন আমর অগ্রসর হন। এরপর তিনি তুর্কি-সীমান্তে খাকানের মুখোমুখি হন। যুদ্ধে তুর্কি-বাহিনী পরাজিত হয়। খাকান তার পরাজিত বাহিনীর অবশিষ্টাংশ নিয়ে পালিয়ে যান।

১১২ সালে তুর্কিরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক তাদের হত্যার লক্ষ্যে জুনাইদ বিন আবদুর রহমানকে প্রেরণ করেন। ১১১ হিজরি সনে খুরাসানের ইমারত থেকে আশরাস বিন আবদুল্লাহ আস সুলামিকে পদচ্যুত করে তদস্থলে জুনাইদকে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। জুনাইদ বিপুল সংখ্যক

সৈন্য নিয়ে দ্রুত সমরকন্দের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। তিনি সমরকন্দের ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছে যান—তখন তার ও সমরকন্দের মাঝে দূরত্ব চার ক্রোশ পথ।

খাকান বহু সংখ্যক তুর্কি সেনা নিয়ে আক্রমণ করেন। মুসলমানরা শত্রুসেনার তুলনায় স্বল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও লড়াই চালিয়ে যায় এবং বুখারা ও সমরকন্দ জয় করে। এই যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুসলমান শহিদ হন। তুর্কিদের নিহতদের সংখ্যাও কম ছিলো না। এ-সময় খলিফা হিশাম তার ভাই মাসলামা বিন আবদুল মালিককে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার বাহিনী বেশ কিছু এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।

১১৪ হিজরি (৭৩২ ইং) মারওয়ান বিন মুহাম্মাদকে (মারওয়ান ইবনুল হাকামের নাতি) আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। খলিফা তার সাহায্যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য পাঠান। তিনি তুর্কি খাযারদের অঞ্চলসহ রাজ্য জয় করেন। বহু গোত্র ও রাজ্য তার পদানত হয়।[১৫০]

বার্বার বিদ্রোহ

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, হিশাম বিন আবদুল মালিক কর্তৃক খিলাফতপ্রাপ্তির সময় দেশের অবস্থা ছিলো খুবই করুণ। খুবই বিপজ্জনক ছিলো উত্তর-আফ্রিকার পরিস্থিতি। উমাইয়া-শাসনের বিরুদ্ধে বার্বার জাতি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো। তারা ১২২ হিজরি (৭৪০ ইং) সনে টানজিয়ার সড়কে এবং কায়রাওয়ানের পার্বত্য এলাকায় বিদ্রোহ করে। আরবদের সেনাঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ করে এবং তাদের বড় একটি দলকে হত্যা করে।

ঘটনা শুনে অনতিকালবিলম্বে খলিফা তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা তাদের বশে আনতে সক্ষম হয়নি। তাদের অবৈধ আন্দোলন দমন করতেও ব্যর্থ হয় সেনাবাহিনী। ফলে এদের দুষ্কৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এই অনাকাঙ্ক্ষিত আপদ থেকে নিষ্কৃতির লক্ষ্যে খলিফা হিশাম বিশিষ্ট সেনাপতি হানযালা বিন সাফওয়ানকে বার্বারদের ওপর হামলা চালানোর আদেশ দেন।

কায়রাওয়ানে উভয় দলের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তারপর খলিফার বাহিনী টানজিয়ায় তাদের অবরোধ করে রাখে এবং বিজয় লাভ করে। শেষে এটলাস

[১৫০] *আল কামিল ফিত তারিখ*: ৫/৫৪; নদবি, *তারিখে ইসলাম*: ২/২০৫

পর্বতমালার বিদ্রোহীদের সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে নির্মূল করা হয় বিদ্রোহ। এভাবে উত্তর-আফ্রিকার সর্বত্র নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ ফিরে আসে। সময়টি ছিলো ৭৪২-৭৪৩ ইং।[১৫১]

পতনের ধারাবাহিকতা

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হিশাম বিন আবদুল মালিক উমাইয়া-রাষ্ট্রব্যবস্থা-নীতি সংশোধন করেন এবং ভেঙে-যাবার-উপক্রম উমাইয়া-খিলাফত-রক্ষায় তৎপর ভূমিকা পালন করেন। খোরাসান, ইরাক ও উত্তর-আফ্রিকায় মাথাচাড়া-দিয়ে-ওঠা বিদ্রোহ দমন করেন। তুর্কি এবং খাযার জাতিকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। তার সময়ে ইসলামি সৈন্যরা বাইজেন্টাইন-সাম্রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে বিজয় লাভ করে। দক্ষিণ ফ্রাঙ্কসের (বর্তমান ফ্রান্স) দক্ষিণাঞ্চল থেকে নিয়ে তাদের এই বিজয়-অভিযান—৭৩৮ সালে—লোমবারদিয়ার (বর্তমানে ইতালি) উপকূল পর্যন্ত পৌঁছায়।

খলিফা হিশামের শাসনামলে কুফায় অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দেয়। আর এই অবস্থার সৃষ্টি হয় আলি বিন আবি তালিব ﷺ-এর নাতি যায়দ বিন আলি যাইনুল আবিদিন বিন হুসাইনের হত্যাকাণ্ডের কারণে।

হত্যাকাণ্ডের কারণ:—যায়দ নিজের একটি কাজে কুফায় আসেন; কুফাবাসী তার কাছে জড়ো হয়। বিশাল এক যুবকগোষ্ঠী তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তিনি তার সমর্থকদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এলাকা থেকে প্রস্থানের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। সময়টি ছিলো ১২২ হিজরি (৭৪০ ইং) সনের সফর মাসের বুধবার সন্ধ্যা। নির্দিষ্ট সময়টির ব্যাপারে কুফার গভর্নর ইউসুফ বিন উমর আস-সাকাফি অবহিত হন। তিনি সবাইকে মসজিদে জমায়েত করেন এবং প্রস্থান হতে বিরত রাখেন। নির্দিষ্ট সময় এলে যায়দের সাথে কেবল অনূর্ধ্ব ৩০০ জন অশ্বারোহী পাওয়া যায়। অবশিষ্ট কেউ আর তাকে সঙ্গ দিলো না। এদের সাথে কুফার গভর্নরের বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। সৈন্যদের তিরের আঘাতে যায়দ নিহত হন। তার আরও ক'জন সহযোগী এবং উমাইয়া-বাহিনীর সৈন্যরাও নিহত নয় এ-যুদ্ধে।

সারকথা, হিশাম বিন আবদুল মালিক উমাইয়া সাম্রাজ্যকে ধ্বংস ও ফাটলের হাত থেকে রক্ষা করে হারানো প্রভাব, জৌলুস ও নিরাপত্তা বজায় রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। রাজনৈতিক বিবেচনায় তাকে মুয়াবিয়া ﷺ-এর সাথে এবং ক্ষমতার

[১৫১] *আল কামিল ফিত তারিখ: ৫/৭০-৭১*

দিক দিয়ে আবদুল মালিকের সাথে তুলনা করা হতো। তার উল্লেখযোগ্য সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: মক্কায় হজযাত্রার পথে কূপ খনন, সেচ চ্যানেল নির্মাণ এবং সীমান্ত অঞ্চলের সুরক্ষা বর্ধন কার্যক্রম।

হিশাম ৫৩ বছর বয়সে ১২৫ হিজরি (৭৪৩ ইং) সনে ইন্তেকাল করেন। তার শাসনকাল ছিলো ১৯ বছর ৬ মাস।

হিশামের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি বিগড়ে যায়। উমাইয়াদের মাঝে অন্তঃকোন্দল ও বিভক্তি দেখা দেয়। দিনে দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গড়াতে থাকে এবং তাদের পতন হয়ে পড়ে অত্যাসন্ন। এভাবে গত হয় সাতটি বছর। এরপর নিশ্চিত হয় উমাইয়াদের পতন। উদ্ভব ঘটে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের। এই সাত বছরে উমাইয়া সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন চারজন খলিফা।

১. দ্বিতীয় ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ

ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক। তার মাতা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাকাফির কন্যা। চাচা হিশামের মৃত্যুর পর ১২৫ হিজরি (৭৪৩ ইং) সনে তার পিতা দ্বিতীয় ইয়াযিদের ওসিয়তের ওপর ভিত্তি করে তার হাতে খিলাফতের বাইআত নেওয়া হয়। ওয়ালিদ উমর বিন আবদুল আযিযের পর খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েছিলেন। শাসক হিসেবে ওয়ালিদ উপযুক্ত ছিলেন না।

শাসনকাজে তিনি স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেন এবং জনরোষে পতিত হন। বিভিন্ন গর্হিত কাজে জড়ানোর কারণে তার দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণের নাভিশ্বাস ওঠে। বনু উমাইয়ার বিশিষ্টজন ও সেনাপতিরা তাকে ভীষণ অপছন্দ করতেন। পরিশেষে তারা সবাই তার থেকে নিষ্কৃতি চায় এবং তার চাচাতো ভাই ইয়াযিদ ইবনুল ওয়ালিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তিনি ওয়ালিদের অপসারণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১ বছর ৩ মাস শাসন শেষে ১২৬ হিজরির জুমাদাস সানিয়ায় দ্বিতীয় ওয়ালিদকে হত্যা করা হয়।[১৫২]

২. ইয়াযিদ বিন প্রথম ওয়ালিদ

ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক। তার মাতা ছিলেন শাহফিরান্দ বিনতে ফিরোজ বিন ইয়াজদাজারদ। এই ইয়াজদাজারদ ছিলেন সর্বশেষ পারস্য-সম্রাট। আর

[১৫২] *আল কামিল ফিত তারিখ*: ৫/৯৭; *তারিখে ইয়াকুবি*: ২/৫৯৭-৫৯৮

ফিরোজের মা ছিলেন শিরওয়াইহ বিন কিসরার কন্যা। ফিরোজের নানি ছিলেন বাইজেন্টাইন-সম্রাটের কন্যা। এ-দিকে, শিরওয়াইহের মা ছিলেন তুর্কি-সম্রাট খাকানের কন্যা।

মানুষের সাথে তার কৃত অঙ্গীকার

খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর তিনি তার ভাষণে বলেন:

> "হে লোকসকল, আমি গৌরব প্রদর্শনের জন্যে, অহংকার করার জন্যে এবং পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে খলিফার পদে বসিনি; কিংবা রাজত্ব করার খায়েশ নিয়েও তা করিনি। আমি নিজেকে খুব উপযুক্ত মনে করি না। আমি বরং নিজের প্রতি অন্যায়ই করেছি। আমার প্রতিপালক যদি আমাকে দয়া না-করেন, তা হলে আমি ধ্বংস-ই হয়ে যাবো।
>
> তবে মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি অবমাননায় বিক্ষুব্ধ হয়ে আমি এ-পথে নেমেছি। আমি মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের প্রতি আহ্বানকারীরূপে এ-পথে পা বাড়িয়েছি।
>
> আমি ঠিক সেই পরিস্থিতিতে এ-কাজে নেমেছি, যখন দ্বীনের নিদর্শনগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো; তাকওয়াবানদের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিলো এবং প্রত্যেক নিষিদ্ধকে সিদ্ধ জ্ঞানকারী স্বৈরাচারী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিলো; যখন সকল বিদআত বাস্তবায়নকারী দোর্দণ্ড প্রতাপে তার মনস্কামনা পূর্ণ করে যাচ্ছিলো। বংশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সে আমার চাচাতো ভাই ছিলো।
>
> তার অবনতিশীল অবস্থা দেখে আমি তার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে ইসতিখারা করেছি, কল্যাণের পথ কামনা করেছি এবং মহান আল্লাহর নিকট দুআ করেছি যে, তিনি যেন আমাকে আমার প্রতি ছেড়ে না দেন। আমার সুহৃদ যারা, আমি এ-কাজে সহযোগিতার জন্যে তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি। যারা সাড়া দেওয়ার, তারা সাড়া দিয়েছে। আমি এ-বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অবশেষে ওই পাপিষ্ঠের পাপাচারিতা হতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে এবং এই শহর ও জনপদকে রক্ষা করেছেন। এ-সব হয়েছে মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতায়।

আপনারা আমার প্রতি কড়া নজর রাখবেন। আমি যেন সর্বশ্রেষ্ঠ জনপদের অধিবাসীদের প্রয়োজন পূরণ ব্যতীত অন্য শহরে সম্পদ স্থানান্তর না করি। আপনাদের জন্যে আমার দরজা অবারিত থাকবে—সবল লোকেরা দুর্বল লোকদের দমাতে পারবে না। আমি প্রতি বছর আপনাদেরকে ভাতা প্রদান করবো এবং প্রতি মাসের খাদ্য প্রদান করবো। ফলে মুসলমানদের জাগতিক জীবন হবে স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। উঁচু-নিচু সবার জীবন মান সমান হয়ে যাবে।

আমি যা বলেছি, তা যদি আমি পূরণ করি, তা হলে আপনারা আমার কথা মানবেন, নির্দেশ পালন করবেন এবং আমার সহযোগিতা করবেন। আর যদি আমি তা না করি, তা হলে আপনারা আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন কিংবা আমাকে সংশোধন করতে পারবেন।

আমি যদি সংশোধিত হই, তাওবা করি, আপনারা আমার তাওবা গ্রহণ করবেন। আর আপনারা যদি এমন কোনো সৎ ও দ্বীনদার মানুষ খুঁজে পান, যে আপনাদেরকে আমার ন্যায় সেবা প্রদান করবে আর আপনারা যদি তার হাতে বাইআত করতে চান, তবে তাও পারেন। সে-ক্ষেত্রে আমি সর্বপ্রথম ওই ব্যক্তির হাতে বাইআত করবো এবং তার আনুগত্যে প্রবেশ করবো। আমি আল্লাহর কাছে আমার নিজের জন্য এবং আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”[১৫৩]

খলিফা ইয়াযিদ ছিলেন শিষ্টের অনুরাগী, দুষ্টের যম। ন্যায়নিষ্ঠ ও বিনয়ী মানুষ হিসেবে তার খ্যাতি ছিলো সমধিক। মানুষকে তিনি দ্বীনের অনুসরণ ও মহান আল্লাহর আনুগত্যের আহ্বান জানাতেন। গভর্নরদেরকে জনগণের সাথে সহযোগিতা করার এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যত্নবান থাকার ওসিয়ত করতেন।

দীর্ঘ জীবন পাননি ইয়াযিদ। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যে-বছর তিনি শাসনভার কাঁধে নেন, সে-বছরই (১২৬ হিজরি মোতাবেক ৭৪৪ ইং) তিনি পরম মাওলার সান্নিধ্যে চলে যান। তার খিলাফতকাল ছিলো ৬ মাস।

[১৫৩] *তারিখুল খুলাফা*: ১২১; নদবি, *তারিখে ইসলাম*: ২/৫৬২

[illegible] সোপর্দ করেন। ফলে ওয়ালিদের [illegible] ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব [illegible] গভীরতর হয়ে যায়।

বনু উমাইয়ার শাসকেরা [illegible] কোনো পদে মা-ওয়ালি তথা অনারব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত না করার নীতি গ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় যা বিভিন্ন সময়ে [illegible] হয়ে ওঠে।

উমাইয়া শাসন ও শাসকদের মধ্যে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা তাদের একজনকে মধ্যে ভালো সব গুণের সমাবেশ খুঁজে পাই—যা প্রজাদের সন্তুষ্ট করে; আবার অন্যজনকে দেখি তার সম্পূর্ণ বিপরীত—যাদের দুঃশাসনে মানুষের অসন্তুষ্টি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছে।

উমাইয়ারা গোত্রপ্রীতি ও আঞ্চলিকতাকে উৎসাহিত করে। অথচ ইসলামে এটা [illegible] না হলেও কায়সি ও ইয়ামানিদের মধ্যে [illegible] ধারণ করেছে।

হাশেমীদের খিলাফতের দাবি এবং ইরাকে তাদের সমর্থকদের রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্থান।

উমাইয়া-যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ

উমাইয়া যুগে আরব জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছিলো এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের ন্যায়পরায়ণ খিলাফতের পথ হতে তারা বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলো।

উমাইয়া শাসনকাল—যা ৪০ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি পর্যন্ত (৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) বিস্তৃত ছিলো, এ-সময়টাতে ব্যাপকভাবে আরবি-ভাষার চর্চা হয়। বিজিত শহরগুলোতেও এই ভাষা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রিক, ফারসি ও কপ্টিক ভাষা থেকে আরবি-ভাষায় বিভিন্ন তথ্য রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র অনূদিত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে। রোমান ও ফারসি মুদ্রাগুলোর পরিবর্তে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের খিলাফতকালে দামেশকে আরব-মুদ্রার ব্যবহার ঘটে।

উমাইয়ারা শিল্প ও সাজসরঞ্জাম, বিশেষত নির্মাণসামগ্রী, প্রাসাদ-উপকরণ ও [illegible] প্রভূত উন্নতি সাধন করে। অন্যরাও তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। [illegible] ছিলো তাদের এই শিল্প-উৎকর্ষ। সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি [illegible] গঠন, ডাকঘর স্থাপন, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ ও মসজিদ-মাদরাসা [illegible] তাদের অমর কীর্তি চিরস্মরণীয়। তাদের যুগে বিজয়-অভিযানের ফলে

মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাযমকে তিনি নিম্নোক্তভাবে ফরমান লিখে পাঠিয়েছেন। সহিহ *বুখারি* শরিফে বর্ণিত হয়েছে, 'আবদুল্লাহ ইবনে দিনার (রহ.) বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযিয (রহ.) আবু বকর বিন হাজমের (রহ.) কাছে এ-মর্মে লিখে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহর (ﷺ) হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিপিবদ্ধ করো। কেননা, আমি ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকদের অন্তর্ধান ও হাদীসের ইলম বিলুপ্তির আশঙ্কা করছি।'[১৫৯]

উমর ইবনে আবদুল আযিয (রহ.) প্রখ্যাত তাবেয়ি ইমাম যুহরিকে (রহ.) বিশেষভাবে হাদীস সংকলনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, 'সর্বপ্রথম ইমাম ইবনে শিহাব যুহরি (রহ.) হাদীস সংকলনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।'[১৬০]

[১৫৯] *বুখারি*, কিতাবুল ইলম।

[১৬০] *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহি* অবলম্বনে অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

[illegible] বলেন। আস সাফফাহ হচ্ছে তার উপাধি। এই উপাধির ব্যাখ্যা [illegible] পাওয়া যায়। কারও কারও মতে, আবদুল্লাহ ছিলেন [illegible] জন্য অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত করেছেন। [illegible] কারণে তাকে বলা হতো আস সাফফাহ [illegible]। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি একদিন তার ভাষণে বলেছিলেন, '[illegible]'।[১৬২] এ কারণে তাকে বলা হয় আস সাফফাহ।[১৬৩] [illegible] ১৩২ হিজরিতে কুফায় তার জন্য খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করা হয়।[১৬৪]

আব্বাসীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি সুগঠিতকরণ

আবুল আব্বাস আস সাফফাহ শুরু থেকে ভাসমান আব্বাসীয় রাষ্ট্র একত্রীকরণ এবং প্রতিপক্ষের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের কবল থেকে দেশ রক্ষা করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি উমাইয়া ও অন্যান্য সমর্থকদের পরাজিত করেছিলেন—যারা আব্বাসীয়দের বিরোধিতা করতো।

আলাভি সম্প্রদায়কে ভীষণ ভয় পেতেন সাফফাহ। তাই তাদের জন্য হরেক রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কেননা, তিনি জানতেন, আলাভিরা বিশ্বাস করে যে,

---

সাধারণভাবে বড় সন্তানের দিকে সম্বন্ধ করেই বেশি উপনাম হয়, তবে তা জরুরি নয়। আবার কারও সন্তান না থাকলেও তাকে এমন উপনামে ডাকা জায়েয; যেমন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উপনাম ছিলো 'উম্মে আব্দিল্লাহ', অথচ তার কোনো সন্তানই ছিলো না। অনুরূপ 'আবু বকর', এটি প্রথম খলিফার উপনাম; তার আসল নাম 'আব্দুর রহমান', অথচ বকর নামে তার কোনো সন্তানই ছিলো না। উল্লেখ্য যে, 'আবু' বা 'উম্ম' যোগ ব্যতীত উপনাম হয় না।

কোনো ব্যক্তির একাধিক উপনাম বা একাধিক উপাধি যেমন জায়েয, তেমনি একই ব্যক্তির আসল নামের সাথে উপাধি ও উপনাম রাখাও জায়েয। যেমন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিচিতি—আবু হাফস উমর বিন খাত্তাব আল-ফারুক। আবু হাফস তার উপনাম, উমর বিন খাত্তাব তার আসল নাম, আর আল-ফারুক তার উপাধি।—অনুবাদক

[১৬২] দ্রষ্টব্য—ড. মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার আল-বাদরি حوارت الموق «لقاءات خيالية مع شخصيات تاريخية: পৃ. ৯

[১৬৩] প্রথম দিকের ঐতিহাসিকগণ কেউই তার নাম আস-সাফফাহ লিখেন নি। এ নাম প্রথম লিখেছেন শিয়া ঐতিহাসিক মাসউদি। এছাড়া, সাফফাহ অর্থ 'দয়ালু' ও হয়—দেখুন *লিসানুল আরব*, ইবনু মানজুর।

[১৬৪] *মাআরিফে ইবনে কুতাইবা*: ১৬২

খিলাফত কেবল আহলে বাইতের মাঝেই থাকা উচিত এবং এর একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন আলী (রা.) ও তাঁর বংশধর।

ইরাকে এই আলোচনা বিপুল সংখ্যায় সম্প্রসারিত ছিলো। সাফফাহ তাদের দমন করতে সেখানে নিয়োগ দেন আবু সালামা হাফস বিন সুলায়মান আল খাল্লালকে। তিনি উমাইয়া সমর্থকদের নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আব্বাসীয় খিলাফতের গোড়াপত্তন করেছিলেন। এরপর সাফফাহ তার ভাইকে এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য পাঠান খুরাসানের গভর্নর আবু মুসলিম খুরাসানির কাছে। এ দিকে, মাররার বিন আনাস দাব্বিকে কুফায় পাঠান আবু সালামা আল খাল্লালকে হত্যার লক্ষ্যে। তিনি তাকে হত্যা করেন এবং গুজব ছড়ানো হয় যে, খারিজিরা তাকে হত্যা করেছে। এর কারণ হচ্ছে, সাফফাহ ইতোমধ্যে আবু সালামা আল খাল্লালের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, আবু সালামা আল খাল্লাল খিলাফতের পদ আব্বাসীয়দের পরিবর্তে ফাতিমিদের হাতে সমর্পণের চেষ্টা করেছিলেন—এই তথ্য জানতে পেরেছিলেন সাফফাহ। আল্লাহই সম্যক অবগত।

এ দিকে, আবুল আব্বাস আবু মুসলিম খুরাসানি থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। অথচ এই খুরাসানি একসময় তাকে পারস্যদের থেকে রক্ষা করেছিলেন। আব্বাসীয়দের জন্য প্রাণোৎসর্গী ভূমিকার ফলস্বরূপ নানা পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। শেষে তাকে খুরাসানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু যখন তার জনবল ও শৌর্য-বীর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিলো এবং চারদিকে তার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছিলো, তখন আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ তাকে নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি তাকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করে বসেন, কিন্তু খুরাসানে বাহিনী পাঠানোর পূর্বেই সাফফাহ মৃত্যুবরণ করেন।

খলিফার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ

তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- বিরোধিতার উপাদানসমূহ ধ্বংস করে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল শক্তিশালী করা।
- মক্কা ও কুফার মধ্যবর্তী রাস্তায় মাইলফলক নির্মাণ, যাতে ভ্রমণকারীরা ভ্রমণের সময় ভ্রমণের দূরত্ব জানতে পারে।
- দামেশক থেকে ইরাকের আনবার এলাকায় খিলাফতের রাজধানী স্থানান্তর। পিতামহ হাশিমের নামে এই এলাকার নামকরণ করা হয় হাশিমিয়া আনবার।

- বসে খুতবা দেওয়ার সংস্কৃতির বিলুপ্ত, যা উমাইয়ারা চালু করেছিলো। আব্বাসীয়রা রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাতের অনুসরণ করে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতো।
- কালো রঙে আব্বাসীদের রাষ্ট্রীয় পতাকা তৈরি।

উমাইয়াদের মতো মুসলিমদের মধ্যে শুরাভিত্তিক নেতৃত্বের পরিবর্তে তিনি তার পরবর্তী নেতৃত্বের উত্তরাধিকারীদের নাম ঘোষণা করে যান। তারা হলেন যথাক্রমে তার ভাই আবু জাফর আল-মানসুর ও তার চাচাতো ভাই ঈসা বিন মূসা। এর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহ ও বিরোধের সমাধান করতে চেয়েছিলেন।

আবুল আব্বাস একজন কঠিন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি জনসাধারণের সাথে বোঝাপড়া ও আলোচনা-পর্যালোচনা পছন্দ করতেন। সাহিত্যে উৎসাহ, কবিতার প্রতি মুগ্ধতা এবং কবিদের মর্যাদাদানের গুণে বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি উম্মে সালামা নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। যিনি একজন বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক, ইতিহাস ও বিদগ্ধ বুদ্ধিমতী হিসেবে সমধিক বরিত।

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ ৩২ বছর বয়সে ১৩৬ হিজরি (৭৫৪ ঈ.) সনে আনবার শহরের গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার খিলাফতের মেয়াদ ছিলো ৪ বছর ৯ মাস।[১৬৫]

খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর

তার পূর্ণ নাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস। উপনাম—আবু জাফর আল-মানসুর। তিনি ৯৫ হিজরিতে জর্ডানের বালকা এলাকার হুমাইমা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বয়সে তিনি তার ভাই আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ হতে বড়। ভাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি খিলাফতের পদে আসীন হন। সাফফাহ যখন মারা যান, তখন তিনি ছিলেন হিজাযে। ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে দ্রুত কুফায় ফিরে আসেন। কুফাবাসী তার হাতে খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করে। সেখান থেকে তিনি পৌঁছে যান খিলাফতের রাজধানী আনবারে। সেখান থেকে আল-মানসুরের কাছে সকল ইসলামি রাজ্যের আনুগত্য গ্রহণ করা হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন দৃঢ়তা, সচেতনতা ও প্রজ্ঞাদীপ্ত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬৬]

---

[১৬৫] দ্রষ্টব্য—ইবনে আসির, *আল কামিল*: ৫/১৬১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১০/১১৪-১১৫; *ফুতুহুল বুলদান*: ৪৪৯

[১৬৬] দ্রষ্টব্য—*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১০/১৩০; মাহমুদ শাকির, *মাউসুআতুত তারিখিল*

চাচা আবদুল্লাহ বিন আলির বিরোধিতা

যে-সময় কুফা ও আনবারবাসী মানসুরের হাতে বাইআত নিচ্ছিলো, সে-সময় তার চাচা আবদুল্লাহ বিন আলি শাম দেশে নিজের পক্ষে খিলাফতের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কারণ, ইতঃপূর্বে আবদুল্লাহ ইবন আলি তার ভাতিজা সাফফাহর কাছে আনবারে আগমন করলে তিনি তাকে সাইফার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে রোম দেশ অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে তার কাছে সাফফাহর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে তিনি হাররানে ফিরে তার নিজের বাইআতের প্রতি আহ্বান জানান। এ-সময় তিনি দাবি করেন, সাফফাহ যখন তাকে শামে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তার সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনিই হবেন তার পরবর্তী খলিফা। তখন তার চারপাশে বিশাল বাহিনী সমবেত হয়।

খলিফা মানসুরের কাছে যখন তার চাচার এ-সব কর্মকাণ্ডের কথা পৌঁছে, তখন তিনি একদল উমারাসহ আবু মুসলিম খুরাসানিকে সসৈন্যে তার বিরুদ্ধে পাঠান। এ-দিকে আবদুল্লাহ বিন আলি হাররানে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বিপুল পরিমাণ রসদ ও অস্ত্রসস্ত্র মজুদ করেন।

আবু মুসলিম রওনা হয়ে যান। তার অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রধান ছিলো মালিক বিন হায়সাম আল-খুযায়ি। এরপর আবদুল্লাহ যখন আবু মুসলিমের আগমনের বিষয়ে নিশ্চিত হন, তখন তিনি ইরাকি বাহিনীর অসহযোগিতার আশঙ্কায় তাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন। এরপর আবদুল্লাহ বিন আলি সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে নাসিবাইন নামক স্থানে অবতরণ করেন। খলিফার সেনাবাহিনী এবং খলিফার চাচা আবদুল্লাহর সেনাবাহিনী মধ্যে ৫-৬ মাস ধরে যুদ্ধ চলে। এ-সব যুদ্ধ ছিলো খণ্ড খণ্ড এবং কখনো এ-দল কখন ও-দল জয়ী হচ্ছিলো। একপর্যায়ে খলিফার সৈন্যবাহিনীর নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধে ১৩৭ হিজরি সনের জুমাদাস সানিয়া মাসে পরাজিত হয়ে আবদুল্লাহ বিন আলি বসরা অভিমুখে পালিয়ে যান। সেখানে প্রশাসক হিসেবে অবস্থানরত তার ভাই সুলাইমান বিন আলির কাছে বেশ কিছু কাল আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর মানসুর তার সম্পর্কে জানতে পেরে লোক পাঠিয়ে তাকে বন্দি করে রাখেন। জেলখানায় তিনি মারা যান।[১৬৭]

ইসফাহানি: ৫/১০১

[১৬৭] তারিখে তাবারি: ৪/৩৭৭।

মানসুর ও খুরাসানির মাঝে চিঠি চালাচালি

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অবসান ঘটানোর পর খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন যে, আবু মুসলিম খুরাসানি থেকে মুক্তি পেতে হবে, তিনি নিজেকে হুমকি ও বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করছেন। ইতোপূর্বে আবুল আব্বাস সাফফাহও তার ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করছিলেন। তাকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলেও তার ইচ্ছা বাস্তবায়নের পূর্বে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। খলিফা মানসুরের পক্ষে সেনাপতি হিসেবে নাসিবাইনে দায়িত্ব পালন শেষে খুরাসানে ফেরার পূর্বে আবু মুসলিমকে তলব করেছিলেন খলিফা মানসুর। জবাবে আবু মুসলিম খলিফার উদ্দেশে চিঠিতে লিখেন:

> “আমিরুল মুমিনিনের এমন কোনো শত্রু নেই, যাকে আল্লাহ তার অধীনে আনেননি। সাসানীয় সম্রাটদের উদ্ধৃতিতে আমরা বর্ণনা করতাম, রাজারা নীরব হলে মন্ত্রী-সান্ত্রীরাই তখন সবচেয়ে আশঙ্কার জায়গা হয়। তাই আমরা আপনার নৈকট্য থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছি এবং আপনি যত দিন আমাদের সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করবেন, আমরাও তত দিন আপনার সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আগ্রহী এবং আপনার আনুগত্যে বিশ্বাসী—তবে তা নিরাপদ দূরত্বে রেখে। যদি আপনাকে তা তুষ্ট করে, তা হলে আমি আপনার একান্ত অনুগত সেবক। আর যদি আপনি আপনার ইচ্ছাই বাস্তবায়ন করতে চান, তবে নিজের প্রাণ রক্ষার্থে আমি আপনার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বাধ্য হবো।” [১৬৮]

খলিফা মানসুরের কাছে চিঠিটি পৌঁছুলে তিনি আবু মুসলিমকে জবাব দিলেন। চিঠিটির বাহক ছিলেন ঈসা বিন মূসা, তার সফরসঙ্গী ছিলেন আবু হুমাইদ আল-মারুজি। চিঠিতে খলিফা লিখেন:

> “আমি তোমার পত্রের মর্ম উপলব্ধি করেছি। তুমি ওইসব প্রতারক উজিরদের মতো নও, যারা তাদের অপরাধের আধিক্যের কারণে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা কামনা করে। আর তাদের স্বস্তি হলো, জামাআতের ঐক্য নষ্ট হওয়ায়। কিন্তু তোমার আনুগত্য হিতাকাঙ্ক্ষা এবং খলিফার সাহায্যকারীর গুরুদায়িত্ব বহন করার মাধ্যমে তুমি নিজেকে তাদের ঊর্ধ্বে রেখেছ।

[১৬৮] *তারিখে তাবারি*: ৪/৩৮২

হাসান-পরিবারের উত্তরাধিকার ও খিলাফত দাবি

এ-সময়টাতে আলি বিন আবি তালিবের বংশধরদের খিলাফতের উত্তরাধিকার আন্দোলনের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অবশ্য এই আন্দোলন শুরু হয় উমাইয়া যুগের শেষ দিকে। বিশেষত মারওয়ানের খিলাফতের শেষ দিকে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান ﷺ-এর হাতে হিজাজের একটি দল বাইআত গ্রহণ করে। তার মতো পবিত্র চরিত্রের, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চপর্যায়ের গুণাবলির জন্য তিনি 'আন-নফস উয-যাকিয়া' বা পবিত্র আত্মা উপাধি লাভ করেছিলেন।

ইতিহাসবিদ ইমাম তাবারি ﷺ বলেছেন, মুহাম্মাদ সাফফাহের হাতে বাইআত গ্রহণ করেননি। একইভাবে তিনি ও তার ভাই ইবরাহিম মানসুরের বাইআতেও অস্বীকৃতি জানান।

খলিফা মানসুর এদের দুজনকে ধরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন। তিনি ১৪৪ হিজরি সনে হজব্রত পালনকালে তাদের পিতাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, তারা কোথায় গিয়েছে, আমি জানি না। এরপর মানসুর আবদুল্লাহ বিন হাসানকে তার উভয় ছেলের সন্ধান দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। একপর্যায়ে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। হাসানিদের সকলকে বন্দি করে ইরাক স্থানান্তর করা হয়।

১৪৫ হিজরি (৭৬২ ইং) সনে হিজাযে আন্দোলন প্রকাশ পায়। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (নফসে যাকিয়া) মক্কা-মদীনার কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি তার বাইআত ও খিলাফতের দিকে আহ্বান করে শামবাসীদের কাছে দূত পাঠান। তখন তারা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, যুদ্ধ-বিগ্রহে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ও তার দলের মদীনা কর্তৃত্বের সংবাদ জানতে পেরে খলিফা মানসুর ঈসা বিন মূসার নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। মদীনাবাসীকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। মানসুরের সেনাবাহিনী মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেয়। আর তাকে ১৪৫ হিজরির রমযান মাসে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

এ-দিকে নফসে যাকিয়ার ভাই ইবরাহিম বসরায় আন্দোলন বেগবান করতে লাগলেন। নফসে যাকিয়া যখন মদীনায়, তখন ইবরাহিমের সেখানে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যায়। কারণ, আলাভি সহযোগীদের তখনো তিনি সমবেত করতে পারেননি। ইতোমধ্যে মদীনায় পৌঁছে যায় খলিফার সেনাবাহিনী। তারা এসে আন্দোলন বানচাল

করে যায়। শুরুর দিকে ইবরাহিমের পক্ষে বসরা, আহওয়াজ ও মাদায়েনে শক্ত জনমত গড়ে উঠলেও ধাপে ধাপে তিনি পরাজয় বরণ করতে থাকেন খলিফার সেনাবাহিনীর কাছে। উভয় বাহিনীর মাঝে কুফা হতে ১৬ ক্রোশ দূরবর্তী বাখমারা এলাকায় প্রচণ্ড লড়াই সংঘটিত হয়।

১৪৫ হিজরির যিলহজ মাসে রণাঙ্গনে তীরবিদ্ধ হয়ে ইবরাহিম বিন আবদুল্লাহ মারা যান। এভাবে আবদুল্লাহ হাসানের সন্তানদের হিজায ও ইরাকের বিভিন্নস্থানে হত্যা করা হয়।[১৭১]

আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী প্রতিষ্ঠা

খলিফা মানসুরের বাগদাদ নগর ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী স্থাপত্যিক নিদর্শন। আবহাওয়া, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে অনুকূল পরিবেশ বিবেচনা করে খলিফা মানসুর ইরাকের টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে প্রাচীন সাসানীয় গ্রাম বাগদাদে ১৪৫ হিজরি (৭৬২ ইং) সনে এই ঐতিহাসিক নগরটি নির্মাণ করেন। এর নির্মাণকাজ শেষ হতে প্রায় ৪ বছর সময় লেগেছিলো। এটা পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েন হতে ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

এ-ছাড়া দজলা নদীতে গড়ে তোলা হয় বাঁধানো ঘাট। শহর ঘিরে ছিলো সুরক্ষা-প্রাচীর। প্রশস্ত সুরক্ষা-প্রাচীর ছাড়াও ছিলো নানানভাবে নানা রকম প্রতিরক্ষাব্যূহ। প্রতিটি গেটের ওপর নগর-প্রতিরক্ষার জন্য একটি করে গম্বুজ এবং নিচে নির্মাণ হয় পাহারাদারদের বসবাসের স্থান। বিশাল দুর্গের ভিতর শহরে ছিলো খলিফার প্রাসাদ, বিশাল জামে মসজিদ, দিওয়ানসমূহ, খলিফার সন্তান-সন্ততির বাসস্থানসহ নানা স্থাপনা।

প্রাসাদগুলো নির্মাণে মূল্যবান পাথর, প্রাসাদের দরজাগুলোতে সোনার কারুকাজ করা ছিলো। বাগদাদের প্রবেশপথের উপর গম্বুজবিশিষ্ট একটি দর্শনকক্ষ ছিলো। ফটকের দুই প্রান্তে ছিলো লোহার দরজা।

সরকারিভাবে এর নাম দেওয়া হয় 'মদীনাতুস সালাম'। নগরটি বৃত্তাকৃতি ভূমি নকশায় নির্মিত হওয়ায় একে 'মদীনাত আল-মুদাওয়ারা' নামেও অভিহিত করা

[১৭১] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৪/৪০২; ড. আবদুল আযিয আদ-দুরি, *আল আসরুল আব্বাসিলি আউয়াল*: ৬৪

হতো। পরবর্তীকালে এ শহরটি পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো।

বৃত্তাকৃতির এই শহরটি তিন স্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিলো। এক প্রাচীর থেকে অন্য প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছিলো। এই ফাঁকা অংশকে বলা হতো ফাসিল। বহির্দেয়ালের চারদিকে চারটি বৃত্তাকৃতির তোরণ ছিলো। একটি তোরণ থেকে আরেকটি তোরণের দূরত্ব ছিলো প্রায় ৫ হাজার হাত। দুটি তোরণের মধ্যবর্তী অংশে ২৮টি করে বুরুজ ছিলো। প্রতিটি তোরণ দুটি দরজা সমন্বয়ে গঠিত ছিলো—একটি বহির্দরজা ও অন্যটি অভ্যন্তরীণ দরজা। সামরিক দিক দিয়ে এটি একটি আধুনিক কৌশল। দুই দরজার মধ্যবর্তী স্থানে খিলানছাদবিশিষ্ট একটি প্রবেশকক্ষ ছিলো। তোরণের এই দরজাদ্বার অতিক্রম করে প্রধান প্রাচীরের দুর্গ-কক্ষে যেতে হতো। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অংশে ৬০ হাত বাই ৫০ হাত পরিমাপের একটি অঙ্গন ছিলো। অঙ্গনের দুই পাশে প্রধান ফাসিলের উভয় দিকে প্রবেশ করার জন্য ছিলো দুটি দরজা।

খলিফা মানসুরের প্রাসাদটি ছিলো বর্গাকৃতি এবং এর প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ছিলো ৪০০ হাত। প্রাসাদের শীর্ষে একটি বৃত্তাকৃতির গম্বুজ ছিলো। গম্বুজের উপরিভাগ সবুজ রঙের মোজাইক দ্বারা আবৃত ছিলো বলে প্রাসাদটির নামকরণ করা হয় 'কুব্বাতুল খাদরা' বা সবুজ গম্বুজ। গম্বুজসহ প্রাসাদের উচ্চতা ছিলো ৮০ হাত। প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ছিলো একটি মসজিদ। মসজিদটিও বর্গাকৃতির চুনসুরকিতে নির্মিত হয়েছিলো, যার একেক দিকের দৈর্ঘ্য ছিলো ২০০ হাত। মসজিদের জুল্লাহ বা নামাযগৃহটি উত্তর-দক্ষিণে ১৭টি আইলে বিভক্ত ছিলো।

অর্থ-প্রাচুর্য, নিরাপত্তা, জীবনমান, ক্ষমতা, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা, স্থাপত্যকলা—এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যে-দিক থেকে বিবেচনা করলে বাগদাদকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। বাগদাদ হয়ে ওঠে গোটা বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত শহর।[১৭২]

[১৭২] দ্রষ্টব্য—তারিখে তাবারি: ৪/২৩৫, ৪৫৭; ড. ইবরাহিম আইয়ুব, আত-তারিখুল আব্বাসি: ৪৭; তারিখে বাগদাদ: ১/৭৩

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার

খলিফা মানসুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও সাহিত্যচর্চাকে বেগবান করেন। ফারসি ও গ্রিক ভাষা হতে আরবি-ভাষায় বিভিন্ন বই পুস্তক অনুবাদের জন্য উলামায়ে কেরামকে নিয়োগ দেন। এ-ছাড়া ফিকহ, তফসির, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ইত্যাদি শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদেরও জড়ো করেন বাগদাদে এবং তাদের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটান। তার যুগেই বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ মুয়াত্তা ইমাম মালিক প্রকাশিত হয়। আবু হানিফা -এর ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। আরবের প্রসিদ্ধ বই ইবনুল মুকাফফার কালিলা ওয়া দিমনার প্রকাশনাও ঘটে তার আমলে।

তিনি চারুকলায় উৎসাহিত করতেন। কৃষি এবং খালখননে ছিলেন যথেষ্ট আগ্রহী। সেনাবাহিনীকে আধুনিক শক্তিশালী উপাদানে সুগঠিত করেন। ডাকবিভাগ বিন্যস্ত করেন। প্রশাসক, সরকারি কর্মচারি ও গভর্নরদের সম্পর্কে সব তথ্য আদান-প্রদানের জন্য গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতা ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করেন।

ইসলামে নিষিদ্ধ বিদআত, কুসংস্কার ও প্রাচীন পারস্য ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে জোর অভিযান চালান। কারণ, সে-সময় খুরাসান ও মা-ওয়ারাউন নাহর এলাকায় এ-সব বিদআতের আধিক্য ছিলো। তিনি এ-সব এলাকাকে বিদআতমুক্ত করেন।[১৭৩]

খলিফা মানসুরের মৃত্যু

১৫৮ হিজরি (৭৭০ ইং) সনে হজের যাওয়ার পথে খলিফা মানসুর মারা যান। পবিত্র মক্কায় তাকে দাফন করা হয়। তখন তার বয়স ছিলো ৬৩ বছর। তার খিলাফতকাল ছিলো ২২ বছর।

ঈসা বিন মূসা তার খিলাফতের দাবি ত্যাগ করার পর মৃত্যুর পূর্বে মানসুর তার ছেলে মাহদির নামে খিলাফতের বাইআত সম্পন্ন করান। কারণ, আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ ইন্তেকালের সময় তার দুই ভাই যথাক্রমে মানসুর ও ঈসা বিন মূসার নামে মানুষকে খিলাফতের বাইআত করান। কিন্তু মানসুর চেয়েছেন, খিলাফত তার পরিবারের বাইরে না যাক। এ-লক্ষ্যে তিনি ছেলে মাহদির নামে বাইআত নেন।[১৭৪]

[১৭৩] দ্রষ্টব্য—তারিখে তাবারি: ৪/৫০৭; যাহাবি, তারিখুল ইসলাম: ১৪/১৮
[১৭৪] দ্রষ্টব্য—ইবনু কুতাইবা, আল মাআরিফ: ৩৭৮; তারিখে তাবারি: ৪/৫১৬-৫১৭

মাহদির খিলাফতকাল

পিতা মানসুরের (১৫৮ ইং) মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ আল-মাহদি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সর্বপ্রথম যে-কাজগুলো করেন, তা হলো হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত ছাড়া অন্যান্য বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থাকরণ, অযোগ্য গভর্নরদের অপসারণ এবং বিচার ও মামলা-মোকদ্দমা দ্রুত নিরসনকল্পে দক্ষ উপদেষ্টাপরিষদ গঠন।

সুন্নাহসিদ্ধ সুদৃঢ় পদ্ধতির ওপর মাহদি তার খিলাফতকর্ম পরিচালনা করেন। তিনি লড়াই করেন বিদআত নির্মূল ও ধর্মদ্রোহীদের অপতৎপরতা রোধে। কিছু কিছু বিষয়ে মাহদি তার পিতা থেকে ভিন্ন ছিলেন। যেমন বদান্যতার বিষয়টিই ধরা যাক। দুঃস্থ-গরিবদের সাহায্য-সহযোগিতায় তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। প্রচুর অর্থ বিতরণ করেছিলেন সাহিত্যসেবী ও কবিদের মাঝে। তিনি তার পিতার স্বর্ণালঙ্কার ও মূল্যবান রত্ন গরিব-অসহায় প্রজাদের মাঝে বিলিয়ে দেন।

১৬০ হিজরিতে মাহদি হজব্রত পালন করেন। সাথে ছিলেন তার ছেলে হারুনুর রশিদ। সে-দিন মক্কাবাসীর মাঝে অনেক টাকা-পয়সা বিতরণ করেন মাহদি। এরপর প্রবেশ করলেন পবিত্র মদীনায়। মসজিদে নববী প্রশস্তকরণ কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। বাগদাদ ফিরে আসার আগে তিনি মদীনায় রুকাইয়া বিনতে আমর উসমানির সাথে বিবাববন্ধনে আবদ্ধ হন।[১৭৫]

রোমান শহরের পতন ঘটানো ও কর নির্ধারণ

১৬৬ হিজরি (৭৮২ ইং) সনে খলিফা মাহদি তার ছেলে হারুনুর রশিদের নেতৃত্বে ৯৫ হাজার সৈন্যের শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে রোমান ভূখণ্ডে পাঠান। এরা দুই বছর আগে আরব অঞ্চলে টরাস পর্বতমালায় একটি অভিযান চালিয়েছিলো। আব্বাসীয় সেনাবাহিনী বসফরাসের উপকূলে যাত্রা করে এবং কন্সটান্টিনোপলের কাছ থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করেন। ওই সময় রোমের সম্রাজ্ঞী ছিলেন ইউনের স্ত্রী আগাসতা। সম্রাজ্ঞী প্রতি বছর ৭০ হাজার দিনার কর প্রদানের শর্তে হারুনুর রশিদের সাথে সন্ধি করার প্রস্তাব দেন। হারুনুর রশিদ তা গ্রহণ করেন।

বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন হারুনুর রশিদ। তার সাথে ছিলো রোমের একটি প্রতিনিধিদল, তারা তার বাবা খলিফা মাহদির কাছে কর-সম্পদ বহন করে নিয়ে

[১৭৫] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য—*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১০/১৬২; *তারিখে বাগদাদ*: ৫/৩৯৩

যাচ্ছিলো। বাগদাদে তাদেরকে চমৎকার অভ্যর্থনা জানানো হয়। এ-মহান বিজয় সম্পর্কে মারওয়ান বিন আবি হাফসা বলেন:

> "রোমের সম্রাজ্ঞী ইস্তাম্বুলে প্রজ্বলিত যুদ্ধাগ্নিকে নির্বাপিত করলেন, যখন তার রাজ্যের দেয়ালে দেয়ালে অবমাননা বিরাজ করছিলো—যুদ্ধের আগুন সর্বত্র সরগরম ছিলো। সম্রাজ্ঞী বার্ষিক প্রদেয় কর ঘোষণা করায় যুদ্ধযুদ্ধ-রব বিদূরিত হয়ে গেলো।"

১৬৯ হিজরি (৭৮৫ ইং) সনে মাহদি ইন্তেকাল করেন। সে-সময় তার বয়স ছিলো ৪৩ বছর। তার খিলাফতের মেয়াদ ছিলো ১০ বছর। বিষপ্রয়োগে তার মৃত্যু হয় বলে অনেকে ধারণা করেন। কেউ কেউ বলেন, জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কারও কারও মতে, তিনি শিকার করতে গিয়ে আঘাত পান, এতে তার মৃত্যু হয়।[১৭৬]

হাদি বিন মাহদির খিলাফতকাল

পিতার মৃত্যুর পর মূসা আল-হাদির হাতে খিলাফতের বাইআত নেওয়া হয়। কিন্তু তার মেয়াদ ১ বছর ২ মাসের বেশি ছিলো না। তার খিলাফতকালে হিজাযে গুরুতর বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া ওঠে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে: আহলে বাইতের সদস্য হুসাইন বিন আলি বিন হাসান এবং তার সমর্থকদের একটি গ্রুপের সাথে আব্বাসীয় কর্মকর্তাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। আরেক বর্ণনা মতে, মদীনাবাসী এবং আব্বাসীয় কর্মকর্তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে হুসাইন আব্বাসীয়দের বিপক্ষে অবস্থান নেন। এরপর তার সমর্থকদের একটি দলের সাথে তিনি মক্কায় চলে আসেন। এই বাড়াবাড়ির কথা খলিফা আল-হাদির কানে গেলে তিনি হুসাইন বিন আলির আন্দোলন দমন করতে মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আব্বাসির নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠান। মক্কার অদূরে উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে হুসাইন ও তার দলের বিশাল একটি অংশ মৃত্যুবরণ করেন। অবশিষ্ট কয়েকজনকে মুক্তি দেওয়া হলে তারা পালিয়ে যান। এদের মধ্যে রয়েছেন—ইদরিস বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান ও তার ভাই ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ। প্রথমজন চলে যান মরক্কো, দ্বিতীয়জন দক্ষিণ কাস্পিয়ান সাগরের দিয়ে চলে যান দাইলাম ভূমিতে।

[১৭৬] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৪/৫৭২-৫৭৪; ড. হাসান আহমাদ মাহমুদ, *আল আলামুল ইসলামি ফি আসরিল আব্বাসি*: ১৬৫

প্রজাহিতৈষী গুণ নিয়ে বহু আরব্য উপন্যাস-গল্পগাথা রচিত হয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য অবদান সমূহ হলো—ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, গরিব-দুঃখীদের জন্য সরাইখানা চালু করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নতুন নতুন মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা।

তার সময়ে নৌযোগাযোগ উন্নত হবার কারণে সুদূর ইউরোপের সাথে আব্বাসি খিলাফতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তার শাসনাধীন এলাকায় ব্যবসায়ীদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা প্রধান করা হয়। ফলে ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়।

তার আমলে অন্যতম আমূল পরিবর্তনকারী ঘটনা হলো, 'দার বিমারিস্তান' নামক চিকিৎসালয় স্থাপন। এটি ছিলো বৃহৎ আকারের একটি চিকিৎসালয়, যেখানে মুসলিম-বিশ্বের নামকরা সব চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা সেবাপ্রদান ও গবেষণাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে আল-রাজি ছিলেন অন্যতম। এই চিকিৎসালয় আব্বাসি খিলাফতের বাসিন্দাদের জন্য ভূস্বর্গ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলো। খলিফা হারুনুর রশিদ বিশ্বজুড়ে কিংবদন্তি শাসক তথা পশ্চিমের সম্রাট শার্লামেনসহ বিশ্বের বহু রাজাদের সাথে সংলাপ করেছেন।

ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় খলিফা হারুনুর রশিদের মতো সাহসী, প্রত্যয়ী ও কর্মঠ কোনো শাসকের পরিচয় জানা যায় না। তিনি নানা ভাষায় বিভিন্ন রচনা ও শত শত বই প্রকাশ করেছেন। তার উন্নত মনোবল, পরিশীলিত রুচি, প্রজ্ঞাদীপ্ত বুদ্ধি, বিশুদ্ধ জ্ঞান, উদারতা এবং কাব্য ও সংগীতপ্রীতি সম্পর্কে অনেক গল্প রচিত হয়েছে।

হারুনুর রশিদ ছিলেন মুত্তাকি পরহেজগার। ছিলেন খুব উদার মনের মানুষ। প্রতিদিন তিনি ১ হাজার দিরহাম দান করতেন এবং ১০০ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন।

একদিন বিনস সিমাক খলিফা হারুনুর রশিদের দরবারে এলেন। তখন খলিফা পানি পান করতে চাইলে ঠান্ডা পানির একটি কলসি তার কাছে নিয়ে আসা হলো। তিনি বিনস সিমাককে বললেন, 'আমাকে নসিহত করুন!' তিনি বললেন—'হে আমিরুল মুমিনিন, এ-পানি আপনাকে দেওয়া না-হলে (এবং ক্রয় করে নিতে বাধ্য হলে) আপনি কত দাম দিয়ে তা ক্রয় করতেন?' তিনি বললেন, 'আমার রাজত্বের অর্ধেক দিয়ে।' ইবনে সিমাক বললেন, 'স্বচ্ছন্দে পান করুন!' পান করার পরে তিনি বললেন, 'বলুন তো, যদি আপনার দেহ হতে এ-পানি বেরিয়ে যেতে বাধাগ্রস্ত

হতো, তবে কী পরিমাণের বিনিময়ে আপনি তার সুরাহায় ব্যবস্থা করবেন?' তিনি বললেন, 'আমার রাজত্বের অবশিষ্ট অর্ধেক দিয়ে।' তখন বিন সিমাক বললেন, 'যে-রাজত্বের অর্ধেকের দাম একবারের পান করার সমান এবং অপর অর্ধেকের দাম একবারের পেশাবের সমান; তা অবশ্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়ার উপযোগী বিষয়।' এতে হারুনুর রশিদ কাঁদতে লাগলেন।

এভাবে তিনি সব সময় জ্ঞানী-গুণী, আলেম, ফকিহ ও কবিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। চিন্তাশীল ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের খুব মর্যাদা দিতেন তিনি। একবার অন্ধ ফকিহ ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন হাযিমকে খলিফা হারুনুর রশিদ দাওয়াত করে আনলেন।

এ-প্রসঙ্গে আবু মুআবিয়া বলেন, আমি তার কাছে যে-কোনো হাদীস উল্লেখ করলেই তিনি বলে উঠতেন, আল্লাহ আমার মনিবের প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন। এতে তিনি কোনো ওয়ায-উপদেশের বিষয় শুনতে পেলে কেঁদে কেঁদে মাটি ভিজিয়ে ফেলতেন। খাওয়া-দাওয়ার পর খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর, বলতে পারবেন কি আপনার হাত কে ধুইয়ে দিয়েছে?' জবাবে মুহাম্মাদ বিন হাযিম বলেন বললেন, 'মনে হয় এটি কোনো দক্ষ গোলামের কাজ।' খলিফা তখন হেসে বললেন, 'আমি গোলামই এই সৌভাগ্য অর্জন করেছি।' তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আরে, আপনি কেন এতটা বাড়াবাড়ি করতে গেলেন?' খলিফা জবাব দিলেন, 'শুধু দুনিয়াবাসীকে বোঝানোর জন্য যে, জ্ঞানের মর্যাদা শাহানশাহির চেয়েও অনেক বেশি।'

তার শাসনকালের প্রথম পর্যায়

ইয়াহইয়া বারমাকি ছিলেন হারুনুর রশিদের বাবা খলিফা আল মাহদির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। তার শিক্ষাদীক্ষা আভিজাত্য এবং জ্ঞান-গরিমার ওপর আল-মাহদি এতটাই নির্ভর করতেন যে, হারুনুর রশিদকে মানুষ করার দায়িত্ব তিনি উজিরে আজমকে দিলেন। ফলে হারুনুর রশিদ ভালোভাবে কথা বলতে শেখার আগেই নিজেকে দেখতে পান উজিরে আজমের মহলে। আল-মাহদি তাকে খলিফার শাহি প্রাসাদের পরিবর্তে উজিরে আজমের প্রাসাদে বসবাস করিয়ে সব কিছু হাতে-কলমে শেখার ব্যবস্থা করলেন, যাতে করে হাজার বছরের পারসিক ঐতিহ্য, ভদ্রতা, সামাজিকতা এবং রাজকীয়তার জৌলুসপূর্ণ আচরণ রপ্ত করতে তার কষ্ট না হয়।[১৭৮]

[১৭৮] যিরিকলি, *আল-আলাম*: ৮/১৪৪

বের হয়ে আসে, তা হলে হারুনুর রশিদের কাছে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে বলে অঙ্গীকার করেন। তবে ইয়াহইয়া তাদের কাছে বের হয়ে আসতে অস্বীকার করেন — যতক্ষণ না হারুনুর রশিদ নিজ হাতে তার জন্য নিরাপত্তানামা লিখে দেন।

ফজল খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে এ ব্যাপারে পত্র লিখেন। খলিফা খুশি হন এবং এটাকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন। তাই তিনি নিজ হাতে নিরাপত্তানামা লিখে দেন এবং তার মধ্যে বনু হাশিমের মুরব্বি, কাজি ও ফকিহদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। হারুন লোক মারফত নিরাপত্তানামা প্রেরণ করেন, অনেক বড় পুরস্কার ও উপঢৌকন প্রেরণ করেন, যাতে এ সবগুলো তারা তাকে হস্তান্তর করেন। তারা তাকে এগুলো প্রদান করলেন। তখন তিনি নিজে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তারা তাকে নিয়ে বাগদাদ প্রবেশ করলেন। তিনি হারুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হারুন তাকে যথাযোগ্য সম্মান করেন এবং প্রচুর সম্পদ দান করেন।

এ দিকে, ইয়াহইয়ার ভাই ইদরিস যিনি মরক্কোতে বসবাস করছিলেন, বহু সংখ্যক বার্বার জাতি তাকে ঘিরে ছিলো। মরক্কো ও বাগদাদের মাঝে যোগাযোগের দূরত্ব ও অনুপস্থিতির কারণে আব্বাসীয় রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এই সুবাদে ইদরিস সেখানে একটি সুন্দর অবস্থানে শহর নির্মাণ করে সেটাকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন এবং সেখানকার সমাদৃত শাসক হয়ে ওঠেন।

খলিফা হারুনুর রশিদও মরক্কো দেশে যুদ্ধ ও দমননীতি পরিহার করে কৌশল হিসেবে ইদরিসকে হত্যার লক্ষ্যে শাম্মাখ নামীয় আজাদকৃত ক্রীতদাসকে পাঠান। সে ডাক্তার সেজে বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে ৭৯১ সালে ইয়াহইয়াকে হত্যা করে। কিন্তু ঘটনা তার মৃত্যুর সাথে শেষ হয়ে যায়নি। তার সমর্থকরা তার ছোট্ট ছেলের হাতে বাইআত গ্রহণ করে।

১৮৪ হিজরি (৮০০ ইং) সনে আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদ বনু তামিম গোত্রের এক খুরাসানীয় আরব কমান্ডারের ছেলে ইবরাহিম ইবনুল আগলাবকে উত্তর-আফ্রিকার আমির হিসেবে নিয়োগ দেন। মুহাল্লাবিদের পতনের পর সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও ত্রিপলিতানিয়ার অংশ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিলো। স্বাধীনভাবে রাজ্যপরিচালনা করলেও আগালিবরা আব্বাসীয়দের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতো

অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রদ্রোহ দমন

এ-সময়টাতে বিরতিহীন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব লেগেই ছিলো, যাদের সবাইকে খলিফা হারুনুর রশিদ দমন করেন। শামে ইয়েমেনি ও কাইসিদের মধ্যে দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ-জন্য খলিফা হারুন অস্বস্তিতে নিপতিত হন। ব্যাপারটি ১৮০ হিজরি (৭৯৬ ইং) সনে গৃহযুদ্ধে গড়ায়। ৩ বছর পরে খাজার উপজাতিরা আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করে। এ-সময় খলিফা হারুনুর রশিদ হাজিম বিন খুজাইমাকে ও তার সহকারী ইয়াযিদ বিন মাজিদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করে দাঙ্গা নির্মূল করেন। তারা সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করে।

তাবারিস্তান ও খুরাসানে ১৮৫ হিজরিতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে খলিফা এটাও দমন করতে সক্ষম হন। এরপর আরেকটি দাঙ্গা মাথাচাড়া দিলে তিনি সেটাও নির্মূল করেন। এভাবে গোটা রাষ্ট্রে শান্তি আর স্থিরতা ফিরে আসে।[১৭৯]

হারুনুর রশিদ ও শার্লিমেন

খলিফা হারুনুর রশিদ ফ্রান্স সম্রাট শার্লিমেনের[১৮০] কাছে মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং দূত-বিনিময় করেছিলেন। উপহারসামগ্রীর মধ্যে ছিলো বাগদাদের তৈরি জলঘড়ি, স্বর্ণের তরবারি এবং হাতি। আর দূত-বিনিময়ের ঘটনা সেই সময়ের ইতিহাসে একটা বিরল ঘটনা ছিলো। প্রাচীনকালে রাজাদের মধ্যে শান্তি ও বাণিজ্যের চুক্তি হতো। হারুনুর রশিদ ও শার্লিমেনের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম দূত-বিনিময় ঘটে।

[১৭৯] ইবনে আসির, *আল কামিল*: ৫/২৮৯; *তারিখে তাবারি*: ৪/৬২১

[১৮০] শার্লিমেন বা শার্ল দি গ্রেট ৭৬৮ সাল থেকে ফ্রাংকদের রাজা এবং ৮০০ সাল থেকে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রোমান-সম্রাট ছিলেন। পশ্চিমা রোমান-সাম্রাজ্যের পতনের তিন শতাব্দী পর, শার্লিমেন ছিলেন পশ্চিম ইউরোপের প্রথম সম্রাট। তার পিতা ছিলেন পেপিন দা শর্ট এবং মাতা বার্ট্রাডা অফ লাওন। তিনি ফ্রাংকিশ সাম্রাজ্যকে অনেক বর্ধিত করে তার মধ্যে মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজত্বকালে তিনি ইতালীয় সাম্রাজ্য দখল করেন এবং পোপ তৃতীয় লিও ২৫ ডিসেম্বর ৮০০ ইং রোম নগরে তাকে ইমপেরাতোর আউগুস্তুস হিসেবে অভিষিক্ত করেন। ৭৬৮ সালে পেপিন দ্য শর্টের মৃত্যুর পর শার্লিমেন তার ভাই প্রথম কার্লোমানের সাথে ফ্রাঙ্কদের রাজা হন। ৭৭১ সালে প্রথম কার্লোমানের হঠাৎ মৃত্যুর পর তিনি ফ্রাঙ্কির রাজ্যের (বর্তমানকালের বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড এবং পশ্চিম জার্মানি) নিরঙ্কুশ আধিপত্য গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তিনি রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন, যা ছিলো পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে বিস্তৃত।

আব্বাসীয় খলিফাদের ঘনিষ্টতা ছিলো শার্লিমেনের সাথে। তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং বানিজ্যচুক্তিও ছিলো। তারা খ্রিস্টীয় ইউরোপ থেকে জেরুসালেমের তীর্থযাত্রীদের জন্য নানা সুবিধায় স্বাক্ষর করেন। এ-ছাড়া শার্লিমেন হারুনুর রশিদের কাছ থেকে প্রাচ্যবিদ্যা ও সাহিত্য রপ্ত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এ-লক্ষ্যে তিনি বেশ কয়েকটি প্রতিনিধিদল বাগদাদে পাঠান। কেননা, ইউরোপকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনতে শার্লিমেনের হাতে এর বিকল্প ছিলো না।

হারুনুর রশিদ ও বাইজান্টাইন-সম্রাট

সিংহাসনারোহণ করার পর খলিফা হারুনকে বাইজান্টাইনদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিরুদ্ধাচারণের সম্মুখীন হতে হয়। খলিফা হারুন বাইজান্টাইনদের হামলা প্রতিহত করার জন্য একজন দক্ষ তুর্কি সেনাপতির নেতৃত্বে তারসাসে একটি পৃথক সরকার গঠন করেন। ৭৯১-৭৯৭ সালে খলিফা হারুন এক নৌ-অভিযানের মাধ্যমে বাইজান্টাইনদের কাছ থেকে গ্রিস ও সাইপ্রাস অধিকার করেন। এ-যুদ্ধে বাইজান্টাইন সেনাপতি বন্দি হন। এরপর ৭৯৭-৭৯৯ সালে খলিফা স্বয়ং একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং বাইজান্টাইনদের কাছ থেকে ইফিসাস ও আনসিরা দখল করেন। স্কুটারির নিকটে খলিফা হারুন তাঁবু ফেললে রাজধানী কন্সটান্টিনোপল অবরোধের আশঙ্কায় বাইজান্টাইন-সম্রাজ্ঞী আইরিন করদানে সম্মত হয়ে ৪ বছরের জন্য শান্তিচুক্তি করেন।

১৮৭ হিজরি (৮০২ ইং) সনে কোষাধ্যক্ষ নিকিফোরাস সম্রাজ্ঞী আইরিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেকে বাইজান্টাইন-সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করে নিকিফোরাস খলিফা হারুনের নিকট ৮০৩ সালে একটি অপমানজনক পত্র লেখেন। তার পত্রটি ছিলো এ-রূপ:

রোমক সম্রাট নিকিফোরাসের নিকট হতে আরবেদের নৃপতি হারুনের নিকট! আমার পূর্ববর্তী সম্রাজ্ঞী আপনাকে অহেতুক প্রভুর মর্যাদা দান করে স্বীয় প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করেন এবং নারীসুলভ দুর্বলতা নির্বুদ্ধিতার জন্য আপনার নিকট স্বীয় ঐশ্বর্য দান করেন। সুতরাং পত্রপাঠমাত্র কালবিলম্ব না-করে প্রেরিত অর্থের দ্বিগুণ অর্থ প্রত্যর্পণ করুন, অন্যথায় তরবারিই আপনার ও আমার মধ্যে মীমাংসা করবে।

নাইসিফোরাসের অশালীন ও ঔদ্ধত্যমূলক পত্র পাঠ করে খলিফা হারুনুর রশিদ এত ক্রোধান্বিত হলেন যে, সভাসদগণ ভীত হয়ে কেউ তার দিকে তাকানোর সাহস করছিলেন না। বাইজান্টাইন-সম্রাটের চিঠির প্রত্যুত্তর তিনি এ-রূপ পাঠান:

> বিশ্বাসীগণের নেতা খলিফা হারুনের নিকট হতে রোমানদের কুকুর নিকিফোরাসের নিকট। হে পৌত্তলিক মাতার সন্তান, তোমার পত্র পাঠ করেছি। পত্রের উত্তর কর্ণে শুনতে হবে না, স্বচক্ষেই অবলোকন করতে পারবে।

পত্র প্রেরণ করার সাথে সাথে খলিফা হারুন একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে বাইজান্টাইন-সম্রাটকে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য কন্সটান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হলেন, কোনো বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন ছাড়াই তিনি হিরাক্লিয়া ও টিরানা অধিকার করেন। নাইসিফোরাস যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করলে খলিফা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

খলিফা রাক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে নিকিফোরাস চুক্তি ভঙ্গ করে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খলিফা হারুন নাইসিফোরাসকে শায়েস্তা করার জন্য দ্বিতীয়বারের মতো অগ্রসর হলেন। তীব্র ও প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে খলিফা হারুনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম-বাহিনী বাইজান্টাইন-সম্রাট নাইসিফোরাসের নেতৃত্বাধীন খ্রিস্টান-বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে। এই যুদ্ধে ৪০ হাজার খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয়। বিশ্বাসঘাতক নাইসিফোরাস তিনটি ক্ষতচিহ্নসহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন।

এবারেও বাইজান্টাইন-সম্রাট করদানে সম্মত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলে মহানুভব খলিফা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। খলিফা ট্রান্স-অক্সিয়ানায় বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক নাইসিফোরাস তৃতীয়বারের মতো সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মুসলিম-সীমান্তে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। হারুন ক্রুদ্ধ হয়ে নাইসিফোরাসকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য ১ লাখ ৩৫ হাজার সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে রাই হতে অভিযান শুরু করেন।

উত্তরে বিথিনিয়া এবং পশ্চিমে মাইসিয়া এবং কারিয়া পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া মাইনর জয় করে হারুন ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হতে থাকেন। সেনাপতি ইয়াযিদ ইউকিসাস ও লিডিয়া, সুহরাবিল সাকালায়ে, থিরাসা, সিডারোপোলিস ও নাইসিমা অধিকার করেন।

খলিফা নাইসিফোরাসের বাহিনীকে নির্মমভাবে পরাজিত করে ইবাক্রিয়া দখল করেন। তৃতীয়বার পরাজিত হয়ে নাইসিফোরাস ক্ষমা প্রার্থনা করলে খলিফা হারুন ন্যায়পরবশ হয়ে তা মঞ্জুর করেন। এবার হারুনুর রশিদ নির্দেশ দেন, কর প্রদানের আগে সে-সব স্বর্ণমুদ্রায় আমিরুল মুমিনিন হারুনুর রশিদ ও তার সন্তানদের নাম খোদাই করে তারপর প্রদান করতে হবে। এটি করেছিলেন তিনি তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করতে। ঘটনাটি ঘটে ১৮৭ হিজরি (৮০২ ইং) সনে।

খলিফা হারুন ও বারমাকিদের পতন

বারমাকি শব্দটি পারসিক। এটির অর্থ নেতা বা প্রধান প্রশাসক কিংবা নিবন্ধনকারী। বহু শত বছর ধরে এই বংশের লোকজন পারস্য-সম্রাট বিশেষ করে সাসানি সম্রাটদের দরবারে একের পর এক সাফল্য দেখিয়ে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলো। বারমাকিদের পূর্বপুরুষ ছিলো অগ্নি-উপাসক। হযরত উমরের সময় পারস্য সাম্রাজ্যের পতন হলে অন্য লোকজনের মতো তারাও ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়।

খালিদ বারমাকি শুরু থেকেই আব্বাসীয় আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার ছেলে ইয়াহইয়া বারমাকি ছিলেন হারুনুর রশিদের প্রধানমন্ত্রী। খলিফা মাহদিরও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তারও আগে হারুনুর রশিদের দাদা খলিফা আল মানসুর তাকে আজারবাইজানের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। খলিফা হারুন ইয়াহইয়ার দুই ছেলে ফজল ও জাফরকে বড় পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

ইয়াহইয়া বারমকির পরিবারের লোকেরা হারুনুর রশিদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি তাদের অত্যধিক ভালোবাসতেন। কথিত আছে, হারুনুর রশিদের মা খায়যুরানের স্তন থেকে ফজল বিন ইয়াহইয়া দুধ পান করেছেন, আর ফজল ও জাফরের মা নিজ বুকের দুধ খাইয়েছেন হারুনকে। এ-কারণে বলা হয়, ফজল হারুনের দুধভাই।

হারুনুর রশিদ বারমাকিদেরকে দুনিয়াবি মর্যাদা দান করেন। তাদেরকে দান করেন প্রচুর পরিমাণে সম্পদ। তাদের পূর্বে কোনো মন্ত্রী কিংবা তাদের পরে কোনো নেতা ও মুরুব্বি এত পরিমাণ সম্পদ তার থেকে অর্জন করতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জাফর একটি ঘর নির্মাণ করেছিলেন, যার জন্য খরচ হয়েছিলো ২ কোটি দিরহাম। হারুনুর রশিদ তাদের প্রতি যে-সব কারণে শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তার কিছু নমুনা পেশ করা যাক।

কেউ কেউ বলেন, হারুনুর রশিদ তাদেরকে হত্যা করার কারণ হচ্ছে, তিনি যখন কোন শহরে কিংবা প্রদেশে যেতেন কিংবা গ্রামে বা কোনো ক্ষেত খামারের কাছে যেতেন কিংবা কোনো বাগানে যেতেন, জিজ্ঞাসা করলে বলা হতো—এটা জাফরের। আবার কেউ কেউ বলেন, বারমাকিরা হারুনুর রশিদের খিলাফত বিনষ্ট করতে ও যিন্দিকি আকিদা প্রকাশ করতে চেয়েছিলো। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাদেরকে আল-আব্বাসার কারণে হত্যা করেছেন। আলিমদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আলিম রয়েছেন, যারা এটা অস্বীকার করেন—যদিও বিন জারির এটা উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযি উল্লেখ করেন, হারুনুর রশিদকে বারমাকিদের হত্যা করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে হারুনুর রশিদ বলেন, যদি আমি জানতে পারি যে, আমার জামাটি এর কারণ জানে, তা হলে আমি অবশ্যই সেটিকে পুড়িয়ে দেবো।

অনুমতি ব্যতীত জাফর খলিফা আর রশিদের ঘরে প্রবেশ করতেন। এমনকি যখন তিনি বিছানায় কারও সাথে বিশ্রাম করতেন, তখনো তিনি প্রবেশ করতে পারতেন। এটা অত্যন্ত ইজ্জত, আবরু ও উচ্চ মর্যাদার ব্যাপার ছিলো।

বারমাকিদের দুর্ভাগ্য যে, একের পর এক তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমা হতে থাকলো। যার কারণে খলিফা হারুন আর তাদের মাঝে তিক্ততার প্রাচীর দাঁড়িয়ে যায়। খলিফা যে-দিকেই তাকাতেন, সে-দিকেই বারমাকিদের বৈধ-অবৈধ সম্পদের পাহাড় দেখে বিচলিত হয়ে পড়তেন। অথচ খলিফা নিজে মাঝেমধ্যে অভাবক্লিষ্ট হয়ে পড়তেন। মাঝ,মধ্যে ব্যক্তিগত চিকিৎসক জিবরাইলকে বলতেন, প্রকৃতপক্ষে খিলাফত তো তাদের হাতে, আমি হলাম নামকাওয়াস্তে খলিফা।'

দেখা যেতো—জাফরের পিতা ইয়াহইয়া বিন খালিদ হারুনুর রশিদের পরিবারের দৈনন্দিন খরচ হ্রাস করে দিতে লাগলেন। ফলে রাজপরিবারের সদস্যদের আর্থিক অনটনে পড়তে হয়—যার ফলে এমনকি যুবায়দা কয়েকবার হারুনুর রশিদের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করেন।

কথিত আছে যে, হারুনুর রশিদ একবার রাজকীয় আসামী ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন হাসানকে জাফর বারমাকির কাছে সোপর্দ করেন, যাতে তিনি তাকে তার কাছে বন্দি করে রাখেন। কিন্তু ইয়াহইয়া তার সাথে সর্বদা মমতাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি তাকে ছেড়ে দেন।

অবশেষে, খলিফা হারুন বারমাকিদের নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেন। এ-লক্ষ্যে তার বিশ্বস্ত সচিব মাসরুর ও হাম্মাদ বিন সালেম আবু আসমাকে একটি চৌকশ

বাহিনীর সাথে জাফরের প্রাসাদে পাঠালেন এবং তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। তারপর তার শিরশ্ছেদ করলেন। সে-সময় জাফরের বয়স ছিলো ৩৭ বছর।

একই রাতে ইয়াহইয়া বারমাকি ও তার ছেলে ফজলকে কারাগারে নিক্ষেপের নির্দেশ দেন হারুন। উভয়ে জেলখানাতেই মারা যায়। ইয়াহইয়া বারমাকি ১৮৮ হিজরি (৮০৩ ইং) ৭০ বছর বয়সে বাগদাদের কারাগারে মারা যান। আর তার ছেলে ফজল মারা যান ১৯২ হিজরিতে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো ৪৫ বছর।

বারমাকিদের যাবতীয় সম্পত্তি খলিফা হারুনুর রশিদ কর্তৃক জব্দ করা হয়। মুক্ত করে দেওয়া হয় তাদের দাস-দাসীদের। রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে তাদের সমর্থক ও অনুসারীদের গণছাঁটাই করা হয়। এভাবে ধ্বংসের অতলে হারিয়ে যায় বারমাকিরা। ১৮৭ হিজরি (৮০২ ইং) সনের মধ্যেই হারিয়ে যায় তাদের স্মৃতিচিহ্ন।[১৮১]

জ্ঞানচর্চা: বাণিজ্যে সমৃদ্ধি

খলিফ হারুনুর রশিদের খিলাফতকালে ইসলামি সভ্যতা আরোহণ করে সফলতার স্বর্ণচূড়ায়। ফরাসি বিজ্ঞানী ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলানের হাজার বছরেরও পূর্বে বানিজ্যের লক্ষ্যে খলিফা হারুন রেড সি পাড়ি দিয়ে ভূমধ্য সাগরে পৌঁছার কথা চিন্তা করেন।

ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিস্তৃতির কারণগুলোর মধ্যে একটি ছিলো ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং রোমান, চিনা, আফ্রিকান দেশসহ বিজিত রাজ্যসমূহের জাতি-গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ। আরব বণিকেরা পূর্ব দিকে চিনে পৌঁছেছিলো। পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে, দক্ষিণে মাদাগাস্কার দ্বীপে এবং নাইজেরিয়াসহ গ্রেট আফ্রিকান মরুভূমি অতিক্রম করেছিলো আরব বণিক-কাফেলা।

খলিফা হারুনুর রশিদ তার প্রজা সাধারণের সুযোগ-সুবিধার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। এ-লক্ষ্যে তিনি প্রায়শই ছদ্মবেশে বাগদাদের অলি-গলি ও হাট-বাজারে চক্কর দিতেন, টহল দিতেন। এভাবে নিপীড়িতের প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণের অবকাশ পেতেন। সাহায্যের সুযোগ পেতেন প্রকৃত অভাবীকে।

তার গুরুত্বপূর্ণ কীর্তির মধ্যে ছিলো: বাণিজ্যিক রাস্তাসমূহের নিরাপত্তা বিধান, দূরের পথের যাত্রীদের সাহায্যের জন্য সরাইখানা ও মুসাফিরখানা নির্মাণ ইত্যাদি।

[১৮১] দ্রষ্টব্য—ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আয়ান*: ৪/২৯; ইবনুল ফাকিহ, *আল বুলদান*: ৬১৭; *তারিখে তাবারি*: ৪/৫১৪; *আল কামিল*: ৫/৩৫২

এ-ছাড়াও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, খাল, জলাধার ও হাসপাতাল। বিশ্ববিখ্যাত লেখক ও অনুবাদকদের দিয়ে হিন্দি, ফারসি ও রোমানিয়ান ভাষা থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বই আরবিতে অনুবাদ করিয়েছেন।[১৮২]

জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার ও প্রচারের আকুল আগ্রহ ছিলো খলিফা হারুনুর রশিদের। ডাক্তার ও শাস্ত্রীয় চিকিৎসক তৈরির লক্ষ্যে তিনি বহু ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই ইনস্টিটিউট ছিলো দুই ধরনের। একটি হচ্ছে মেডিকেল কলেজ, এটাকে 'বিমারিস্তান' বা হাসপাতাল বলা হতো। আরেকটি হচ্ছে তাত্ত্বিক চিকিৎসা বিদ্যালয়। এখানে নানা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করা হতো।

তিনি ইসলামি রাজ্যগুলোতে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেন। সবাইকে কর্মমুখী জীবনাচারের প্রতি উৎসাহিত করতেন। পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন কুটিরশিল্পের প্রতিও। তার আমলের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শৈল্পিক অবদান হচ্ছে সিল্ক কম্বল, তুলা ও পশমি বস্ত্র, বুটিক, দোরোখা কম্বল, বস্ত্রশিল্প, সিরামিক শিল্প তৈরির ব্যবস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতা। রান্নার পাত্র এবং আলোকসজ্জা শিল্পেরও সমৃদ্ধি ঘটে তার আমলে।

নানা শিল্পের এই বহুমুখী উন্নয়ন তার প্রতিটি রাজ্যে গুরুত্বের সাথে সেরা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচিত হতো। উদাহরণস্বরূপ, ইরাকে কুফার কুটিরশিল্প বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করে। দামেশকের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতিও ছিলো জগতজোড়া। ইউরোপীয়দের কাছে এটা দামেশকি বুটিক নামে প্রসিদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে ইরাকের মসুল থেকে এক বিশেষ ধরনের বস্ত্র উৎপাদিত হতো। পশ্চিমা দেশে যা পরিচিতি পেয়েছে মসলিন নামে। মিশরও বিখ্যাত ছিলো কিছু শিল্পের জন্য। এখানের দিমিয়াতে উৎপাদিত পণ্যকে ড্যামিয়েট বলা হতো। একইভাবে মোজাইক শিল্পে দামেশক ছিলো বিখ্যাত।

[১৮২] ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে শুরু থেকেই জ্ঞান-গবেষণা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক গুরুত্ব ছিলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাংস্কৃতিক যে-বিশাল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, ইসলামি সভ্যতার বিভিন্ন যুগে সেই ঐতিহ্য ব্যাপক উজ্জ্বলতা পায়—বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামি সভ্যতার যুগে এসে অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণতা পায়। এ-সব প্রতিষ্ঠান ইসলামি সমাজের মৌলিক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতো। মসজিদ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাইতুল হিকমা এবং লাইব্রেরির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত উন্নত, প্রশান্ত এবং স্থিতিশীল সমাজেই গড়ে ওঠে। ইসলামি সভ্যতার যুগে উপযুক্ত পরিবেশ থাকায় বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং লাইব্রেরি বেশি বেশি গড়ে উঠেছে। এগুলোর এতো বেশি বিকাশ ঘটেছে যে, তৎকালীন সময়ের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো এ-সব প্রতিষ্ঠান।

আবু নাওয়াস

তিনি আব্বাসীয় যুগের একজন বিশিষ্ট কবি। খলিফা হারুনের নিকটজন হিসেবে জীবন কাটান। ৭২২ সালে আহওয়াজে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮১৩ সালে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

ইবরাহিম মাওসিলি

বিখ্যাত সুরকার, কবি ও গায়ক। হারুনুর রশিদের অন্যতম সভাকবি।[১৮৫] ৭৬২ সালে কুফায় কুফায় জন্মগ্রহণকারী ইবরাহিম পরে মাওসিলে (বর্তমান মসুল) চলে যান এবং পুনরায় কুফায় ফিরে আসেন। এ-কারণে তাকে মাওসিলি বলা হতো। ৮০৪ সালে বাগদাদের ইন্তেকাল করেন।

খলিফা হারুনের সবচেয়ে বিখ্যাত ডাক্তার জিবরাইল বুখতিশু। তিনি ছিলেন সিরিয়ান খ্রিস্টান। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে বহু গ্রন্থ লিখেছেন। ৮৩০ সালে তিনি মারা যান।

হারুনুর রশিদের স্ত্রীর নাম উম্মুল আযিয। জুবাইদা নামেই তিনি সমধিক খ্যাত। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় আরব-বংশোদ্ভূত। জাফর বিন মানসুরের কন্যা। শুভ্রদেহী হওয়ার কারণে তার দাদা খলিফা মানসুর ছোটবেলা তাকে জুবাইদা নামে ডাকতেন বলে এই নামে পরিচিতি লাভ করেন। হারুনুর রশিদ পিতা মাহদির আমলে তাকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে শাহজাদা আমিন জন্মলাভ করেন।

জুবাইদা ছিলেন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ। মানবকল্যাণে কাজ করা ছিলো রানির অন্যতম আসক্তি। বিশ্ববাসীর কাছে 'নাহরে জুবাইদা' একটি প্রসিদ্ধ নাম। নাহর অর্থ—সরু স্রোতস্বিনী, জলধারা, খাল, নালা ইত্যাদি।

ইতোপূর্বেকার আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নগরী বাগদাদ ছিলো আব্বাসীয় খলিফাগণের রাজধানী। তন্মধ্যে জাজিরাতুল আরব তথা বর্তমান সৌদি আরবও ছিলো। মরুভূমিপ্রবণ পবিত্র মক্কায় জমজমের পানি বাদে

[১৮৫] ইবরাহিম মাওসিলি অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। কথিত আছে, তার পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ ছিলো ২ কোটি ৪০ লাখ দিরহাম। তিনি ছিলেন কৌতুকরসিক ও অভিনব কথকতার অধিকারী। গীতিমালায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পারদর্শী। বুলবুল উপাধিধারী আল মানসুরের বোন ছিলো তার স্ত্রী। বুলবুল অর্থ দক্ষ তবলাবাদক। গায়ক ইবরাহিমের সুরমূর্চ্ছনা ও তবলাবাদক মানসুরের বাদ্যতান আসরকে আন্দোলিত করতো।

তেমন পানির উৎস ছিলো না। ফলে হাজিরা সেখানে গমন করলে সে-কালে পানির অভাবে কষ্ট পেতো। ১৯৩ হিজরিতে খলিফার মৃত্যুর পর রানি জুবাইদা হজ্জ পালনে গেলেন। পবিত্র মক্কায় পানির সমস্যা তাকে এতই ব্যথিত করেছিলো যে, পানির সমস্যা চির অবসানের জন্য একটি খাল খননের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন।

রানি জুবাইদা সে-কালে কুফা থেকে পবিত্র মদীনা ও পবিত্র মক্কা নগরী পর্যন্ত মরুভূমির ওপর দিয়ে প্রায় ১৪০০ কি. মি. দীর্ঘ সড়কের উন্নয়ন সাধন করেছিলেন, যা হজযাত্রীরা ব্যবহার করতেন।

পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনা দামেশককেন্দ্রিক উমাইয়াদের শাসন-আমলে ছিলো, তেমনিভাবে এ দুই পবিত্র নগরী বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসীয়দের শাসন-আমলে ছিলো দীর্ঘ সময় ধরে। ফলে আব্বাসীয় শাসকরা সেকেলে পদ্ধতিতে বাগদাদের সাথে এ পবিত্র নগরীর যাতায়াতের জন্য রাস্তা সংস্কার ও নানান সুযোগ-সুবিধা নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা বিষয়ে অর্থব্যয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করাটা স্বাভাবিক।

সে কালে আরব মরুভূমিতে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিলো উট। উটকে বলা হতো মরুভূমির জাহাজ। এরপর গাধা ও ঘোড়া ব্যবহৃত হয়। সে-কালে দিনে বিশ্রাম, রাতে যাতায়াত। সাধারণ নিয়মে এক রাতে ১৬ মাইল পর্যন্ত যাওয়া যেতো। ১৬ মাইল পর বিশ্রাম অবস্থানকে বলা হত মঞ্জিল। সে-কালে মঞ্জিলে মসজিদ, খাওয়ার পানির ব্যবস্থা, কিনে খাওয়া বা রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। অনেক মঞ্জিলে অবস্থাভেদে প্রহরীও থাকতো।

রানি জুবাইদা বাগদাদ থেকে পবিত্র এ-দুই নগরীতে মঞ্জিলের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। সাথে উট, গাধা, ঘোড়া যাতায়াতে সুবিধার জন্য সমতলে বালি সরিয়ে এবং পাহাড়-পর্বত কেটে সড়ক সংস্কার করেন।

রানি জুবাইদা খাল-খননের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বিখ্যাত প্রকৌশলী ও ভূ-পরিমাপকদের ডেকে পাঠান। সমগ্র এলাকা জরিপ করার পর তারা সিদ্ধান্ত দিলেন হুনাইন (পবিত্র মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী পাহাড়ি এলাকা) উপত্যকার পার্বত্য ঝরনা, যা সেখানকার অধিবাসীদের পানীয় জল, সেচের জলের প্রয়োজন মেটাতো, সেখান থেকে খালটি খনন করে আনা হবে। এ-হুনাইনে মুসলমানদের সাথে বিধর্মীদের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, যা গাযওয়ায়ে হুনাইন যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এ-অঞ্চলটি কংকরময়, অনুর্বর, শুষ্ক এবং আবহাওয়া উষ্ণ। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে একটি খালের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন ছিলো। তাই প্রকৌশলীরা টানেলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ খাল খননের পরিকল্পনা করেন; জনগণ যাতে এ-খাল থেকে পানি সংগ্রহ করে তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে এ-জন্য কিছু দূর অন্তর অন্তর ভূ-পৃষ্ঠে পানির স্টেশন স্থাপন করা হয়।

রানি জুবাইদার নির্দেশে হুনাইন-উপত্যাকার ঝরনা-পানির অন্যান্য উৎসগুলো বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছিলো। পর্বতের মধ্যে দিয়ে পানি আসা ছিলো একটি বিশাল কাজ, যাতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো বিপুল সংখ্যক লোকবল এবং অপরিসীম অর্থ। পর্বত কাটার জন্য, অনুর্বর এবং কংকরময় পাহাড় খনন করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিলো অসংখ্য বিশেষজ্ঞদের। কোনো কিছুই রানি জুবাইদার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে হতাশগ্রস্ত করতে পারেনি।

রানি বললেন, যদি প্রয়োজন হয়, কোদাল এবং শাবলের প্রতিটি আঘাতের জন্য আমি এক দিরহাম অর্থ পরিশোধ করবো—এই বলে তিনি কাজ শুরু করার প্রতিজ্ঞা করলেন। অনেক বছর কঠোর পরিশ্রমের পর অবশেষে জবালে রামা তথা নুমার পর্বত পেরিয়ে এ-নহর আরাফাতে নিয়ে আসা হয়। এরপর নিয়ে আসা হয় মুজদালিফা এবং মিনায়।

হুনাইন-উপত্যাকার ঝরনার পানি এবং পথিমধ্যে অন্যান্য উৎসগুলোকে এ-নহর অভিমুখে এনে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। এ-নহরের মাধ্যমে পানি সরবরাহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাকের দাওয়াতি মেহমান হজব্রত পালনকারী এবং পবিত্র মক্কা এলাকার জনগণ খাবার পানির সমস্যামুক্ত হয়। এই হচ্ছে মানবদরদী বিশাল অন্তরের রানি জুবাইদার জীবনের এক বিশেষ কীর্তি।

ইতিহাসবিদ বিন খাল্লিকান বলেন, জুবাইদা একবার হজের সফরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর ৩ মিলিয়ন দিনার দান করেন। খলিফা হারুনুর রশিদের মৃত্যুর পর তিনি প্রায় ২৩ বছর বেঁচে ছিলেন। বাগদাদে ৬২ বছর বয়সে ২১৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

উত্তরাধিকার ও খলিফা হারুনের মৃত্যু

খলিফা হারুনু রশিদ জীবনের শেষ বছরগুলোতে তার পরে খিলাফতের উত্তরাধিকার ছেলেদের মধ্য হতে এক ছেলেকে দিতে চেয়েছিলেন। দুই যুবরাজের মধ্যেই ছিলো

প্রতিযোগিতা। একজন হলেন জুবাইদার গর্ভজাত যুবরাজ আমিন। আরেক জন যুবরাজ মামুন। পারস্য-বংশোদ্ভূত হিসেবে মন্ত্রী ফজল বিন সাহাল ছিলেন মামুনের পক্ষপাতী। তিনি বয়সে বড় হিসেবেও আমিনের ওপর মামুনকে প্রাধান্য দেন। এ-ছাড়া মামুনের মা ছিলেন পারস্য-বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে, আমিনের অগ্রাধিকারও ফেলে দেওয়ার মতো ছিলো না। একে তো আরব বংশোদ্ভূত রানি জুবাইদার ছেলে—এ-ছাড়া মন্ত্রী ফজল বিন রবি ছিলেন তার পক্ষপাতী।

অবশেষে হারুনুর রশিদ তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খিলাফতের উত্তরাধিকার হিসেবে যথাক্রমে তিন সন্তানের নাম ঘোষিত হয়। প্রথমে আমিন, তারপর মামুন, তারপর আল-কাসিম উপাধিধারী মুতামান খলিফা পদে আসীন হবেন। খলিফা হারুন ১৮৭ হিজরিতে হজ সম্পাদনের পর মক্কায় এ-আদেশ লিখিত আকারে জারি করেন। সাক্ষী হিসেবে ছিলেন রাজকীয় মন্ত্রী, আলেম, বিজ্ঞানী এবং বিচারকেরা।

সন্তানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি নিশ্চিত করতে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব এড়াতে তাদের মধ্যে প্রত্যেককেই প্রাদেশিক প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়। আমিনকে দেওয়া হয় শাম ও ইরাকের প্রশাসকের দায়িত্ব। খুরাসান, মা-ওয়ারাউন নাহরের শহরসমূহ ও পূর্বাঞ্চলে মামুনকে এবং জাজিরা, রোমের নিকটবর্তী শহরগুলো মুতামানকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। একজনের প্রশাসনে যাতে অন্যজন হস্তক্ষেপ না-করে এ-ব্যাপারে অঙ্গীকার নেওয়া হয়।

১৯৩ হিজরিতে (৮০৯ ইং) তুরস্কে রাফে বিন লাইসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হলে খলিফা হারুন তা দমন করতে নিজের নেতৃত্বে একটি বাহিনী নিয়ে বের হন। যাত্রাপথে খুরাসানের তুস নগরীতে পৌঁছুলে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এই অসুখের তীব্রতায় তিনি মারা যান। তার শাসনকাল ছিলো ২৩ বছর।

ইবনুল জাওযি বলেছেন, হারুনুর রশিদ এত পরিমাণ মিরাস রেখে যান যে, অন্য কোনো খলিফা তা রেখে যাননি। ভূ-সম্পদ ও বাড়ি-ঘর ব্যতীত তার রেখে-যাওয়া মণিমুক্তা ও মূল্যবান আসবাবপত্রের মূল্য ছিলো ১০ কোটি ৩৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। বিন জারির বলেছেন, বায়তুল মালে সঞ্চিত মুদ্রার পরিমাণ ছিলো ৭০ কোটিরও অধিক।

আবুশ শিস তার মৃত্যুতে শোকগাথায় লিখেন:

> "পূর্বদেশে একটি সূর্য অস্তমিত হলো। তার জন্য দু চোখ অশ্রু-ক্রন্দন। এমন সূর্য আমরা কোনো দিন দেখিনি, যা যে-দিকে উদিত হয়, সে-দিকেই অস্তমিত হয়।"[১৮৬]

আমিনের খিলাফতকাল

হারুনুর রশিদের মৃত্যুর পর তার ছেলে আমিন খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বনি হাশেমের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ, আমির-উমারা, সেনাবাহিনীর কমান্ডার এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন। আমিন ছিলেন ন্যায়প্রত্যয়ী যুবক। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, তিনি তার পিতার আদেশ এবং ভাইদের সাথে সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। কিন্তু তার মন্ত্রী ফজল বিন রবি ভাই মামুনকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অপসারণের ইন্ধন দিতে থাকেন। কেননা, তিনি আশঙ্কা করছিলেন, খিলাফতের পদ মামুনের হাতে চলে যেতে পারে। তখন সে তাকে (ফজলকে) তার মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণ করে সে-পদে ফজল বিন সাহলকে (পারসিক) বসাবে। অন্যের ব্যাপারে অঙ্গীকার ভঙ্গের এই আশঙ্কা থেকে ফজল ইবনুর রবি নিজেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসলেন। মৃত্যুর পূর্বে খলিফা হারুন অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, মামুনের কাছে যে-সব ধন-সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র রয়েছে, এগুলো তার কাছেই থাকবে। একইভাবে তার সেনাপতিদের সঙ্গে যে-সব সৈন্য রয়েছে, সেগুলোও মামুনের অধীনেই থাকবে। খলিফার এ-অঙ্গীকার ইবনে রবিও স্বীকার করেছিলেন। অথচ মৃত্যুর পরে সেটা ভেঙে তিনি দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে বাগদাদে আমিনের কাছে চলে গেলেন।

এ-দিকে ফজল বিন সাহল পণ করে বসলেন যে, যেভাবেই হোক, মামুনকে খলিফা বানিয়েই ছাড়বো। ফজল ইবন সাহল এবং তার সমর্থকরা আমিনকে খলিফারূপে মেনে নিতে নারাজ ছিলেন। তারা যে-কোনো মূল্যে মামুনকে খলিফারূপে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। ফজল ইবন সাহলের পিতা সাহল ছিলেন একজন নওমুসলিম অগ্নিপূজক—যিনি হারুনুর রশিদের আমলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হারুনুর রশিদই সাহলের পুত্র ফজলকে মামুনের সচিবরূপে নিয়োগ করেন। অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত হওয়ার দরুন তিনি মামুনকেই খলিফারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন।

[১৮৬] দ্রষ্টব্য—তারিখে তাবারি: ৫/১৩-১৪; আল কামিল ফিত তারিখ: ৫/৩৫৮

এই বাহিনী রাই নগরীতে পৌঁছলে মামুনের সেনাবাহিনীর সাথে তাদের প্রবল সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। মামুনের পক্ষ হতে তাহের বিন হুসাইন বিন ঈসা আল খুজাইয়ের নেতৃত্বাধীন ৪ হাজার যোদ্ধা লড়াই করে। ফলাফলে আমিনের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিহত হয় এবং তার সৈন্যদল পালিয়ে যায়। এই পরাজয়ের কারণে বাগদাদে আমিনের খিলাফতকেন্দ্র প্রভাবিত হয়।

এরপর হামদানেও আমিনের সেনাবাহিনী দ্বিতীয় পরাজয়ের শিকার হয়। সেখানে তার অধিনায়ক আবদুর রহমান বিন জিবলার হত্যার পর পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। মামুনের সেনাপতি তাহের বিন হুসাইন একের পর এক শহরসমূহ জয় করে অগ্রসর হতে থাকেন। হালওয়ানে পৌঁছে তিনি ব্যূহ রচনা করেন এবং পরিখাদি খনন করে নিজের অবস্থান সংহত করেন।[১৮৮]

আমিনের খিলাফতের সমাপ্তি

আমিন নিজেকে বাঁচাতে এবং খিলাফত রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই শাম হতে সেনাবাহিনী জড়ো করেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে তারা বাগদাদে প্রবেশ করতে পারেনি। দুই যুবরাজের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে যুদ্ধ। আমিনের সমর্থক এবং মামুনের সমর্থক—কেউ কাউকে ছাড়ার পাত্র নয়।

অবশেষে, মামুনের বাহিনী তাহির বিন হুসাইন ও হারসামা বিন আইয়ুনের নেতৃত্বে বাগদাদে পৌঁছে। এসেই তারা শহরটি দীর্ঘ দিন ধরে অবরোধ করে রাখে। তারপর একটি ভয়াবহ যুদ্ধের পর প্রবেশ করে আমিনের কাছে। আমিন নিজেকে বাঁচাতে টাইগ্রিস নদী পার হয়ে সেনাপতি হারসামার আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করে। তাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো এবং নিরাপত্তারও কথা দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। শেষে তাহের বিন হুসাইনের সৈন্যরা তাকে হত্যা করে।

১৯৮ হিজরি (৮১৩ ইং) সনে ২৭ বছর বয়সে আমিন নিহত হন। তার খিলাফতকাল ছিলো ৪ বছর ৮ মাস। তার মৃত্যুর পর তার মা জুবাইদাকে আবু জাফর মানসুরের প্রাসাদ থেকে আল খুলদের প্রাসাদে স্থানান্তরিত করা হয়। কমান্ডার তাহের আমিনের দুই ছেলেকে (মূসা ও আবদুল্লাহ) তাদের চাচা মামুনের কাছে

[১৮৮] দ্রষ্টব্য—তারিখে তাবারি: ৫/২৭-৩১; ইবনু কুতাইবা, আল মাআরিফ: ৩৮৪

পাঠিয়ে দেন। এভাবে আমিনের যুগের সমাপ্তি ঘটে এবং গোটা সাম্রাজ্য তার ভাই মামুনের হাতে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে।[১৮৯]

মামুনের খিলাফতকাল

মামুন তার শাসনকালের শুরুর দিকে বাগদাদে না-গিয়ে খুরাসানের মারভ শহরেই অবস্থান করেন। এটি ছিলো এখানকার অধিবাসীদের তার প্রতি হৃদ্যতা ও আন্তরিক সহযোগিতার বিশেষ প্রতিদান। তিনি তার সচিব ফজল বিন সাহালকে রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতা দান করেন। ফজলের ভাই হাসানকে নিয়োগ দেন ইরাক, পারস্য, হিজায ও ইয়েমেনের প্রশাসক হিসেবে। নাসর বিন শাসের বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে তাহের বিন হুসাইনকে রাক্কায় পাঠান এবং তাকে শাম, জাজিরা ও মরক্কোর গভর্নর নিয়োগ করেন। আর হারসামা বিন আইয়ুনকে নিয়োজিত করেন খুরাসানের গভর্নর হিসেবে।

ফজল বিন সাহলের (পারসিক) পরামর্শক্রমে মামুন আলি রেজা বিন মূসাকে[১৯০] (যিনি ইমাম আলি বিন আবি তালিবের বংশীয়) ভাবী সম্রাট বানান। তিনি কালো পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করেন এবং সবুজ পোশাক পরিধান করা বাধ্যতামূলক করেন। অথচ কালো ছিলো আব্বাসীয়দের নিদর্শন এবং সবুজ হচ্ছে আলাভিদের নিদর্শন।

এ-দিকে, আলি রেজাকে ভাবী সম্রাট ঘোষণা করায় তুমুল বিরোধ দেখা দেয়। এক দল বলতে লাগলো, এর মাধ্যমে মামুন পার্সিয়ান আলাভি সমর্থকদের সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন। আরেকটি দলের ভাষ্য—মামুন পারসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আলাভিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তৃতীয় দল বলছিলো, মামুন অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, বনু আব্বাসের চেয়ে আলি রাষ্ট্রীয় পদের অধিক হকদার। চতুর্থ আরেক দলের অভিমত—মন্ত্রী ফজল বিন সাহাল, যিনি মামুনকে ওই পদ দেওয়ার ব্যাপারে উদ্দীপ্ত করেন, তিনি এর মাধ্যমে পারসিকদের আকৃষ্ট করে আলাভি খিলাফতের স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলেন, যার রাজধানী হবে পারস্যের যে-কোনো একটি শহর।

[১৮৯] দ্রষ্টব্য—মাহমুদ শাকির, *মাউসুআতুত তারিখিল ইসলামি*: ৫/১৯২; খলিফা ইবনু খাইয়াত, *তারিখু খলিফা*: ১৪০; *তারিখে তাবারি*: ৫/৯৫ ও তৎপরবর্তী

[১৯০] আলি বিন মুসা আর রেযা রহ. হিজরি ১৪৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরি ২০৩ সনের ৩০ সফর ইরানের তুস নগরীতে শাহাদত বরণ করেন। তার পিতা ছিলেন মুসা বিন জাফর। তিনি মুসা কাযিম নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন।—অনুবাদক

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কালো পোশাক মুছে ফেলা এবং তৎস্থলে সবুজ প্রতিস্থাপন করা এবং আলি রেজাকে ভাবী সম্রাট ঘোষণা করা—এ-সব ছিলো ফজল বিন সাহালের কারসাজি। এই ফজল গোপনে মামুনের ক্ষমতার কলকাঠি নাড়তো। এর ফলে বাগদাদে একটি অভ্যুত্থানের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ২০২ হিজরি (৮১৬ ইং) সনের মুহাররম মাসে মামুনকে পদচ্যুত করে তার চাচা ইবরাহিম বিন মাহদির হাতে শাসনভার অর্পণের বাইআতও নেওয়া হয়েছিলো।

মন্ত্রী ফজল বিষয়টি মামুনের কাছ থেকে গোপন রাখেন। তার গোপন দুরভিসন্ধি, প্রকৃত অবস্থা আড়াল ও কূটচালের বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরে খলিফা মামুন ভীষণ বিরক্ত হন। মামুন অবিলম্বে বাগদাদে রওনার আদেশ দেন। ফজল যখন সারাখস এলাকায় তার বাহন নিয়ে পৌঁছলেন, তখন চারজন গুপ্তঘাতক তার হাম্মামখানায় ঢুকে তাকে হত্যা করে। হত্যাকারীরা গ্রেফতার হন এবং তাদের শিরশ্ছেদ করা হয়।

ইরাকে যাওয়ার পথে খলিফা মামুন তার বাবা হারুনুর রশিদের সমাধি অতিক্রমকালে তার কবর যিয়ারত করেন। ২০৩ হিজরি সনের সফর মাসের শেষ দিকে হঠাৎ তুস শহরে আলি রেজা ইন্তেকাল করেন—যাকে খলিফা মামুন মন্ত্রী ফজলের পরামর্শক্রমে ভাবী সম্রাট করেছিলেন। তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিলো বলে শিয়ারা দাবি করে।

বাগদাদে মামুনের আগমন ঘটে। অথচ সেখানকার অধিবাসীরা ইবরাহিম বিন মাহদির হাতে দুই বছর আগে আনুগত্যের শপথ করেছিলো। আব্বাসীয় রাজধানীতে প্রবেশ করার আগে মামুন নাহরাওয়ানে কয়েক দিন অবস্থান করেন। এখানে ইন্তেকাল করেন তাহের বিন হুসাইন ও কয়েকজন সেনাপতি। ২০৪ হিজরি (৮১৯ ইং) সনের সফর মাসের ১৪ তারিখে যখন মামুন প্রবেশ করেন, তখন সাথে ছিলো বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনী। এক সপ্তাহ পর তিনি কালো পোশাকের রেওয়াজ ফিরিয়ে আনেন। হারিয়ে যায় সবুজ পোশাক।

মামুনের চাচা ইবরাহিম পালিয়ে যান। ৬ বছর তিনি বাগদাদে আত্মগোপন করে থাকেন। অবশেষে আত্মসমর্পণ ছাড়া তার কোনো বিকল্প ছিলো না। মামুন তাকে ক্ষমা করে দেন। পাশাপাশি চারজন গুরুতর ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া সব বিদ্রোহীর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

পারস্যও শান্ত হয়ে ওঠার পর মামুন ৮ বছর আগে নিহত প্রাক্তন মন্ত্রী ফজল বিন সাহলের ভাই হাসানের কন্যা বুরানের সাথে ২১০ হিজরি (৮২৬ ঈ.) সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়েতে তার সৎ মা জুবাইদা উপস্থিত ছিলেন। তাকে বরের পাশে বসানো হলো। মামুন তাকে বললো, তোমার কী কী বাসনা আছে বলো? নববধূ লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকলে জুবাইদা তাকে বললেন, তোমার মালিকের সঙ্গে কথা বলো এবং তোমার বাসনা প্রকাশ করো। তিনি তো তোমাকে হুকুম দিয়েছেন। তখন নববধূ বললো, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার কাছে আমার প্রার্থনা—আপনি আপনার চাচা ইবরাহিম বিন মাহদির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং তাকে তার পূর্ববর্তী মর্যাদার আসনে আসীন করাবেন। মামুন বললেন, তা-ই হবে। বুরান বললেন, আর মা জুবাইদাকে হজে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। মামুন বললেন, তা-ই হবে।[১৯১]

বিদআত ও দাঙ্গা নিরসনে ভূমিকা

কিছু কিছু রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিলো মিসর—বিদ্রোহীরা উবায়দুল্লাহ বিন সিররির নেতৃত্বে সেখানে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ৮২৫ সালে মামুন আবদুল্লাহ বিন তাহের বিন হুসাইনের নেতৃত্বে তাদের দমনে সেনাবাহিনী পাঠান। আবদুল্লাহ বীরত্ব ও উন্নত চরিত্রে সমুজ্জ্বল পুরুষ ছিলেন। তিনি তার সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করতে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে বলেছেন:

> "নিশ্চয় তোমরা হকের পথে লড়াইরত আল্লাহর সৈনিক। তার ধর্মের রক্ষাকর্তা। তার অবাধ্যদের শাস্তিদাতা। আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত হাতে ধারণকারী দায়ি। আল্লাহ দ্বীনের যে-সব বিষয় আদেশ করেছেন তার আলোকে মুসলমানদের শাসনকারী। সুতরাং যারা অবাধ্য, বিদ্রোহী, পৃথিবীর বুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং দলছুট—তাদের সাথে যুদ্ধ করো। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবিচল রাখবেন। অতএব, সর্বাবস্থায় বিচক্ষণতার সাথে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

[১৯১] দ্রষ্টব্য—তারিখে তাবারি: ৫/১০১-১২২

আবদুল্লাহ মিশরের বিদ্রোহী আন্দোলন দমন করতে সফল হন। সেখানে ফিরে আসে শান্তি ও নিরাপত্তা। দৃঢ় হয় আব্বাসীয় খিলাফতের ভিত। পুরস্কারস্বরূপ খলিফা মামুন তাকে জাজিরা, শাম ও মিশরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন।

এ-দিকে আজারবাইজানে বাবক খুররামির চরম নিকৃষ্ট আন্দোলন শুরু হয়। এরা দ্বীনের বহু হারাম বিষয়কে হালাল সাব্যস্ত করতে শুরু করে। বাবক পাহাড়ি এলাকায় নিজের শক্ত ঘাঁটি গাড়ে। ধীরে ধীরে তার অন্যায়-অনাচার ও দুরাচারিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মামুন তাকে হত্যা করতে এবং আন্দোলন দমন করতে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। এই অভিযান চলতে থাকে মুতাসিমের শাসনকাল পর্যন্ত। একপর্যায়ে বাবক নিহত হয়। (বিস্তারিতভাবে তাদের ঘটনা উল্লেখ করা হবে)।[১৯২]

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রসার-প্রচারে মামুন তার বাবা হারুনুর রশিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ৮৩০ সালে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বায়তুল হিকমাহ' বা উইজডম হাউস, যা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও অনুবাদ সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত ইন্সটিটিউট। এটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের পাশাপাশি ছিলো বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অতুলনীয় গ্রন্থাগার।

তার শাসনামলে গ্রিক, ফারসি ও সিরিয়ান অসংখ্য বই আরবিতে অনুবাদ করা হয়। হুনাইন বিন ইসহাক ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত অনুবাদক, ডাক্তার ও দার্শনিক। তিনি বেশ কয়েকটি বই গ্রিক ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ও হিপোক্রেটিসের মেডিসিন-বিষয়ক বই। এ-ছাড়াও তিনি অ্যারিস্টটলের রচনা, প্রকৃতি ও নৈতিকতা-বিষয়ক বই লিখেছিলেন। প্লেটো ও ম্যাসাসের দর্শন ও আইন এবং ইউক্লিডের জ্যামিতির উৎস-বিষয়ক বইও লিখেছেন। আরও অনুবাদ করেছেন আর্কিমিডিসের বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ। এ-ছাড়া তিনি মেডিসিন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল, সংগীত ইত্যাদি বহু বই অনুবাদ করেছেন। হুনাইন ও তার সহকারী অনুবাদকদেরকে খলিফা মামুন তাদের বেতন ছাড়াও নানা সময়ে আর্থিক পুরস্কার প্রদান করতেন।[১৯৩]

[১৯২] দ্রষ্টব্য—আল-কিন্দি, *আল-ওয়ালায়াতু ওয়াল কুযাত*: ১২৭-১২৮; ইবনু কুতাইবা, *আল মাআরিফ*: ৩৯০

[১৯৩] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৫/১৯৭-১৯৮; ইবনু নাদিম, *আল ফিহরিস্ত*: ৩০১

ইতিহাসবিদেরা খলিফা মামুনের ব্যাপারে তাদের মত এভাবে ব্যক্ত করেন যে, জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে হারুনুর রশিদের খিলাফতকাল জাতির জন্য যেমন উপকারী, মামুনের শাসনামলও তেমনি। মামুন প্রজাদের সুখের জন্য শান্তির প্রতীক ছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির শিক্ষা এবং প্রচার-প্রসারের জন্য পানির মতো স্বর্ণ বিলিয়েছেন। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যাপক নিরাপত্তা ও সাধারণ সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এর উদাহরণ খুলাফায়ে রাশিদা ও উমর ইবন অবদুল আযিযের শাসনামল ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ তার রাজসভায় ইয়াহইয়া বারমাকি, ফজল, জাফর, কাজি আবু ইউসুফ, কাজি মুহাম্মাদ, হাফিজ ও আবু নাওয়াসের মতো কোনো উপদেষ্টা ছিলেন না। তিনি নিজ জ্ঞান-কীর্তি-প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তার বিবেচনায় কোনো ইমাম বা বড় আলেমের চেয়ে কম ছিলেন না।

তিনি একাধারে একজন বড় মুহাদ্দিস, মুফতি ও একনিষ্ঠ মুসলিম সম্রাট ছিলেন। উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের কবি ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন। অসংখ্য হাদীস তার মুখস্থ ছিলো। ছিলেন কুরআনের হাফিজ। ইসলামের রীতিসমূহ বড় নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। পূর্ণাঙ্গতার দিক থেকে তিনি ছিলেন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাহিত্য, হাদীস, ফিকহ, আরব-ইতিহাস, কবিতা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা—যত বিষয়ের আসরেই যাওয়া হয় না কেন, তাকে শীর্ষ দিকে দেখা যায়। বীরত্বপূর্ণ বিজয়ের কারণে দুনিয়ার সভ্যতার ইতিহাসে তিনি খ্যাতিমান ও স্মরণীয় ব্যক্তি হিসাবে রয়েছেন। বীরত্বের লড়াইয়ে তার তেজদীপ্ত হাত দেখে বিশ্বাস করা যেতো না যে, ওই হাতে তিনি তরবারি ছাড়া কখনো কলম স্পর্শও করেছেন।

তিনি আলেম ও কবি-সাহিত্যিকদের সাথে মজলিসে বসতেন। কথিত আছে, তার শেষ দিনগুলোতে তিনি মুতাজিলাদেরকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনার জন্য সেমিনারের আয়োজন করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মতো উঁচু পর্যায়ের ইমামগণ

উল্লেখ করেছেন, মুতাজিলাদের[১৯৪] চিন্তাধারা ছিলো মহান আল্লাহর কালামের বিপরীতে।[১৯৫]

[১৯৪] দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে ইসলামি আকিদার ক্ষেত্রে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানকে কেন্দ্র করে আবির্ভাব হওয়া একটি দলের নাম মুতাজিলা। এরা ওয়াসিল ইবনে আতার অনুসারী। মুতাজিলা নামটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমদের দেওয়া। 'মুতাজিলা' শব্দটি এসেছে আরবি 'ইতিজাল' শব্দ থেকে। এর অর্থ পৃথক হওয়া। তাদের 'মুতাজিলা' বলার কারণ হলো, তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ শাহরাস্তানি (রহ.) বলেন, এক ব্যক্তি হাসান বসরির (রহ.) কাছে এসে বলেন, হে দ্বীনের ইমাম, আমাদের মধ্যে এমন এক দলের আবির্ভাব হয়েছে, যারা কবিরা গুনাহকে কুফরই মনে করে এবং কবিরা গুনাহকারী ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় বলে দাবি করে। আবার অন্য একটি দল কবিরা গুনাহকারীর ক্ষমার প্রত্যাশী। তারা মনে করে, ঈমানদার অবস্থায় গুনাহ করলে ঈমান চলে যায় না। আমরা তা হলে কোন আকিদা পোষণ করবো? হাসান (রহ.) এ-বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি জবাব দেওয়ার আগে ওয়াসিল ইবনে আতা বলেন, কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তি মুমিনও নয়, কাফিরও নয়; বরং তার স্থান হলো ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী। এ-কথা বলে তিনি হাসান বসরির (রহ.) মজলিস থেকে উঠে যান এবং নিজের এই মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। এরপর হাসান বসরি (রহ.) বলেন, 'ইতাজাল আন্না ওয়াসিল' (ওয়াসিল আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে)। তখন থেকে ওয়াসিল ও তার অনুসারীদের নাম **'মুতাজিলা'** হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।—*আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫২*

[১৯৫] তৎকালীন সিরিয়া, মিশর, ইরাক ও পারস্যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং মুসলমানদের একত্রে বসবাসের ফলে ইসলামি আকিদায় ভিন্ন শাস্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সে-সময় ব্যাপকভাবে গ্রিক, লাতিন, পারস্য ও ভারতীয় নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। একটি দল তখন এ-সব শাস্ত্র-দর্শনের প্রভাবে কুরআন-হাদীসের চেয়ে শুধু যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এরাই মুতাজিলা। ইহুদিদের অনেক আকিদার সঙ্গে মুতাজিলাদের মিল রয়েছে। যেমন—মুতাজিলাদের উল্লেখযোগ্য একটি আকিদা হলো, **খালকে কুরআন বা কুরআন সৃষ্ট হওয়ার আকিদা।** ইবনুল আসির (রহ.) বর্ণনা করেন, 'খালকে কুরআন'-এর প্রথম প্রবক্তা হলো লাবিদ ইবনে আসাম। আর সে ছিলো ইহুদি। এভাবে অন্য দর্শন ও শাস্ত্রের আশ্রয় নিয়ে তারা নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে।
মুতাজিলাদের আবির্ভাব ঘটে উমাইয়া-শাসনামলে। তাদের আগে আত্মপ্রকাশ করা কদরিয়্যা ইত্যাদি দলের চেয়ে তাদের অবস্থান ছিলো দুর্বল। তাই তারা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য একটি বৃহৎ শক্তি খুঁজতে লাগলো। এ-সময় উমাইয়াদের পতন হয়। অতঃপর আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন মুতাজিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এতে মুতাজিলা মতবাদের ভিত মজবুত হয়। তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য লাভ করতে শুরু করে। মুতাজিলাদের প্ররোচনায় খলিফা মামুন এই মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ভিন্ন মতাবলম্বী আলেমদের ওপর নির্যাতন, কারাদণ্ড, এমনকি হত্যা করতে শুরু করে। **২১২ হিজরিতে খলিফা মামুন 'পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী নয়, বরং তা সৃষ্ট'—মুতাজিলাদের আলোচিত এ-আকিদার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন।** আলেম, মুহাদ্দিস, ফিকাহবিদ ও বিচারকদের প্রতি নির্দেশনা পাঠানো হয়—কেউ 'খালকে কুরআন' স্বীকার না-করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এমন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে বহু আলেম চুপ হয়ে যান। কিন্তু আরও বহু আলেম

খলিফা মামুনের মৃত্যু

মামুন তার মৃত্যুর তিন বছর আগে থেকে রোমান ভূমিতে বছরে [illegible] ২১৬ হিজরি (৮৩১ ইং) সনে তিনি রোম দেশে এক বিশাল [illegible] করেন এবং বড় এলাকা জয় করেন। এ সময় বেশ কয়েকটি [illegible] পেরেরবার। তিনি মিশর থেকে ফিরে এসে আবার রোমে [illegible] ২১৭ হিজরিতে আবদুস কিতরি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। [illegible] উচিত শিক্ষা দিতে বের হন। এরপর রোমে অভিযান চালান এবং [illegible] এলাকাটি ১০০ দিন অবরোধ করে রাখেন। এরপর তিনি [illegible] করেন এবং তার অবরোধের ব্যাপারে আজিফকে তার স্থলবর্তী করে [illegible] রোমকরা তার সাথে প্রতারণা করে তাকে বন্দি করে ফেললে তিনি [illegible] হাতে বন্দি থাকেন। এরপর কৌশলে তাদের হাত থেকে পালিয়ে [illegible] বিরুদ্ধে অবরোধ অব্যাহত রাখেন। মামুন আবার ফিরে আসেন [illegible] অধিবাসীদের শায়েস্তা করেন। শেষে তারা নিরাপত্তা সন্ধি করতে বাধ্য হ[illegible]

২১৮ হিজরি (৮৩৩ ইং) সনে মামুন রাক্কা ভূমি থেকে রোম শহরের [illegible] অভিযানে বের হন। এ-সময় তারসুস এলাকা তিনি ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যু[illegible] ঢলে পড়েন। এখানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার খিলাফতের মেয়াদ [illegible] বছর ৫ মাস।[১৯৬]

মুতাসিম বিল্লাহ'র খিলাফতকাল

তার নাম মুহাম্মাদ আল-মুতাসিম বিন হারুনুর রশিদ। ২১৮ হিজরি [illegible] সনের রজব মাসে তারসুস শহরে তার ভাই মামুনকে সমাহিত করার পর [illegible] খিলাফতের বাইআত নেওয়া হয়। মুতাসিমের মা ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত [illegible] মারিদা। হারুনুর রশিদ তাকে বিয়ে করার পর তার গর্ভে মুতাসিম ও [illegible] জন্মলাভ করেন। শারীরিক প্রবল শক্তি, বীরত্ব ও সাহসের গুণে মুতাসিম [illegible]

সত্য তুলে ধরতে পিছপা হননি। এতে তাদের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন। ইমাম [illegible] ইবন হাম্বল (রহ.) তাদের একজন। রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় [illegible] এটি ছিলো সবচেয়ে বৃহত্তম ও নিকৃষ্টতম প্রচেষ্টা।'—অনুবাদক

দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি: ৫/১৭৮*; ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক: ৩৩/২৮৭*

[১৯৬] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি: ৫/১৯৪-১৯৭*

[illegible] তবে দুই অঙ্গুলের চাপের জোরে [illegible] উঠিয়ে [illegible] হাতের মুঠে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে পারতেন অনায়াসে [illegible]

মুতাসিম ছিলেন একজন দক্ষ সমরবিশেষজ্ঞ। তিনি সামরিক বাহিনীর প্রতি বেশ দৃষ্টি রাখতেন। তার পূর্বসূরি আব্বাসি খলিফারা সাধারণভাবে খুরাসানিদের ওপর নির্ভর করতেন। আরব সৈন্যদের ওপর তাদের আস্থা খুব কমই ছিলো—যদিও খুরাসানিদের পক্ষ থেকেও তাদের জন্যে বারবার সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তবুও সামগ্রিকভাবে আরবদের মোকাবেলায় খুরাসানি ও ইরানিদের ওপরই তাদের আস্থা ছিলো বেশি।

মুতাসিম বিল্লাহ শুরুতেই সৈন্যবাহিনীর বিন্যাসের দিকে মনোযোগী হন। তিনি প্রচুর তুর্কি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করলেন। এ-সব তুর্কি সেনার যুদ্ধপ্রিয়তা এবং তাদের রণকৌশল তার কাছে ছিলো অত্যন্ত পছন্দনীয়। এ-যাবৎ সামরিক বাহিনীতে আরবি ও ইরানি এই দুই শ্রেণির সৈন্যই থাকতো। তুর্কিদের সাথে অহরহ লেগে থাকতো বিগ্রহ-লড়াই। কখনো তুর্কি সর্দাররা বশ্যতা স্বীকার করে করদ-মিত্রে পরিণত হতো, আবার কখনো বিদ্রোহী হয়ে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে রীতিমতো যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নতি স্বীকার করতো।

যাই হোক, মুতাসিম এত প্রচুর সংখ্যক তুর্কিকে ফৌজে ভর্তি করলেন এবং তাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করলেন যে, সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে তারা রীতিমতো ইরানিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। খলিফা মুতাসিম যেহেতু নিজে শখ করে এ-বাহিনীটি গঠন করেছিলেন, তাই তাদের অশ্বও ছিলো উন্নতমানের। তাদের বেতন-ভাতাও ছিলো অন্যদের তুলনায় বেশি। এ-জন্যে খুরাসানিরা বাগদাদে তাদের সাথে ঝগড়া-কলহে প্রবৃত্ত হয়। মুতাসিম বিল্লাহ তাদের এ-অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করে বাগদাদ থেকে ৯০ মাইল দূরবর্তী দজলা নদীর তীরে এবং কাতুল নদীর নির্গমন স্থলের নিকটে এ-বাহিনীর সেনাছাউনি নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি তার নিজের বসবাসের জন্যেও একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সৈন্যদের জন্য ব্যারাকসমূহ নির্মাণ করান। বাজার জামে মসজিদ প্রভৃতি জরুরি ঘরবাড়ি নির্মাণ করিয়ে এবং তুর্কিদের বসতি স্থাপন করে তিনি নিজেও এ-নবনির্মিত সামাররা শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যান। এ-শহরটি ৮৩৬ সালে স্থাপিত হয় এবং বাগদাদের পরিবর্তে সামাররা রাজধানীতে পরিণত হয়। এই শহর ৬০ বছর আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী হিসেবে বহাল থাকে।[illegible]

[illegible] দ্রষ্টব্য—তারিখে তাবারি: ৫/১৭২; আল মাসউদি, *আত-তামবিহ ওয়াল ইশরাফ*: ৩০৮

বাবক খুররমির বিদ্রোহ

ইতোপূর্বে আলেচিত হয়েছে যে, বাবক খুররমি ছিলো একজন [illegible] কুসংস্কারপন্থি ধূর্ত ব্যক্তি। সে খলিফা মামুনের যুগে আজারবাইজানে [illegible] নেতৃত্ব দেয়। মামুন তাকে দমন ও গ্রেফতার করার জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। মামুনুর রশিদের প্রেরিত প্রত্যেক সিপাহসালারই তার হাতে [illegible] হয়েছেন। কারও নিকট সে পরাজিত হয়নি। উক্ত শহরকে সে তার [illegible] গ্রহণ করে এবং আশেপাশের সমস্ত এলাকার ওপর তার প্রতিপত্তি ও দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়। আশেপাশের প্রশাসকরা তার ভয়ে তটস্থ থাকতেন। এভাবে [illegible] মুতাসিমের শাসনকাল। মামুন তাকে বাবক খুররমি দমনে বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন।

২২০ হিজরি (৮৩৫ ইং) সনে মুতাসিম বাবককে উৎখাত করার জন্য [illegible] শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। কেননা আজারবাইজানে বাবকের ফিতনা ও স্পর্ধা দিনদিন বৃদ্ধিই পাচ্ছিলো। মুতাসিম এই বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে তুর্কি বংশোদ্ভূত হায়দার বিন কাউসকে নিয়োজিত করেন, যিনি আফশিন নামে সমধিক পরিচিত।

আফশিন ছিলেন রণকৌশল ও গেরিলাযুদ্ধের দক্ষ সিপাহসালার। তিনি স্থানে স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করেন। বাবক যে-পাহাড়ে অবস্থান করতো, তার আশপাশে নির্মাণ করা হয় শক্ত সেনাছাউনি। খলিফার বাহিনী এবং বাহিনীর মাঝে দীর্ঘ দিন তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। বাবকের বাহিনী অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করে। একপর্যায়ে আফশিনের সেনারা চূড়ান্ত শক্তিব্যয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে পৌঁছে যায় বাবকের দুর্গে। আফশিন দীর্ঘ যুদ্ধ ও অবরোধের পর বাবককে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হন।

বাবক, তার ভাই আবদুল্লাহ এবং তাদের সহযোগীদের গ্রেফতার করে [illegible] সামেরায় পাঠানো হয়। খলিফা মুতাসিম বাবক ও তার ভাইকে হত্যা করে [illegible] করে রাখেন। এইভাবে ২০১ হিজরিতে শুরু-হওয়া এই বিদ্রোহী আন্দোলনের যবনিকাপাত ঘটে ২২২ হিজরিতে। এই সময়টাতে তাদের হাতে নিহত হয় [illegible] হাজার মুসলমান।[১৯৮]

[১৯৮] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৫/২০৬; *তারিখুল ইয়াকুবি*: ৩/১৯৯।

রোমের ভূমিতে আমুরিয়া বিজয়

বাবেকের বিদআতি আন্দোলন দমনের পর খলিফা মুতাসিম রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি বড় সেনাবাহিনী সজ্জিত করেন। কারণ, রোমানরা আজারবাইজানে বাবেকের দমনে মুতাসিমকে ব্যস্ত দেখে বাগদাদ আক্রমণে সচেষ্ট হয়। এ-লক্ষ্যে রোমান রাজা সম্রাট থিওফিল আক্রমণ করে বসে আরব-ভূখণ্ডে। একপর্যায়ে সে খলিফা মুতাসিমের জন্মস্থান জিবাত্রা শহর হামলা করে। এখানকার অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এরপর থিওফিলের বাহিনী অগ্রসর হয় মালাতিয়ার[১৯৯] দিকে। সেখানে অসংখ্য মুসলিম নারীকে বন্দি করা হয় এবং বহু পুরুষকে হত্যা করা হয়।

৮৩৮ সালে মুতাসিম বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। পর্যাপ্ত রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে নিজ নেতৃত্বে রোম অভিযানে বের হন। এ-দিকে, আফশিনকে দ্বিতীয় আরেকটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার দিয়ে আঙ্কারার পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করে খলিফার সাথে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। মুতাসিম যখন তার বিশাল

[১৯৯] এলাকাটির দাপ্তরিক নাম 'মালাতিয়া সেবাস্তিয়া'। স্থানীয়দের কাছে 'বাংলাদেশ' হিসেবেই পরিচিত জায়গাটি। পরিবহন, দোকানপাট, আইনশৃঙ্খলা-সংশ্লিষ্ট সবাই এই নামেই চেনেন। সেখানে কেউ বাংলাদেশের কথা বললে স্থানীয়রা আর্মেনিয়ার 'বাংলাদেশ' এলাকার কথাই ধরে নেন। ইয়েরেভানের ১২টি বিভাগের মধ্যে 'মালাতিয়া সেবাস্তিয়া' অন্যতম। সেখানকার জনসংখ্যা ১ লাখ ৪১ হাজার ৯০০। বাংলাদেশ নামক জায়গাটির ল্যান্ডমার্কগুলো হলো প্যাট্রিয়টিক ওয়ার মেমোরিয়াল পার্ক, ইয়ুথ পার্ক, মালাতিয়া গার্ডেন, ম্যাটারনিটি পার্ক, লাভ অ্যান্ড ফেইথ পার্ক, ইতালিয়ান পার্ক, দলমা গার্ডেন মলসহ বেশ কিছু গির্জা।
প্রশ্ন আসতেই পারে, কেন এই নামকরণ? এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার আরমানিটোলার ভূমিকা রয়েছে এতে। অষ্টাদশ শতকে পুরান ঢাকার এই এলাকায় আর্মেনিয়ার অধিবাসীরা থাকতেন। ভাগ্যবদলের লক্ষ্যে ঢাকায়-আসা আর্মেনিয়ানরা অল্প সময়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত বিস্তারের মাধ্যমে তারা গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির লবণের রমরমা ব্যবসা ছিলো। এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণের দায়িত্ব পাওয়া ঠিকাদারদের অধিকাংশ ছিলো আর্মেনিয়ান। তারা যেখানে থাকতেন, সেই জায়গাটির নামকরণ হয়ে যায় আরমানিটোলা। সেখানে আর্মেনিয়ানদের স্থাপিত একটি গির্জা আছে।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর আর্মেনিয়ার ইয়েরেভানের জায়গাটির নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ'। এর পেছনে রয়েছে অন্যরকম প্রতিবাদ। আর্মেনিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পাকিস্তান কার্পণ্য করে। এরপ্রতিবাদে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এমন নামকরণ হতে পারে বলে মনে করা হয়। সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুলাই ২০১৭; বাংলা ট্রিবিউন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।—অনুবাদক

বাহিনী নিয়ে টরেস পর্বত অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, রোমান-সম্রাটের বাহিনী তখন মুসলিম সেনাপতি আফশিনের সেনাবাহিনী সামনে পড়ে। মুসলিম-বাহিনী দ্রুত তাদের মোকাবেলা করে। বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সেনাবাহিনী রোমানদের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালায় এবং তাদের পরাজিত করে। সম্রাট থিউফিলের বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় আমুরিয়ার দিকে।

খলিফার পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের উভয় সেনাদল একত্রিত হয় আঙ্কারায়। এখান থেকে খলিফা মুতাসিম তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আমুরিয়া অভিযানে যাত্রা করেন। এ-যাত্রায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা করে তিনি আফশিনকে ডান বাহিনীর এবং আশনাছকে বাম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। নিজে ব্যূহের মধ্যবর্তী অবস্থানে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিম-বাহিনী অগ্রসর হয়ে আমুরিয়া অবরোধ করে। কামান ও ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে রোমানদের নগরপ্রাচীর ও সুরক্ষিত দুর্গ ভেঙে আমুরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়। জিবাত্রা ও মালাতিয়ায় রোমান-বাহিনী যে-ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলো তার চরম প্রতিশোধ নেন খলিফা মামুন। আমুরিয়া শহর ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

আমুরিয়ায় আক্রমণের পূর্বে রোমানদের হাতে বন্দি ছিলো বহু মুসলিম নারী। তাদের এক রোমান দাসী বানিয়ে অত্যাচার করতো। আর সে বলতো, হে মুতাসিম, তুমি কোথায়? আমুরিয়া আক্রমণের পূর্বে এই সংবাদটি একজন ব্যবসায়ী খলিফা মুতাসিমের কানে পৌঁছায়। আমুরিয়া জয় করার পর মুতাসিম ওই মহিলা এবং নিপীড়ক রোমান সৈনিককে উপস্থিত করান। মহিলাকে মুতাসিম বলেন, আমি তোমাকে এই রোমানের বিচারক নিযুক্ত করলাম। তুমি চাইলে তাকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারো। তোমার জন্য আমরা তাকে হত্যা করবো। পরে মহিলা আমিরুল মুমিনিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় এবং রোমান সৈনিককে ক্ষমা করে দেয়। মুতাসিমও তাকে ক্ষমা করে দেন।[২০০]

চক্রান্ত রুখে দেওয়া

আরব নেতাদের একটি অংশ মুসতাসিমের কাছ থেকে খিলাফতের পদ ও আনুগত্য তুলে নিয়ে আব্বাস বিন মামুনের হাতে অর্পণের প্রচেষ্ট চালায়। খলিফা মুতাসিম, সেনাপতি আফশিন ও আশনাছসহ তুর্কি নেতাদের হত্যার পরিকল্পনা করে আরব নেতা আজিফ বিন আমবাসা। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার সাথে একমত হওয়া পর্যন্ত সে

[২০০] দ্রষ্টব্য—*আল-কামিল ফিত তারিখ*: ৬/৪৫; *তারিখে তাবারি*: ৫/২৩৫

এ-ব্যাপারে আব্বাসকে উপর্যপুরি প্ররোচণা দিতে থাকে। একপর্যায়ে আব্বাস এতে রাজি হন। এ-দিকে, মুতাসিমের এক নিষ্ঠাবান ভক্ত চক্রান্তটি পৌঁছে দেয় মুতাসিমের কাছে। মুতাসিম তখন আমুরিয়া থেকে তরসুসের দিকে ফিরছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যার নির্দেশ দেন এবং ভাতুষ্পুত্র আব্বাসকে বন্দি করে রাখেন। জেলখানায় মারা যান আব্বাস।[২০১]

আফশিনের পতন

খলিফা মুতাসিম এ-বিষয়ে প্রমাণ পান যে, তুর্কি সেনাপতি আফশিন গোপনে মা-ওরাউন নাহর (ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে) শহরের কর্তৃত্ব নিয়ে সেখানে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। তাবারিস্তানের নায়েব মাজইয়ার বিন কারিন ছিলেন খুরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন তাহেরের অধীন। তিনি তাকে খারাজ দিতেন। কোনো কারণে মাজইয়ার ও আবদুল্লাহর মাঝে অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। তাই তিনি সরাসরি কেন্দ্রে খারাজ পাঠিয়ে দিতেন। সেখান থেকে আবদুল্লাহর প্রতিনিধির কাছে তা স্থানান্তরিত হতো।

এ-দিকে, আবদুল্লাহ বিন তাহের জানতে পারেন, আশফিন অহরহ রসদপত্র, অর্থ-সম্পদ ও সমরসরঞ্জাম তার মাতৃভূমিতে পাঠাচ্ছে, তখন তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। বিষয়টি তিনি মুতাসিমকে জানান। আফশিন ভেবেছিলেন, খলিফা তাকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করবেন, কিন্তু তার আশা পূরণ হলো না। তাই তিনি গোপনে তাবারিস্তানের নায়েব মাজইয়ারকে গোপন চিঠিপত্রের মাধ্যমে আবদুল্লাহ বিন তাহেরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে লাগলেন। একপর্যায়ে মাজইয়ার বিদ্রোহ করে বসে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে। খলিফা মুতাসিম তার বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে বাহিনী পাঠালেন। মাজইয়ার ও তার ভাই কুহিয়ারকে গ্রেফতার করে সামেরায় খলিফার কাছে পাঠানো হলো। সাথে ওইসব চিঠিপত্রও পাঠানো হলো, যা আফশিন মাজইয়ারের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

মুতাসিম মাজইয়ারকে হত্যা করে ক্রুশবিদ্ধকরণের আদেশ দেন। আর আফশিনের বিচারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল গঠন করেন। এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন বিচারপতি আহমাদ বিন আবু দাউদ, মন্ত্রী মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন জিয়াত ও তার সহকারী ইসহাক বিন ইবরাহিম। কাউন্সিল নিশ্চিত হয় যে, আশফিন মাজইয়ারসহ রাষ্ট্রের বিদ্রোহী লোকদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি

[২০১] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৫/২৪০-২৪৫।

মেসোপটেমিয়ায়।[২০২] নিজের শাসনক্ষমতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তার দেশ আশরুসানার লোকদের কাছে বিপুল পরিমাণ রসদ, অর্থ ও উপহার পাঠিয়েছে। এ-ছাড়া তিনি এখনও পূর্বপুরুষদের মাজুসি ধর্ম পালন করছেন, এ-বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। সুতরাং খলিফাকে তাকে কারাগারের একটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে বন্দী করার নির্দেশ দেন। এখানেই আশফিন ২২৬ হিজরিতে মারা যান।[২০৩]

এর এক বছর পর, ২২৭ হিজরি (৮৪৩ ইং) সনে খলিফা মুতাসিম ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো ৪৫ বছর। তিনি ৯ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।[২০৪]

ওয়াসিক বিন মুতাসিমের খিলাফতকাল

হারুন আল-ওয়াসিক তার পিতার ইন্তেকালের পর ২২৭ হিজরি (৮৪২ ইং) সনে রবিউল আউয়াল মাসে খিলাফতের পদে আসীন হন। ওয়াসিকের মা ছিলেন রুম বংশোদ্ভূত। তার নাম কারাতিস। যে-বছর ওয়াসিক খিলাফতপ্রাপ্ত হন, সে-বছরই কারাতিস ইন্তেকাল করেন। ওয়াসিক তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন তুর্কিদের সাথে। তাদের অধিষ্ঠিত করেন রাজ্যের বড় বড় পদে। তিনি তুর্কি সেনাপতি আশনাছকে তার মন্ত্রী বানান এবং সুলতান উপাধিতে ভূষিত করে তাকে রাজমুকুট ও রত্নখচিত কোমরবন্ধ পরিয়ে দেন।

আহমদ বিন দুআদ আল-মুতাজিলি ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক ইবনুয-যাইয়্যাত ছিলেন রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা ও মন্ত্রী। শুরুতে তিনি তুর্কিদের প্রভাব কমাতে

[২০২] মেসোপটেমিয়া অর্থ দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস বা দজলা ও ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিলো। আধুনিক ইরাক, সিরিয়ার উত্তরাংশ, তুরস্কের উত্তরাংশ এবং ইরানের খুযিস্তান প্রদেশের অঞ্চলগুলোই প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত ছিলো বলে মনে করা হয়। মেসোপটেমীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ হতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের মধ্যে মেসোপটেমিয়ায় অতি উন্নত এক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিলো। সভ্যতার আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চল মিশরীয় সভ্যতার থেকে অনেকটাই ভিন্ন ছিলো এবং বহিঃশত্রুদের থেকে খুব একটা সুরক্ষিত ছিলো না বলে বারবার এর উপর আক্রমণ চলতে থাকে এবং পরবর্তীতে এখান থেকেই ব্রোঞ্জ যুগে আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় ও লৌহ যুগে নব্য-আসিরীয় এবং নব্য-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে উঠে। সূত্র: সাংস্কৃতিক ভূগোল, ড. নূর বখত, প্রকাশক: গ্লোব লাইব্রেরি (প্রাঃ) লিমিটেড অবলম্বনে

[২০৩] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৫/২৬২-২৬৩

[২০৪] দ্রষ্টব্য—*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১০/৩২৪

অভিযান শুরু করেন মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে। তাদের সভা-সেমিনার নিষিদ্ধ করেন। ব্যাপক প্রসার ঘটান আহলে সুন্নাতের মতবাদের। এর বিরোধীদের রাষ্ট্রীয় কার্যালয় থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল—যিনি মুতাজিলাদের প্রতিরোধ করেছিলেন—তাকে সম্মানিত করেন। তার বক্তব্য বাস্তবায়নের অঙ্গীকার জানানো হয়। তার সঙ্গে পরামর্শ ব্যতীত বিচারক এবং সরকারি বড় কোনো পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দিতেন না খলিফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ।[২০৭]

বিদআতিদেরও প্রতিরোধ করেন খলিফা মুতাওয়াক্কিল। যারা কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করে না, তাদের ওপর কঠোর আচরণ করেন। পাশাপাশি তিনি সব ধরনের অন্যায় ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং আর্থিক জালিয়াতিতে লিপ্তদের আনাগোনা থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মুক্ত রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান।

২৩৭ হিজরিতে আর্মেনিয়া প্রদেশে বুকরাত বিন আসওয়াত নামক বিশপের নেতৃত্বে একটি দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা আব্বাসীয় শাসন থেকে বের হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জোর চেষ্টা চালায়। তাই বিশপকে গ্রেফতার করে খলিফার কাছে পাঠানো হয়।

আর্মেনীয়রা গভর্নরের সদর দফতরে গভর্নর ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ ইউসুফকে আক্রমণ করে এবং তাকে ও কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে। খলিফা মুতাওয়াক্কিল বিষয়টি অবহিত হয়ে আর্মেনিয়ায় তুর্কি বগার নেতৃত্বে বিশাল এক সামরিক বাহিনী পাঠান, যারা ইতোপূর্বে আরব-উপদ্বীপে সংঘটিত বিদ্রোহ দমন করেছিলো। সেনাপতি বগা বেশ কয়েকটি দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়ে আর্মেনিয়াতে বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে সক্ষম হন।

মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে তুর্কিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েই চলছিলো। খলিফা ভয় করতেন, এটা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও বিশেষত্বের জন্য একসময় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাদের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে আরবদের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা। এই চিন্তার আলোকে তিনি ২৪৩ হিজরি (৮৫৭ ইং) সনে সামেরা থেকে দামেশকে রাজধানী স্থানান্তর করেন। কিন্তু তিনি যে-প্রত্যাশা নিয়ে এটি বাস্তবায়ন করেছিলেন, তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

তিনি জানতে পারেন, তুর্কিরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য প্রচার করা হয় যে, দামেশকের আবহাওয়া খলিফার স্বাস্থ্যের

[২০৭] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৫/২৯৩

অনুকূলে ছিলো না। তাই তিনি আবার ইরাকে ফিরে যান। এখানে তিনি সামেরার অদূরে মাহুজা এলাকায় মুতাওয়াক্কিলিয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাসাদেই তার প্রধান কার্যালয় বানান।

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের ইন্তেকাল

তুর্কিরা মুতাওয়াক্কিলের মনোবাসনা আঁচ করতে পেরে তাকে হত্যা করার ফন্দি আঁকতে লাগলো। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করে মুতাওয়াক্কিলের ছেলে মুনতাসিরকে নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়। মুনতাসির ছিলেন মুতাওয়াক্কিলের বড় ছেলে। কিন্তু মুতাওয়াক্কিল বেশি ভালোবাসতেন তার ছোটো ছেলে মুতাজকে। তাই মুতাজের নামে তিনি তার পরবর্তী খলিফা হওয়ার ঘোষণা দিয়ে রাখেন। উল্লেখ্য, মুতাজের মা ছিলেন রোমান বংশোদ্ভূত, যার নাম কাবিয়া।

বাস, পিতার ওপর বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন মুনতাসির। তুর্কি সেনাপতি বগা কাবিরসহ খলিফার প্রতি বিরাগভাজনেরা এরই অপেক্ষায় ছিলেন। উভয়ের (মুনতাসির ও বগা কবির) ঐকমত্যে মুতাওয়াক্কিলকে হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মতে ২৪৭ হিজরি (৮৬১ ইং) সনের শাওয়াল মাসের তৃতীয় রাতে মন্ত্রী ফাতাহ বিন খাকানসহ খলিফাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে মুতাওয়াক্কিলের বয়স ছিলো ৪০ বছর। ১৪ বছর ১০ মাস তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।[২০৮]

আব্বাসীয়দের পতন শুরু

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর পর সেনাকমান্ডার বগা ও তার তুর্কি সতীর্থরা মুনতাসিরকে খিলাফতের মসনদে বসায়। হুমকি ও জোরপূর্বক তার ভাই মুতাজ এবং সাধারণ জনসাধারণের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয়। কয়েকদিন পর তিনি তার খিলাফতকেন্দ্র মুতাওয়াক্কিলিয়া থেকে সামেরায় স্থানান্তরিত করেন; যেখানে মুতাসিম-নির্মিত তুর্কি সেনাব্যারাক ও প্রাসাদ ছিলো।

এভাবে পূর্বের চেয়ে তুর্কিদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। রাষ্ট্রযন্ত্র হয়ে পড়ে তাদের ইচ্ছার অধীন। যে বা যারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতো না, তাদের বরণ করতে হতো মুতাওয়াক্কিলের ভাগ্য। মুনতাসিরও মাত্র ৬ মাস পর্যন্ত খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়।

[২০৮] দ্রষ্টব্য—আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৫৯০; তারিখে তাবারি: ৫/৩৩৪ ও তৎপরবর্তী

কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেছেন, তুর্কিরা তার ব্যক্তিগত চিকিৎসককে বিষ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলো, যাতে তাকে হত্যা করা যায়। কারণ, তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তারা তাকে মাত্র ২৫ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই এমন নির্মম শাস্তি দেয়।

আব্বাসীয় যুগের প্রথম পর্যায়ের এখানেই শেষ। সেই যুগ ছিলো রাষ্ট্রের কার্যকর ক্ষমতা, মান-সম্মান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার, সভ্যতার সমৃদ্ধির সোনালি যুগ। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তাদের সুনাম-সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকে। শেষ দিকে খিলাফতযন্ত্রে তুর্কিদের অনুপ্রবেশ, ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণসহ নানা অনৈতিক কারণে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রভাব ও সুনাম বিনষ্ট হয়। দুর্বল হয়ে পড়ে আব্বাসীয় রাজ্যের ভিত।

এরপরের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে: মুতাদিদ বিল্লাহ কর্তৃক সামেরা থেকে খিলাফতকেন্দ্র বাগদাদে স্থানান্তর। তার খিলাফতকাল ছিলো ১০ বছর তথা ২৭৯-২৮৯ হিজরি (৮৯২-৯০২ ইং)। এর আগে ৩২ বছর ধরে সামেরার চারজন খলিফা দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: মুসতাইন বিল্লাহ। তিনি হিজরি ২৪৮ সনে খিলাফতপ্রাপ্ত হন এবং ২৫২ হিজরিতে তাকে হত্যা করা হয়। এ-বছর মুতাজ বিল্লাহর হাতে খিলাফতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। ২৫৫ হিজরিতে তিনি বন্দি অবস্থায় মারা যান। এরপর খিলাফতপ্রাপ্ত হন মুহতাদি বিল্লাহ। এর পরের বছরই অর্থাৎ ২৫৬ হিজরিতে তাকেও হত্যা করা হয়। চতুর্থজন হলেন মুতামিদ বিল্লাহ। তিনি কাপুরুষতা ও বৈষয়িক লিপ্সা-বিভোরতায় সমধিক খ্যাত। তুর্কিরা তাকে তার মৃত্যুর আগে ২২ বছর যাবৎ নামকাওয়াস্তে শাসন করার সুযোগ দেয়।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন

আব্বাসীয় খিলাফতের দুর্বলতার আরেকটি দিক হচ্ছে, বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্যের দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিস্তার। এ-সময়ে মুসলিম-সমাজে দেখা দেয় নানা রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রবণতা। প্রান্তিক চিন্তা ও ভ্রান্ত দর্শন বিস্তার লাভ করে। ওয়াসিক বিন মুতাসিমের যুগে যখন তুর্কিদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, তখন থেকে এই ভঙ্গুর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ-সব কারণেই ভিত দুর্বল হয়েছে আব্বাসীয় খিলাফতের। বড় আকারের আন্দোলন ও বিদ্রোহ শুরু হয়েছে আন্দালুসিয়া, উত্তর-

আফ্রিকা, শাম দেশ এবং পারস্যে। আমরা এদের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো, ইন শা আল্লাহ...

আন্দালুসে[২০৯] উমাইয়াদের রাজত্ব

উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা

তার পুরো নাম আবদুর রহমান বিন মুআবিয়া বিন হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান; উপাধি 'সাকরু কুরাইশ' (কুরাইশের বাজপাখি)। তিনি আবদুর রহমান আদ-দাখিল নামে পরিচিত; তার নামে 'আদ-দাখিল' (প্রবেশকারী) শব্দটি যোগ করার কারণ, উমাইয়া-শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আন্দালুসে প্রবেশ করেন।[২১০] তার মুক্তি পাওয়া এবং আন্দালুসে পালিয়ে আসার সংক্ষিপ্ত কাহিনি এই:

যখন থেকে আব্বাসীয়রা শাসনক্ষমতা দখল করে, তখন থেকেই তারা উমাইয়াদের খোঁজে আত্মনিয়োগ করে। আবদুর রহমান তার ছোট (যিনি তার সাত বছরের ছোট) ভাইয়ের সাথে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং ইরাকের ফুরাত নদীর সন্নিকটে একদল বেদুইনের কাছে আশ্রয় নেন। বেদুইনদের কাছে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন, যতক্ষণ না আব্বাসীয়দের নিপীড়ন থেকে পালিয়ে-থাকা উমাইয়াদের অনুসন্ধানকারী দলের চলাচল থেমে যায়।

আবদুর রহমান বিন মুআবিয়া বেদুইনদের তাঁবুর মেহমানখানা থেকে বের হতেই আব্বাসিদের একদল সৈন্য তাকে দেখে ফেলে এবং সৈন্যদলটি তাঁবুর দিকে রওনা দেয়। তখন তিনি বেদুইনদের কাছে থাকা নিরাপদ হবে না বলে মনে করেন। পরে তিনি সাথে-থাকা ছোট ভাইকে নিয়ে ফুরাত নদীর দিকে চলে যান। আব্বাসীয় সৈন্যবাহিনী এখানেও তাদেরকে দেখে ফেলে এবং ধাওয়া করার চেষ্টা করে। দুই

[২০৯] বর্তমানে এটি স্পেন ও পর্তুগালের অংশ। ৭১১ থেকে ১৪৯২ পর্যন্ত এর আয়ুষ্কাল ধরা হয়।—উইকিপিডিয়া

[২১০] আবদুর রহমান আদ-দাখিল 'আবদুর রহমান আল-আউয়াল' (প্রথম আবদুর রহমান) নামেও পরিচিত। তিনি ৭৩১ (১১৩ হিজরি) সালে সিরিয়ার দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। আন্দালুসের কর্ডোভা শহরে ৭৮৮ (১৭২ হিজরি) সালে তার মৃত্যু হয়। আব্বাসীয়দের হাতে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর তিনি তা পুনর্প্রতিষ্ঠিত করেন; এজন্য তাকে আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রথম আমিরও বলা হয়।—আরবি উইকিপিডিয়া

ভাই ফুরাত নদীর ওপরে সামান্য দূরত্ব অতিক্রম না-করতেই সৈন্যদের এই বলে ডাক আসে যে, যদি তারা ফিরে আসে, তা হলে নিরাপত্তা পাবে।

এরপর তার ছোট ভাই ফিরে এলে আব্বাসীয় সৈন্যদল হত্যা করে। আবদুর রহমান আদ-দাখিল ছদ্মবেশ ধারণ করে সামনে চলতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি পৌঁছে যান ফিলিস্তিনে। ফিলিস্তিন থেকে মিশর হয়ে তিনি পৌঁছেন মরক্কোতে। দীর্ঘ ৫ বছর ভ্রমণ, আত্মগোপন ও কষ্ট ভোগের পর ১৩৭ হিজরির কিছু সময় এখানে তার মামাদের গোত্রে আশ্রয় নেন। এখানে তার সাথে বিশ্বস্ত ক্রীতদাস বদরও ছিলো, যে ফিলিস্তিন ছেড়ে আসার সময় মালিকের (আবদুর রহমান আদ-দাখিল) সাথে যুক্ত হয়েছিলো।[২১১]

রাজত্বের ভিত্তি

আবদুর রহমান আদ-দাখিল আন্দালুসে উমাইয়া রাজত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। ফলে তিনি তার ক্রীতদাস বদরকে উমাইয়াদের সাহায্যকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পাঠান। ক্রীতদাস বদর শামি এবং ইয়েমেনি সৈন্যদের কাছে গিয়ে দেখেন, তারা তার মনিব উমাইয়া-শাসক আবদুর রহমানকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৮ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসে আবদুর রহমান আদ-দাখিল মেদিক[২১২] (Mediek) অতিক্রম করেন এবং মালাক্কা[২১৩] থেকে ৬৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মুনাক্কাব[২১৪] নামক একটি স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। এর পরপরই কয়েকটি সামরিক ব্যাটেলিয়ান তার সাথে যোগ দেয় এবং সেভিলে[২১৫] (Seville) চলে যায়। তিনি সেভিল দখল করলে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

তখন আন্দালুস শাসন করছিলেন ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আল-ফিহরি।[২১৬] তিনি আবদুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য মোতায়েন

[২১১] দ্রষ্টব্য—*নাফহুত তিব*: ১/৩৩৪; যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম*: ১১/২৪১

[২১২] সিউটা এবং টিটোউনের মাঝামাঝি অবস্থিত মরক্কোর একটি ভূমধ্যসাগরীয় শহর

[২১৩] মালয়েশিয়ার একটি শহর ও সমুদ্রবন্দর; মালাক্কা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী।—উইকিপিডিয়া

[২১৪] স্পেনের দক্ষিণ আন্দালুসিয়া অঞ্চলের গ্রানাডা প্রদেশে অবস্থিত একটি পৌরসভা।—উইকিপিডিয়া

[২১৫] আন্দালুসিয়া ও স্পেনের সেভিল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়ের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর; গাদালকুইভির নদীর তীরে অবস্থিত।—ইন্টারনেট

[২১৬] তিনি সেপ্টেম্বিয়ায় নারবনির উমাইয়া গভর্নর এবং ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ

করেন। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৯ হিজরি সনে ফিহরির সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং আমির আবদুর রহমান আদ-দাখিল বিজয়ীর বেশে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন। এরপর তিনি আব্বাসীয় খিলাফত থেকে স্বাধীন-হওয়া আন্দালুসে তার নতুন রাজ্যের ভিত্তি মজবুতকরণে মনোযোগ দেন।

আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর আন্দালুস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালান। ১৪৬ হিজরি (৭৬৩ ইং) সনে তিনি আলা বিন মুগিসকে আন্দালুসের শাসক নিযুক্ত করেন এবং অর্থবল ও জনবল দিয়ে তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ান। আন্দালুসের সাবেক শাসনকর্তা ইউসুফ ফিহরির সহযোগীরা এবং আরবদের মধ্যে যারা আবদুর রহমান আদ-দাখিলকে ঘৃণা করে, তাদের সবাই আলা বিন মুগিসের সাথে যোগ দেয়। আবদুর রহমান আদ-দাখিল বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে আলা বিন মুগিসের শক্তি বিচূর্ণ করতে সক্ষম হন এবং তাকে সেভিলের প্রবেশপথে হত্যা করেন। যখন আব্বাসীয় খলিফা স্বীয় সৈন্যদলের পরাজয় ও গভর্নর আলা বিন মুগিসের হত্যার খবর জানতে পারেন, তখন বলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি আমার আর আবদুর রহমানের মাঝে এই বিশাল সমুদ্র (প্রতিবন্ধকতা) তৈরি করে দিয়েছেন।[২১৭]

ফ্রাংকদের রাজা শার্লিমেন বা শার্ল দি গ্রেট উত্তর স্পেনের শহরগুলোর শাসকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের ধ্বংস সাধন করে তাকে হত্যার প্রচেষ্টা চালান; কিন্তু শার্লিমেনের চেষ্টা বিফলে যায় এবং ৭৭৮ সালে তার সৈন্যরা জারাগোজা[২১৮] শহর দখল করতে ব্যর্থ হলে তিনি এই উদ্যোগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

কুরাইশের বাজপাখি-খ্যাত আবদুর রহমান আদ-দাখিল ৪০ হাজারের অধিক যোদ্ধা নিয়ে একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী গঠন করেন, যাদের বেশির ভাগই ছিলেন

পর্যন্ত আন্দালুসের গভর্নর ছিলেন। ৭৫০ সালে উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর স্বাধীনভাবে শাসন করেন। ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান আল-ফিহরি ছিলেন আল-কায়রওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা উকবাহর বংশধর।—*History of the Arabs from the Earliest Times to the present*, p. ৫০৪.

[২১৭] ইউসুফ আল-ফিহরির পরাজয়ের পর আলা ইবনে মুগিস ৭৫৬ সালে কর্ডোভায় এসে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সাথে সন্ধি করেন। এরপর ফিরে গিয়ে আন্দালুস পুনরুদ্ধারের জন্য একদল সৈন্য প্রস্তুত করেন। এরপরে আবদুর রহমানের সাথে তার যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে তাকে হত্যা করা হয়।

[২১৮] জারাগোজা প্রদেশ এবং স্পেনের আরাগনের স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়ের রাজধানী।—উইকিপিডিয়া

[illegible] মুসলিম। তিনি [illegible] এবং [illegible] তিনি [illegible] গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করেন।[২১৮]

কর্ডোভার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি

আবদুর রহমান আদ-দাখিল তার শাসনে রাজ্যের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কৃষি ও শিল্পকর্মকে উৎসাহিত করেন। এর ফলে গুয়াদালকুইভির নদীর তীরে অবস্থিত আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভা পরিণত হয় শিল্প-শিক্ষা ও আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা-সংস্কৃতির বাতিঘরে। কর্ডোভার বিভিন্ন মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাসাদ ও ঘন গাছপালাবিশিষ্ট বাগানসমূহ থেকে এর সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্তেকালের দুই বছর আগে আবদুর রহমান কর্ডোভা জামে মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। তার পুত্র হিশামের শাসনামলে এই মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ হয়।[২২১] মসজিদটি ছিল স্থাপত্য, স্তম্ভ, নকশা এবং জাঁকজমকপূর্ণ বাহ্যিক গঠনের দিক থেকে একটি চমৎকার নিদর্শন। কর্ডোভা তার এ-জামে মসজিদ নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের রাজধানীগুলোর সাথে গর্ব করতো। এই মসজিদটি ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে-উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছে, তা মুসলিমদের উন্নতি ও অগ্রগতিতে প্রধান ভূমিকা রাখে।

[২১৯] আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত নীলনদের পশ্চিম পাশে বসবাসকারী একটি জাতিগোষ্ঠী। বর্বররা ইসলামের পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাবাররা নিজেদের স্বজাতীয় 'বাবার' ভাষায় কথা বলে ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাবে আলজেরিয়া, মরক্কো এবং তিউনিসিয়ার অধিকাংশ বর্বর উচ্চ শিক্ষা বা ব্যাবসায়িক কাজের জন্য ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষা ব্যবহার করে।—*The Berbers (The Peoples of Africa)*

[২২০] দ্রষ্টব্য—ইবনুল আযারি, *আল-বায়ানুল মাগরিব*: ২/২২৯; আবুল হাসান আন-নাবহানি, *তারিখু কুযাতিল আন্দালুস*: ১/৪৩; *আল কামিল ফিত তারিখ*: ৫/২৮০

[২২১] মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ৭৫৪ সালে আর শেষ হয় ৯৮৭ সালে; এটি 'লা মেজকিতা' বা 'দ্য গ্রেইট মসজিদ অভ কর্ডোভা' নামেও পরিচিত। ১২৩৬ সালে ক্যাসলের রাজা তৃতীয় ফার্ডিনান্দ ও রানি ইসাবেলা মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করে স্পেন দখল করে নেয় এবং মসজিদটিকে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় রূপান্তরিত করে। আজও সেখানে ক্রুশ টানিয়ে রাখা হয়েছে।

৫৮ বছর বয়সে ১৭২ হিজরি মোতাবেক ৭৮৮ সালে আবদুর রহমান আদ-দাখিল মৃত্যুবরণ করেন। তাকে কর্ডোভা জামে মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। তার শাসনকাল ছিলো প্রায় ৩৩ বছর।

হিশাম বিন আবদুর রহমান

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের ইন্তেকালের পর ১৭২ হিজরিতে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন পুত্র হিশাম।[২২২] হিশাম ছিলেন একজন খোদাভীরু ও বিনয়ী শাসক। প্রজাদের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিতেন। ন্যায়ের বিস্তার, ধর্মের হেফাজত, বাণিজ্য, শিল্প ও নিমার্ণখাতকে উৎসাহ প্রদান ও ত্বরান্বিতকরণের মাধ্যমে তিনি তার শাসনামলকে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলেন।

হিশাম বিন আবদুর রহমান কর্ডোভা জামে মসজিদের অবশিষ্ট নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছিলেন। গাদালকুইভির নদীর সেতু পুনঃসংস্কার করেন। তার শাসনামলে আন্দালুস অসংখ্য মসজিদ, প্রাসাদ, বিশ্রামাগার, বাগান ইত্যাদিতে ভরে গিয়েছিলো। রাজধানী কর্ডোভার উপশহর কিংবা আশপাশের অঞ্চলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো সাতাশটি। কথিত আছে, পথচারীরা কর্ডোভার পাকা রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের আলোতে ১০ মাইল দূরত্বের পথ চলতে পারতো।

হিশাম জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও ইসলামের গভীর জ্ঞানের অধিকারী মুসলিম ফকিহদের সম্মান করতেন; তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে উদার হস্তে দান করতেন। ঘরে ঘরে গিয়ে গরিব প্রজাদের দেখতে যেতেন এবং তাদের জন্য কাপড়-চোপড় ও খাদ্যবস্তু নিয়ে যেতেন। সর্বস্তরের মানুষ তাকে পছন্দ করতো; ভালোবাসতো।

৩৮ বছর বয়স অতিক্রম না-হতেই ১৮০ হিজরিতে (৮৯৬ সালে) তিনি ইন্তেকাল করেন। তার শাসনকাল ছিলো ৭ বছর এবং কয়েক মাস অর্থাৎ প্রায় ৮ বছর।[২২৩]

[২২২] আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শাসক। তার ডাকনাম আবুল ওয়ালিদ এবং উপাধি হিশাম আর-রেজা। তিনি ৪ শাওয়াল ১৩৯ হিজরিতে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন।

[২২৩] দ্রষ্টব্য—ইবনুল আযারি, *আল-বায়ানুল মাগরিব*: ২/৬১; *তারিখে ইবনে খালদুন*: ৪/১২৪; ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত তারিখ*: ৫/২৪৮; *নাফহুত তিব*: ২/৪৬; ইবনুল ফারযি, *তারিখুল উলামা বিল আন্দালুস*: ১/৩০০

হাকাম বিন হিশামের শাসনকাল

১৮০ হিজরি সনে খিলাফতে উমাইয়ার (উমাইয়া সাম্রাজ্য) দায়িত্ব গ্রহণ করেন হাকাম বিন হিশাম।[২২৪] ক্ষমতা গ্রহণের পরে তিনি এমন কার্যকলাপ শুরু করেন, যা তার খোদাভীরু নেককার পিতা হিশাম বিন আবদুর রহমানের বিপরীত। হাকামের আমলে আলেমরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারতো না; শুধু ধর্মীয় বিষয়াদিতেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিলো।

হাকাম আফ্রিকান নিগ্রো ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী দিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই সেনাবাহিনী কর্ডোভা শহরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে; ফলে তাদের প্রতি জনগণ বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। শিক্ষিতমহল এবং আলেমসমাজ আমির হাকাম বিন হিশামের বিরুদ্ধে নড়েচড়ে বসেন এবং আন্দালুসে অনেকগুলো বিদ্রোহমূলক আন্দোলন দানা বাঁধে। এরপর তিনি চাচা সুলাইমান ও আবদুল্লাহর কাছ থেকেও বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কিন্তু এ-সব বিদ্রোহ ও বিরোধিতা দমনপূর্বক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়। প্রায় ২৬ বছর শাসন করার পর হাকাম বিন হিশাম ২০৬ হিজরি সনে (৮২২ সালে) কর্ডোভা শহরে মৃত্যুবরণ করেন।[২২৫]

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে উন্নয়ন

হাকামের পুত্র আবদুর রহমান আস-সানি (দ্বিতীয় আবদুর রহমান)[২২৬] আন্দালুসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার, মসজিদ, মাদরাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল নির্মাণে গুরুত্বারোপ করেন। যেমন তিনি কর্ডোভার উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন; ফলে কর্ডোভা শহর বৈজ্ঞানিক জাগরণ, স্থাপত্যশিল্প, প্রাসাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

[২২৪] তিনি আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের তৃতীয় আমির। তার উপনাম আবুল আস; তিনি প্রথম হাকাম নামেও পরিচিত। ১৫৪ হিজরিতে তিনি কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। কর্ডোভা প্রাসাদে (Castle of the Christian Monarch) তাকে দাফন করা হয়।
[২২৫] দ্রষ্টব্য—ইবনুল আযারি, *আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/৬৮; তারিখে ইবনে খালদুন: ৪/১৫৩;* ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫/৪১৩-৪১৪; নাফহুত তিব: ১/৩৩৯*
[২২৬] তিনি 'আবদুর রহমান আল-আউসাত' নামেও পরিচিত। তার উপনাম আবুল মুতাররিফ। তিনি ১৭৬ হিজরির শাবান মাসে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের ৭৫ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত 'টলেডো' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩৮ হিজরির ৩ রবিউল আওয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন; কর্ডোভার তৎকালীন রাজপ্রাসাদে তাকে দাফন করা হয়।

দ্বিতীয় আবদুর রহমান কবিতা প্রেমী ছিলেন। শরিয়তের জ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তিনি। খলিফা আল-মামুনের মতো তিনি মুক্ত হস্তে আহলে ইল্ম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের দান-অনুদান করতেন। তার রাজপ্রাসাদে দার্শনিক গবেষক ও আলেমদের আসর বসতো। গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের রচনা ও বইপুস্তক অনুবাদ করার জন্য তিনি বিশেষ কমিটি ও পরিষদ গঠন করেন। তার শাসনামলে (যার স্থায়িত্ব ছিলো ২০৬-২৩৭ হিজরি) আন্দালুসের অনেক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধিত হয় এবং অনেক স্প্যানিশ লোক ইসলামধর্ম গ্রহণ করে; তাদের মধ্য থেকে এমন কিছু সাহিত্যিক তৈরি হয়, যারা আরবি-ভাষার প্রচার-প্রসারে অবদান রেখেছেন।[২২৭]

তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকাল

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যে ধীরে ধীরে দুর্বলতা, বিভক্তি ও অবনতি দেখা দেয় এবং এই অবস্থা প্রায় ৬২ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো। এই অন্তবর্তীকালীন প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার মসনদে একের পর এক এমন কিছু শাসক আসতে থাকে, যারা এই মসনদের যোগ্য ছিলো না। তৃতীয় আবদুর রহমান[২২৮] ক্ষমতাগ্রহণের আগ পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বহাল থাকে। ৯১২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৩০০ হিজরি সনে তিনি আমিরের পদ গ্রহণ করেন।

আবদুর রহমান আস-সালিস (তৃতীয় আবদুর রহমান) একজন সাহসী, দৃঢ় ও যোগ্য লোক ছিলেন। পূর্বের বিভিন্ন ফিতনা, বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দমনপূর্বক তিনি রাজত্বের স্বকীয়তা, ভাবমূর্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি ৩১৭ হিজরি সালে হুকুম জারি করেন যে, মসজিদগুলোতে শুক্রবারের জুমার খুতবায় 'খলিফা' ও 'আমিরুল মুমিনিন' হিসেবে তার নাম উচ্চারণ করতে হবে।

যে-বিষয়টি তাকে এই সিদ্ধান্ত (নিজেকে 'খলিফা' ও 'আমিরুল মুমিনিন' ঘোষণা করা) নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, সেটি হলো আব্বাসীয় খিলাফতের কর্তৃত্ব ও শক্তি হ্রাস পাওয়া এবং ক্ষমতা তুর্কিদের হাতে চলে যাওয়া। খিলাফতে আব্বাসিয়ার

[২২৭] দ্রষ্টব্য—যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৮/২৬১; *আল ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*: ১৮/৮৪

[২২৮] তার উপনাম আবুল মুতাররিফ এবং উপাধি 'আন-নাসির লি-দ্বীনিল্লাহ' (আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী)। তিনি আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অষ্টম আমির বা শাসক এবং আন্দালুসের প্রথম 'খলিফা'। তিনি ২৭৭ হিজরিতে কর্ডোভায় জন্মলাভ করেন এবং ৩৫০ হিজরি সনে 'আয-যাহরা' প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন; কর্ডোভার রাজপ্রাসাদে তাকে দাফন করা হয়।

এই দুর্দশার ফলে মিশরে খিলাফতে ফাতিমিয়ার আবির্ভাব হয়। আর এভাবে আন্দালুসের 'ইমারত' বিবর্তিত হয় 'খিলাফতে'। দেশবাসী তৃতীয় আবদুর রহমানের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং জনগণ তাকে 'আমিরুল মুমিনিন খলিফা আবদুর রহমান' হিসেবেও মেনে নেয়। [২২৯]

খলিফা আবদুর রহমানের শাসনকালকে আন্দালুসের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে গণ্য করা হয়। তার স্থাপত্য, কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত অনেক প্রকল্পের বাস্তবায়ন আন্দালুসে ব্যাপক উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এ-ছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তোলেন অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও হাসপাতাল।

তৃতীয় আবদুর রহমান গাদালকুইভির নদীর তীরে সিয়েরা মোরেনা[২৩০] (Sierra Morena) পর্বতে কর্ডোভার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত জাঁকজমকপূর্ণ 'আয-যাহরা'[২৩১] প্রাসাদ গড়ে তোলেন; প্রায় ২০ বছর যাবৎ প্রাসাদটির নির্মাণকাজ অব্যাহত ছিলো। প্রাসাদটি তৈরিতে মার্বেল পাথর আনা হয় কার্ট্যাগেনা[২৩২] (Cartagena) থেকে এবং এর স্বর্ণমূর্তিখচিত খুঁটিগুলো আনা হয় কন্সটান্টিনোপল থেকে। আয-যাহরা প্রাসাদে বিশাল মসজিদ এবং অনেকগুলো বড় বড় হলকক্ষ ছাড়াও ৪০০টি সাধারণ কামরা এবং খাসকামরা রয়েছে।

দিনদিন কর্ডোভা শহরের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। একপর্যায়ে শহরটি চমৎকার স্থাপত্য, আলোকোজ্জ্বল পাকা রাস্তা এবং ঘনগাছপালাবিশিষ্ট বাগান ইত্যাদির কারণে বাগদাদ ও কন্সটান্টিনোপলের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কারণে কর্ডোভা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাতিঘরে পরিণত হয়, যেখানে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসতো। এই সময়ে ইউরোপ ছিলো মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত।

[২২৯] তবে মুসলিম বিশ্বে তার এই খেলাফত ঘোষণার কোনো প্রভাব পড়েনি।

[২৩০] সিয়েরা মোরেনা বা 'জিবালুশ শা-রাত' স্পেনের প্রধান পর্বতমালাগুলোর অন্যতম। সিরিজটি দক্ষিণ ইবেরিয়ান উপদ্বীপজুড়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ৪৫০ কি. মি. বিস্তৃত।—আরবি উইকিপিডিয়া

[২৩১] 'আয-যাহরা' প্রাসাদের অঞ্চলটি বর্তমানে 'মদীনাতুয যাহরা' হিসেবে পরিচিত; এটি কর্ডোভা শহর থেকে প্রায় ৬ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

[২৩১] স্পেনের একটি শহর; দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের ভূমধ্য উপকূলে মুরসিয়া অঞ্চলের একটি প্রধান নৌকেন্দ্র।—উইকিপিডিয়া

রাজ্যের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও ধন-সম্পদ বেড়ে চলে এবং সাম্রাজ্যের রাজস্ব ও আয় দ্বিগুণ হয়। তৃতীয় আবদুর রহমান আন-নাসিরের শাসনামলের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ মিলিয়ন দিনার। তিনি বার্ষিক আয়ের ৩৫ শতাংশ স্থাপত্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল খাতে ব্যয় করতেন। রাষ্ট্রের ৩০ শতাংশ আয় ব্যয় করতেন সেনাবাহিনীর জন্য, যে-সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিলো এক লাখ। আরবি, বার্বার ও স্লাভদের[২৩৩] দিয়ে এই সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বার্ষিক আয়ের ১৫ শতাংশ বিভিন্ন দফতর ও বিভাগের জন্য খরচ করা হতো; আর বাকি অংশ জমা করা হতো।

সারকথা হলো, তৃতীয় আবদুর রহমান আন-নাসিরের শাসনকালে আন্দালুসে আরবদের মর্যাদা, গৌরব ও মহত্ত্ব চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। ৩০০ হি. থেকে ৩৫০ হিজরি (৯১২-৯৬১ ইং) প্রায় পঞ্চাশ বছর তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনামল স্থায়িত্ব লাভ করে।[২৩৪]

হাকাম বিন আবদুর রহমান আন-নাসিরের খিলাফত

তৃতীয় আবদুর রহমান আন-নাসিরের ইন্তেকালের পরে তার সন্তান হাকাম ৩৫০ হিজরি সনে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হাকাম বিন আবদুর রহমান ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিত্ব। তিনি সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তিনি এমন একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে-পাঠাগারে প্রায় ৪০০ হাজার মূল্যবান বই সংগৃহীত ছিলো।

খলিফা হাকাম বিন আবদুর রহমানের শাসনামলের শুরুতে নর্মানরা[২৩৫] উপকূলে আক্রমণ করলে তিনি তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। এরপর তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে উত্তর দিকের খ্রিস্টান নেতারা। এদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন হাকাম। তার বাহিনী নর্মানদের কয়েকটি এলাকা দখল করে নেয়।

[২৩৩] আধুনিক ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী, যারা স্লাভিক ভাষায় কথা বলে; ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শুরু থেকে তাদের বেশির ভাগ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকা জুড়ে বেশ কয়েকটি স্লাভিক সম্প্রদায় রয়েছে।

[২৩৪] দ্রষ্টব্য—ইবনুল আসির, *আল কামিল*: ৬/৪৬৭; ইবনুল আযারি, আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/১৫৬; যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৮/২৬৫; রাসাইলু ইবনে হাযাম: ২/১৯৪

[২৩৫] নর্মানরা 'নর্সম্যান' বা 'নর্থম্যান' নামেও পরিচিত। ৯ম শতকের শুরুর দিকে এরা উত্তর ফ্রান্সের নরমাঁদিতে বসবাস শুরু করে। সেখান থেকে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলি দ্বীপ বিজয় করে।

নাসারা খলিফার ইচ্ছামাফিক কিছু শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি [illegible] তাদের আবেদন গ্রহণ করেন।

হাকাম বিন আবদুর রহমানের শাসনামলে কর্ডোভা [illegible] উন্নতি সাধিত হয়। তিনি কর্ডোভা জামে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। [illegible] মসজিদটির ছাদ এবং দেয়াল সুসজ্জিত করেন। এই খলিফা নিজের খরচে [illegible] নতুন মাদরাসা নির্মাণ করেন। তিনি একটি উলামা-পরিষদ গঠন করেন এবং এই পরিষদের সদস্যদের জন্য মাসিক বেতন-ভাতাও নির্ধারণ করেন।

খলিফা হাকাম বিন আবদুর রহমান আন-নাসির ৩৬৬ হিজরিতে [illegible] মৃত্যুবরণ করেন। প্রায় ১৬ বছর দেশের উন্নয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের [illegible] রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুতকরণের মধ্য দিয়ে তার শাসনকালের সমাপ্তি ঘটে। [illegible]

নোট: হাকাম আল মুস্তানসিরের সন্তান আবদুর রহমানের জন্য তখন খলিফা তার পুত্রের দেখাশোনা ও পড়াশোনার জন্য একজন উপযুক্ত লোক সন্ধান করছিলেন। এ-দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয় বিন আবি আমেরকে। সে-সময় তার বয়স মাত্র ৩০ বছর। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি খলিফার দরবারে অবস্থান মজবুত করে ফেলেন। কেপর্যায়ে তাকে টাকশালের পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর সেভিলের কাজির পদ দেওয়া হয়।

কিছু দিন তিনি উপকূলীয় অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বেও ছিলেন। পরে খলিফা তাকে উত্তর-আফ্রিকার প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন। তবে ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে খলিফা তাকে আন্দালুসে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ৩৬৬ হিজরিতে খলিফা হাকাম আল মুস্তানসির ইন্তেকাল করেন। এরপর কিছু রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিন আবি আমের ক্ষমতার মসনদে আসীন হন।[৯৭]

বিন আবি আমের তার শাসনের শুরুতেই বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন। সে-সময় আন্দালুসের উত্তর সীমান্তে খ্রিস্টানরা একের পর এক হামলা চালাচ্ছিলো। ৩৬৬ হিজরির রজব মাসে বিন আবি আমের তার বাহিনীসহ উত্তরাঞ্চলে অভিযানে বের হন। ৫১ দিনের এই অভিযানে তিনি হামা ও রাবজা দুর্গ জয় করেন। প্রচুর

[৯৬] দ্রষ্টব্য—ইবনুল আযারি, *আল-বায়ানুল মাগরিব*: ২/২৪০; *রাসাইলু ইবনে হাযাম*: ২/১৮৪; ইবনুল খতিব, *আমালুল আলাম*: ৪১; *তারিখে ইবনে খালদুন*: ৪/১৪৬; ইবনু খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আয়ান*: ৪/৩৭১-৩৭৩

[৯৭] বাসসাম আসালি, *কদাতুল হুরুবিস সলিবিয়্যা*, পৃ-৪১৮-৪৩০

খ্রিস্টানদের সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীসহ তিনি কর্ডোভায় ফিরে আসেন। প্রথম অভিযানেই [illegible] অর্জনের মাধ্যমে বিন আবি আমের প্রজাদের আস্থা লাভ করেন।

[illegible] তিনি আবারও অভিযানে বের হন। [illegible] তিনি সামরিক বাহিনীর মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর নজর দেন প্রশাসনের দিকে। নতুন করে ঢেলে সাজান পুরো রাষ্ট্রের কাঠামো। দুর্বল, ভীরু ও অযোগ্যদের বাদ দিয়ে নতুন ও কর্মঠদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এভাবেই তিনি আমিরিয়া সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। আমিরিয়া সালতানাত ছিলো মুসলিম আন্দালুসের প্রতাপের যুগ।

রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করে বিন আবি আমের নজর দেন আন্দালুসের পাশে অবস্থিত খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর দিকে। শুরু করেন এক দীর্ঘমেয়াদী অভিযানের, যা চালু ছিলো পরবর্তী ২৭ বছর ধরে। এই সময়ে প্রতিটি যুদ্ধেই বিন আবি আমের জয়লাভ করেছেন। কখনো তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়নি, কখনো তাঁর বাহিনীর পতাকা অবনমিত হয়নি। তিনি ঘোড়া দাপিয়েছেন উত্তরে বিস্কে উপসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত। তাঁর বাহিনী অতিক্রম করেছিলো এমন সব এলাকা, তাঁর আগে কোনো সেনাপতি বা শাসক যে-পর্যন্ত যেতে পারেনি।

তিনি কখনো জয় করেছিলেন সাখরা অঞ্চল, আবার কখনো ছুটে গিয়েছেন সেন্ট ইয়াকুব নগরীতে। কখনো তার বাহিনী ঝড়ের গতিতে আছড়ে পড়েছে সান স্টিফেন দুর্গে। তিনি অতিক্রম করেছিলেন পার্বত্য এলাকা, তার সামনে বাধা হতে পারেনি দুর্গম বন্ধুর পথ।

প্রতিবছর দুবার তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন। একবার গ্রীষ্মকালে, আরেকবার শীতকালে। এর আগ পর্যন্ত আন্দালুসের মুসলমানদের মধ্যে শুধু গ্রীষ্মকালে অভিযানে যাওয়ার প্রচলন ছিলো। প্রতিটি অভিযান থেকে ফিরে তিনি পরনের পোশাক ঝেরে ধুলোবালি সংগ্রহ করতেন। তারপর তা একটি বোতলে জমা করে রাখতেন। তিনি ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, তার কাফনের সাথে যেন এই ধুলোবালিও দিয়ে দেওয়া হয়।[২৩৮]

মূলত তিনি একটি হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদের প্রতি লক্ষ রেখেই এমনটা করেছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথের ধুলো ও জাহান্নামের আগুন একত্রিত হবে না।[২৩৯]

[২৩৮] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ১৭/১৬
[২৩৯] *জামে তিরমিজি*: ১৬৩৩। ফাতেহ টুয়েন্টিফোর-এর সৌজন্যে 'হাজিব আল মানসুর: যে

- বনু আব্বাদ: আশবেলিয়া বা সেভিলে এই গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা হলেন [illegible] বংশোদ্ভূত আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ। এর স্থায়িত্বকাল ছিল ১০৩১ থেকে ১০৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

- যুন নূন: এটি হুওয়ারা (বা হাওওয়ারা) গোত্রের একটি বার্বার পরিবার, প্রাচীনকালে উমাইয়াইদের শাসনামলে এরা স্পেনে প্রবেশ করেছিলো। এই গোত্রে ইয়াহইয়া আল-মামুন যুন-নূন নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে; যিনি ৪২৯ হিজরিতে (১০৩৭ ইং) টলেডোতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

- বনু যির: এটি একটি বার্বার গোত্র। আন্দালুসে এই গোত্র থেকে বাদিস বিন হাবুস (আস-সানহাজি) নামে এক ব্যক্তির প্রকাশ ঘটে, যিনি ৪৩০ হিজরিতে (১০৩৮ ইং) গ্রানাডায় একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটি 'গ্রানাডা রাজ্য' নামেও পরিচিত। ১০১৩ ইং থেকে ১০৯০ ইং পর্যন্ত রাজ্যটি টিকেছিলো।

পরস্পর বাক-বিতণ্ডা আর হানাহানিতে লিপ্ত এ-সব ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর বিভক্তির ফলে উত্তর দিকের খ্রিস্টান রাজ্যগুলো ওইসব মুসলিম রাজ্যগুলোতে আক্রমণ করার সাহস পেয়ে যায়।[২৪৩]

আন্দালুসে 'যালাকা' যুদ্ধ

যখন আন্দালুসের ওপর ঝুঁকি ও বিপদ বেড়ে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মুসলিম রাজাগণ উত্তর স্পেনের ঐক্যবদ্ধ খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন সেভিলের শাসক মুতামিদ বিন আব্বাদ মুরাবিত গোত্রের মাধ্যমে মরক্কোর শাসনকর্তাদের সাহায্য চাইলেন। তাদের সেনাবাহিনী [২৪৪] আন্দালুস অতিক্রম করে এবং ৪৭৯ হিজরিতে যালাকা যুদ্ধে খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর সৈন্যবাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করে। মুরাবিত গোত্রের সাহায্য ও সহযোগিতার কারণেই আন্দালুসের উদ্ধার পাওয়া ও তাতে ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সফলতা ও কৃতিত্ব অর্জিত হয়েছে। অনেক আরব ও ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ এ-তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে আরব ও মুসলিম আমির ও শাসকগণ ক্ষমতা নিয়ে পরস্পর জড়িয়ে পড়ে বিরোধ ও হানাহানিতে। পারস্পরিক

[২৪৩] দ্রষ্টব্য—*রাসাইলু ইবনে হাযাম*: ২/৯২; *তারিখে ইবনে খালদুন*: ৪/১৯৫

[২৪৪] ইউসুফ বিন তাশফিন ছিলেন এই বাহিনীর সেনাপতি।

মতবিরোধ ও হানাহানির এ-মহামারী মরক্কোর শাসকদের মধ্যে সংক্রমিত হয়; ফলে তাদের মধ্যেও ধীরে অনৈক্য বাসা বাঁধে এবং দুর্বল হয়ে পড়ে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব। মুসলমান শাসকদের এই অনৈক্য ও বিরোধের সুযোগকে কাজে লাগায় উত্তর স্পেনের খ্রিস্টান রাজ্যের শাসকেরা। তারা দক্ষিণ স্পেনের মুসলিম রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে রাখে। যুদ্ধে সবগুলো মুসলিম রাজ্য পরাজিত হয়; কিন্তু স্বমহিমায় পাহাড়ের মতো স্থির ও অবিচল থাকে গ্রানাডা রাজ্য। এরপর ৬৩৪ হিজরিতে (১২৩৬ ইং) কর্ডোভার পতন আর ১২৪৮ সালে ইশবিলিয়া বা সেভিলের পতন হয়।[২৪৫]

গ্রানাডার ইসলামি সাম্রাজ্য

একমাত্র বনু নাসর (বনু আহমার) ছাড়া আর কেউ দক্ষিণ স্পেনের খ্রিস্টান শক্তিসেনার মোকাবেলা করতে এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে কেউ শত্রুবাহিনীর দমন করতে সক্ষম হয়নি। কেবল বনু নাসরই গ্রানাডায় অবিচল ও স্থির ছিলো, যারা ৬৩০ (১২৩২ ইং) হিজরিতে গ্রানাডায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই রাজ্যের প্রথম রাজা ছিলেন মুহাম্মাদ বিন আল-আহমার—যিনি রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ ও ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমে নিজের শাসনামলকে করে তুলেছিলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

বনু আহমারের শাসনকালে গ্রানাডা সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। রাষ্ট্রে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য এবং স্থিরতা ও প্রশান্তি ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। আজ পর্যন্ত তার অতি প্রসিদ্ধ যে-নিদর্শন ও অবদান অবশিষ্ট আছে, তা হলো সুবিশাল 'আল-হামরা' প্রাসাদ। প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার এবং এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন তার সুযোগ্য পুত্র গালিব বিল্লাহ।[২৪৬] 'কসর মসজিদ' বা 'জামেউল কসর' নির্মাণ করেন তার নাতি মুহাম্মাদ, এই মসজিদটি ছিলো স্থাপত্যশিল্প ও কারুকাজের অন্যতম নিদর্শন।

---

[২৪৫] দ্রষ্টব্য—শাওকি আবু খলিল, আয-যালাকা বিকিয়াদাতি ইউসুফ বিন তাশফিন: ৪২; নাফহুত তিব: ৪/৩৬৪; মাআরিকুল আরব ফিল আন্দালুস: ২৪

[২৪৬] তিনি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-আউয়াল (প্রথম মুহাম্মাদ) নামেও পরিচিত। ১১৯৮ সালে তিনি আন্দালুসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭৩ সালে গ্রানাডায় ঘোড়া থেকে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আল হামরা[২৪৭] প্রাসাদটি ৮০০ মিটার উঁচু একটি পর্বতটিলায় অবস্থিত; পর্বতটির নাম সাবিকা, যেটি গ্রানাডা শহরের পশ্চিমে। একটি প্রাচীর দিয়ে এটাকে পরিবেষ্টন করা হয়েছে, যার ভিতরে রাজা মুহাম্মাদ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেছেন। এই দুর্গগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রহরা দুর্গ। হাদ্রাহ নদী থেকে ছোট্ট নহর দিয়ে দিয়ে এই প্রাসাদের জন্য পানি আনা হতো। চমৎকার কাঠামোর সুবিশাল এই প্রাসাদটি তার গৌরব ও মহত্ত্ব প্রকাশ করে চলেছে। সুউচ্চ স্তম্ভ, সুগঠিত খুঁটি, ছাদের কারুকাজ এবং হলকক্ষগুলোর দেয়ালের চাকচিক্য এর সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এটি দুটি পরিপূর্ণ অংশ নিয়ে গঠিত, সেগুলো হলো: ১. কুমারেস প্রাসাদ, যেটি রাজা আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল নির্মাণ করেছেন। তার ছেলে আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ১৩৪৮ সালে এটি সম্প্রসারণ করেন। ২. কসরে সিবা বা বাহউস সিবা—যেটি রাজা মুহাম্মাদ গনি বিল্লাহ তার ৩৭ বছর (১৩৫৪-১৩৯১ ইং) শাসনকালের প্রথম ধাপে নির্মাণ করেছিলেন।

'কসরুস সিবা'কে আল-হামরা প্রাসাদের সবচেয়ে সুন্দর অংশ বলে গণ্য করা হয়। কসরে সিবার গুরুত্বপূর্ণ হলকক্ষ হলো রাজাদের কক্ষ। এর পাশেই আছে কাআতু বনি সিরাজ (বনু সিরাজের হলকক্ষ)। বনু আহমার এই কক্ষে বনু সিরাজের দণ্ডাদেশ দিতো, বিচার করতো। এর চারপাশ থেকে দেখা যায় উন্মুক্ত বারান্দা, যেটি ১২৪টি মার্বেল পাথরের স্তম্ভের ওপর দিয়ে তৈরি। মাঠের মাঝখানে রয়েছে একটি ঝরনা, এই ঝরনার হাউজটি মার্বেল পাথরের তৈরি, যেটি বৃত্তের আকৃতিতে ১২টি হাতি বহন করে।

প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে গ্রানাডার ইসলামি সাম্রাজ্য স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে ছিলো। রাজা মুহাম্মাদ গনি বিল্লাহ (যিনি বনু আহমারের রাজাদের মধ্যে সর্বাধিককাল শাসক ছিলেন) ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক বিন খালদুনকে ক্যাস্টাইলের রাজদরবারে দূত নিয়োগ দেন।

আন্দালুস থেকে আরবদের বহিষ্কার

যে-সব কারণ আন্দালুস থেকে আরবদের বহিষ্কারের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলোর মধ্যে প্রথম ধাপে ছিলো তাদের মধ্যকার বিভক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে পারস্পরিক ঝগড়া-

[২৪৭] কথিত আছে, লাল দুর্গের দিকে ইঙ্গিত করে প্রাসাদটির নাম রাখা হয়েছে 'আল-হামরা'। আল-হামরা অর্থ লাল অথবা এর লাল স্তম্ভ কিংবা লাল টালি ও ইটগুলোর প্রতি লক্ষ রেখে এই নাম রাখা হয়।

নামে তার আনুগত্য গ্রহণ করে নেয়। ইদরিসের শাসনামলে ইদরিসি সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত হয়। ইদরিসি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো ফাস নগরী এবং ইদরিসই এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দ্বিতীয় ইদরিসের শাসনামলে ইবরাহিম ইবনুল আগ্লাব (যাকে খলিফা হারুনুর রশিদ তিউনিসিয়ার ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন) ইদরিসি সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে দুই পক্ষের মধ্যকার বিরোধ ও আক্রমণ বন্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়টি সমাপ্ত হয়।

২১৩ হিজরিতে (৮২৮ সালে) ইদরিসের ইন্তেকালের পর ৩৭৫ হিজরি পর্যন্ত মরক্কোতে ইদরিসি রাজবংশের শাসনকাল স্থায়ী হয়। শক্তি, বিচক্ষণতা ও বোধগম্যতার দিক থেকে ইদরিসিদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন ইয়াহ্‌য়া বিন ইদরিস বিন উমার, তিনি প্রায় ১৮ বছর (২৯২-৩১০) শাসন করেছিলেন। ইয়াহ্‌য়া বিন ইদরিসের শাসনকালে মরক্কোর প্রভূত উন্নয়ন হয় এবং ন্যায়বিচার, ইনসাফ ও নিরাপত্তা অধিক নিশ্চিত হয়।

ইদরিসি সাম্রাজ্যের রাজধানী ফাস নগরী উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। মরক্কোতে ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে ফেজ নগরী। ইদরিসি শাসনকালে বার্বারদের মাঝে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়।

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে 'জামিউল কারাউয়িন' তথা আল-কারাউয়িন মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদটি হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি একটি অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। মরক্কোতে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি চর্চা এবং আরবি-ইসলামি ঐতিহ্য রক্ষায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভূমিকা রয়েছে।[২৪২]

আল-মুরাবিত রাজবংশ

মুরাবিতগণ বার্বার সানহাজা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ৪৬২ হিজরি থেকে ৫৪১ পর্যন্ত তারা মরক্কো শাসন করেছিলো। সাহারা মরুভূমিতে ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে তাদের পথচলা শুরু হয়েছিলো। তাদের নেতা ইয়াহইয়া বিন ইবরাহিম আল-কিদালি (আল-

[২৪২] *A History of the Maghrib in the Islamic Period*, (J. Abun-Nasr, ১৯৮৭), p.৫০
Al-Bayan Al-Maghreb (Ibn Idhari al-Marrakushi, ১৩th century), Vol.১, p.১১৮ (Arabic - Dr. Bashar A. Marouf & Mahmoud B. Awad, ২০১৩)

মুওয়াহহিদ রাজবংশ

মরক্কোতে মাহদি বিন তুমার্তের আন্দোলন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এখানে মাহদি বিন তুমার্ত তাওহিদ তথা একত্ববাদের দাওয়াত দেন এবং দুর্নীতি ও ভ্রষ্টতার দমন করেন। কিছু দিনের মধ্যে বার্বার গোত্রসমূহে তার দাওয়াত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে, তার দলবল এমন শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, মুরাবিত সাম্রাজ্যের ভয়ের কারণ হয়। মুরাবিতগণ মাহদি বিন তুমার্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সৈন্যবাহিনী পাঠালেও তারা ব্যর্থ হয়।

এভাবে ১১২১ ইং থেকে ১১২৯ ইং পর্যন্ত মাহদি বিন তুমার্ত ও মুরাবিত রাজবংশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের আগুন জ্বলতে থাকে। ৫২৪ হিজরিতে (১১২৯ ইং) ইমাম মাহদি বিন তুমার্ত ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো প্রায় ৫৫ বছর।

মাহদির মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন আবদুল মুমিন বিন আলি আল-কুমি. তিনি মুরাবিতগণের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান। একপর্যায়ে তিনি মুরাবিত-সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস সাধন করতে সক্ষম হন। আর এর মাধ্যমে মাহদি বিন তুমার্ত যে-কল্পনার সূচনা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয় এবং মুহাদ (আল-মুওয়াহহিদুন) সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী (১১২১-১২৬৯ ইং পর্যন্ত) মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের শাসনামল স্থায়িত্ব লাভ করে।

মরক্কো ভূখণ্ড তার অনুগত হওয়ার পর আবদুল মুমিন বিন আলি আল-কুমি আন্দালুস রক্ষার জন্য সেখানে একদল সৈন্য পাঠান। এরপর তিনি উত্তর-আফ্রিকার সমস্ত ভূখণ্ড স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ৪৫৫ হিজরিতে (১১৫৮ সালে) তিনি নিজ নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে তিউনিসিয়া ও বারকা দখল করেন। পরে তিনি মরক্কোতে ফিরে আসেন এবং এখানেই ৫৫৮ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। আরব-মরক্কোর বিভিন্ন অঞ্চল ও ভূখণ্ড একত্রিতকরণ এবং মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুতকরণে তার ভূমিকা ছিলো অনন্য।

আবদুল মুমিন বিন আলি আল-কুমির ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য পুত্র ইউসুফ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন পিতার অনুসরণে দেশ পরিচালনা করেন। তিনিও পিতার মতো আন্দালুসের ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। আন্দালুসে প্রবেশ করে ইউসুফ এই ভূখণ্ডের পূর্বের অংশ দখল করেন।

৫৮০ হিজরিতে তিনি কর্ডোভার পশ্চিমে 'শান্তারিন' যুদ্ধে আহত হয়ে এর প্রভাবে (আহত হওয়ার ফলে) মারা যান। তার পরে তার পুত্র ইয়াকুব আল-মানসুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইয়াকুব আল-মানসুরের শাসনামলে মরক্কোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়। তার শাসনামলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হলো 'আরক' যুদ্ধ, যেটি ১১৯৫ সনে খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো। এই যুদ্ধে শত্রুসৈন্য ভয়ানকভাবে পরাজয় বরণ করে। ৫৯৫ হিজরিতে আল-মানসুরের শাসনকাল স্থায়ী হয় এবং একই বছরে তিনি ইন্তেকাল করেন। এরপরে তার পুত্র মুহাম্মাদ আন-নাসির পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

মাগরিব-মরক্কোর বিভিন্ন ভূখণ্ডের একত্রিতকরণ, ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডয়ন এবং আন্দালুসে ইসলামের ঐতিহ্য রক্ষাকরণের মাধ্যমে মুওয়াহহিদ-শাসনকাল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। মুওয়াহহিদ-রাজবংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার, স্থাপত্য ও সভ্যতার বিনির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[২৫১]

[২৫১] দ্রষ্টব্য—*দায়েরাতুল মাআরিফিল আলামিয়া* (২য় সংস্করণ), ৪/৩৭১; আবদুর রহমান হাজ্জ, *আল-মাকতু তালিনি ফিল আদাবিল জাযায়িরিল কাদিম আলা আহদিল মুয়াহহিদিন*: ১৮-২১; *সফওয়াতুল মুয়াহহিদিন বাদা মাওকাআতিল ইকাব*: ৪৮

মিশরে তুলুনি সাম্রাজ্য

২৫৪ হিজরি সনে আব্বাসীয় খলিফা 'বায়াকবাক' নামক একজন তুর্কি নেতাকে মিশরের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এ শাসক খিলাফতের রাজধানীতে থেকে যান এবং তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আহমাদ বিন তুলুনকে মিশরে পাঠান

বায়াকবাক ছিলেন আহমাদ বিন তুলুনের মায়ের স্বামী। তার পিতা তুলুনের মৃত্যুকালের পরে বায়াকবাক তার মাকে বিয়ে করেছিলেন। তুলুন ছিলেন একজন তুর্কি গোলাম, যাকে বুখারার শাসকের পক্ষ থেকে খলিফা মামুনকে উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়েছিলো। তুলুন খুব মেধাবী, দক্ষ ও সাহসী ছিলেন। ফলে তিনি খলিফা মামুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। খলিফা তাকে প্রচুর পরিমাণে হাদিয়া-তোহফা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করেন।

পদোন্নতির ধারাবাহিকতায় তিনি খলিফার নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানের পদ অলংকৃত করেন। আহমাদ নিজের পিতা তুলুনের নিকট বিশেষ যত্নে গড়ে ওঠেন একপর্যায়ে আহমাদ বায়াকবাকের পক্ষ থেকে মিশরের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিযুক্ত হন দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই তিনি মিশরের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে গভীর মনোনিবেশ করেন ফলে তিনি খুব কম সময়ে মিশরবাসীর আস্থা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হন

আহমাদ বিন তুলুন খলিফার নিকট বিপুল পরিমাণে হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন ফলে তিনি খলিফার আস্থাভাজন ও প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। এটা দেখে রাজস্ববিভাগের প্রধান আহমদ বিন মুদব্বির প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তিনি আহমাদ বিন তুলুনকে মিশর থেকে বিতাড়নের অপচেষ্টা শুরু করেন। এরই অংশ হিসেবে খলিফার কাছে তার বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করেন, তার নামে কুৎসা রটান।

কিন্তু খলিফা তার অপবাদে ভ্রুক্ষেপ তো করলেনই না, বরং আহমাদ বিন তুলুনের পরামর্শে বিন মুদব্বিরকে বৃহত্তর শামে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন

আফসারদের জন্য তিনি (জায়গির হিসেবে) দিয়েছিলেন। সেখানে তারা ভবন নির্মাণ করেন স্ব স্ব মালিকানাপ্রাপ্ত ভূমিতে।

ইবনে তুলুন নানামুখী জনগণের চিকিৎসাকল্পে হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন। রৌপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা তৈরির জন্য টাকশাল নির্মাণ করেন। তার আমলে মিশর নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা লাভ করে, কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয় এবং গতিশীলতা অর্জন করে ব্যবসা বাণিজ্য। আহমদ বিন তুলুন ৮৮৪ সালে ৫০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

খামারাওয়াইহ'র ক্ষমতাগ্রহণ

আহমদ বিন তুলুনের ইন্তেকালের পর তার পুত্র খামারাওয়াইহ ২০ বছর বয়সে মিশরের ক্ষমতায় সমাসীন হন। বয়সস্বল্পতার দরুন তার শাসনপরিচালনাবিষয়ক অভিজ্ঞতা ছিলো খুবই কম। বিশেষত সমরক্ষেত্রের সাথে তার পূর্বসম্পর্ক দুর্বল হওয়ার কারণে এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন একেবারেই অপরিপক্ক। ফলে তার শাসনকালের প্রারম্ভে বিভিন্ন যুদ্ধে খলিফার বাহিনীর কাছে তাকে পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়। এমনকি শামের কর্তৃত্বও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি আবার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হন; যুদ্ধবিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। হাতছাড়-হওয়া শহরগুলো পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন; শামও নতুন করে নিজের শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। ফলে তার কেন্দ্রীয় শক্তি সুসংহত হয় এবং ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

পরবর্তীতে খলিফার সাথে তার সন্ধির সূত্রপাত ঘটে এবং খলিফার কন্যা 'কতরুন নাদা'র সাথে তার বিবাহবন্ধন ঘটে। এর মাধ্যমে তিনি খলিফার প্রিয়পাত্রে পরিণত হন।

নিকাহে তিনি খলিফা-তনয়াকে বিপুল পরিমাণে অতীব মূল্যবান স্বর্ণ, রৌপ্য ও অলঙ্কার উপঢৌকন প্রদান করেন, যা তার পিতা নিজের পুত্রের জন্য সঞ্চিত ও সংরক্ষণ করেছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানেও প্রচুর অর্থসম্পদ ব্যয় করেন।[২৫৪]

খামারাওয়াইহ ছিলেন খুবই উদারপ্রাণ, হাতখোলা এবং অধিক ব্যয়ে অভ্যস্ত; এমনকি অপচয়েও নিঃসঙ্কোচ ছিলেন তিনি। ফলে নির্বিচারে অর্থ তসরুফ করতে

[২৫৪] দ্রষ্টব্য—*আন-নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা*: ৩/৬৬; মাহমুদ মুহাম্মাদ আল হাওয়াইরি, *মিসর ফিল উসূরিল উসতা*: ১১১

রাষ্ট্রীয় কোষাগার আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তিনি সবচেয়ে [illegible] ছিল বাঘ-সিংহ ইত্যাদি বন্যপশু সংগ্রহ ও এ-সব নিয়ে খেলা করা। ছিলো তার প্রিয় শখের বিষয়। জীবনসায়াহ্নে অস্থিরতা ও নিদ্রাহীনতার রোগে আক্রান্ত হন।

একজন চিকিৎসক তাকে পরামর্শ দিলেন, একটি পুকুর খনন করে, পারদ দ্বারা তা ভরে দিয়ে এর ওপর তার শয়নের খাটটি স্থাপন করতে। এখানে পুকুরের ওপর রাখা শয়নের খাটে মৃত্যু অবধি তিনি বিশ্রামকর্ম সম্পাদন করতেন। তার ইন্তেকালের পূর্বে স্বীয় পুত্র আবুল আসাকিরকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।[২২৫]

তুলুনি রাজবংশের শাসনাবসান

আবুল আসাকির বিন খুমারাওয়াইহ দায়িত্বশীল পর্যায়ে ছিলেন না—অর্থাৎ তিনি রাজ্যের শাসনভার যথাযথভাবে বহন করতে পারেননি। ফলে তার শাসনামলে দেশের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে ওঠে এবং রাজ্য জুড়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টি হয়। আবুল আসাকির কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদের অপচয়, বিলাসিতা ও আনন্দ-বিনোদনে নিমজ্জন রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য করে দেয়। এতে রাষ্ট্রের অবস্থা একেবারে নিচে পড়ে যায়। এর ফলস্বরূপ তুলুনি সাম্রাজ্য বৃহত্তর শাম এবং পার্শ্ববর্তী কিছু ভূখণ্ডে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে।

পরিশেষে আবুল আসাকিরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয় এবং এরই মাধ্যমে মিশরে তুলুনি রাজবংশের প্রায় ৪০ বছরের (২৫৪-২৯৩ হি./৮৬৮-৯০৫ ইং পর্যন্ত) শাসনকালের অবসান ঘটে। এরপরে হারানো মিশর ফিরে আসে আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে।

আগলাবি সাম্রাজ্য

ইতঃপূর্বে আমরা আরব কমান্ডার ও সেনাপতি ইবরাহিম ইবনুল আগলাবের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। ইনি সেই আরব কমান্ডার, যাকে খলিফা হারুনুর রশিদ ১৮৪ হিজরির (৮০০ ইং) সনে উত্তর-আফ্রিকার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা জোরদার করতে প্রেরণ করেছিলেন। খলিফা তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করা ও রাজ্য পরিচালনার

[২২৫] দ্রষ্টব্য—ইবনুল আসির, *আল কামিল*: ৬/৩২৮; মাহমুদ মুহাম্মাদ আল হাওয়ারি, *মিসর ফিল উসুরিল উসতা*: ১১০-১১৫; ইবরাহিম আইয়ুব, *আত-তারিখুল আব্বাসি আস-সিয়াসি*: ১৭৯; হামদি আবদুল মুনইম মুহাম্মাদ হুসাইন, *মুহাযারাত ফি তারিখি মিসরিল ইসলামিয়া*: ৬৭-৬৮

তার মতো নিরাপত্তা জোরদারকরণ, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকে শক্তিশালীকরণ এবং কৃষিসম্পদ ও বাণিজ্যসম্পদের উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করে।[২৫৯]

সিসিলি বিজয়

যিয়াদাতুল্লাহ বিন ইবরাহিমের[২৬০] রাজত্বকালে কায়রওয়ানের বিচারপতি আসাদ ইবনুল ফুরাতের নেতৃত্বে সিসিলি আক্রমণের জন্য একটি অভিযান পাঠানো হয়। অভিযানটি সিসিলি উপদ্বীপে যাত্রাবিরতি করে এবং সেখানে ২১২ সালে নিজেদের অবস্থান শক্ত করে। এভাবেই আগলাবি রাজবংশের বিজয় চলমান থাকে। এরপরে তারা দক্ষিণ ইতালি দখল করে নেয় এবং রোমের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যেতে থাকে। তারা ৮৪২ সালে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত 'বারি' শহর জয় করে এবং ৮৬৯ সালে মাল্টা উপদ্বীপ দখল করে।

দ্বিতীয় ইবরাহিম সিসিলি থেকে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানটি ৯০১ সালে সিনাই উপদ্বীপ অতিক্রম করে দক্ষিণ-পশ্চিম ইতালির ক্যালাব্রিয়া দখল করে। দ্বিতীয় ইবরাহিম ছিলেন একজন মহান নেতা ও আগলাবি রাজবংশের শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ শাসক। ভূমধ্য সাগরে রোমানদের বিরুদ্ধে তিনি যে-সব অভিযান পরিচালনা করেন, সেগুলোর কেন্দ্র বাছাই করেন। ৪৮৫ হিজরি (১০৯১ ইং) পর্যন্ত সিসিলি উপদ্বীপ মুসলমানদের দখলে ছিলো। এরপরে উপদ্বীপটি নর্মানার দখল করে নেয়।

ইসলামি শাসন চলাকালীন এই বিশাল সিসিলি উপদ্বীপে ব্যাপক স্থাপত্য উন্নয়ন এবং ইসলামি সাংস্কৃতিক উৎপাদন হয়েছে, যা এই উপদ্বীপকে উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে যায় এবং ইউরোপের উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে। এই সময়ে আরবরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দিয়ে ইউরোপ ভরপুর করে দিয়েছিলো। প্রথম রোজার দ্যা গ্রেইট কাউন্ট রোজার বোসো সিসিলি দখল করার পরও সিসিলিতে ইসলামের প্রকৃতি ও ছাপ বিদ্যমান থাকে। প্রথম রোজার মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং আরবি-ভাষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। তার পুত্র দ্বিতীয় রোজারের রাজত্বকালে (১১৩০-১১৫৪ ইং) মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানে বৈজ্ঞানিক আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। এ-বিজ্ঞানীদের

[২৫৯] দ্রষ্টব্য—ইবনু ওয়ারদান, *মুসতানাদু তারিখি মামলাকাতিল আগালিবাহ দিরাসাতুন ওয়া তাহকিকুন ওয়া তালিকুন*: ৫৭

[২৬০] তিনি ৭৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ জুন ৮৩৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৮১৭ ইং থেকে আমৃত্যু আফ্রিকায় আগলাবিদের তৃতীয় রাজা ছিলেন।

[illegible] ভূগোলবিজ্ঞানী আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-ইদরিসি, যিনি [illegible] থেকে চলে এসে সিসিলির রাজধানী পালের্মো শহরে বসবাস শুরু করেন। সেখানে মুসলিম ভূগোলবিদ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-ইদরিসি রাজা দ্বিতীয় রোজারের জন্য রুপার ভূগোল এবং ট্যাবলেট (বা ডিস্ক) আকৃতির একটি বিশ্বমানচিত্র তৈরি করেন। এ ছাড়াও এ-মুসলিম বিজ্ঞানী রাজা দ্বিতীয় রোজারের জন্য নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেন। গ্রন্থটি তাবুলা রোজারিয়ানা (Tabula Rogeriana) বা দ্য বুক অব রোজার (The Book of Roger) নামে সর্বাধিক পরিচিত। বাংলায় আরবি শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়—'দূরবর্তী দেশে আনন্দদায়ক সফরনামা'।[illegible] ভূগোল ও ইতিহাসের জটিল ও সূক্ষ্ম আলোচনায় তিনি ছিলেন অনন্য একজন ব্যক্তিত্ব। এ সব গবেষণামূলক ভূগোল ও ইতিহাসবিষয়ক বই-প্রণয়নে ইদরিসি সিসিলিতে নিজের গভীর উপলব্ধি, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতার তদন্ত ও অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করেন।

আগলাবি রাজবংশের বৈশিষ্ট্য ও অবদান

আগলাবি শাসকেরা যে নিরাপত্তার ছায়া বিস্তার করে, তাতে আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা উন্নত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আগলাবি শাসনকালে দেশবাসীর জীবন সুখ ও আনন্দে ভরে ওঠে। এরা সেই আগলাবি রাজবংশ, যারা কৃষি, ব্যবসা ও শিল্পের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতো; যারা অসংখ্য মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সামুদ্রিক অভিযান ও আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উপকূলগুলোতে অনেকগুলো দুর্গ গড়ে তুলেছে।

'ইফ্রিকিয়া' ভূখণ্ড ব্যাপক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কায়রওয়ান শহরে এমন উন্নয়ন হয়েছে যে, শহরটি উন্নতি ও বসতির ক্ষেত্রে উত্তর-আফ্রিকার শহরগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও বড় শহরে পরিণত হয়েছে। আগলাবিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো কায়রওয়ানের বিশাল জামে মসজিদ, যেটি ৫০ হিজরিতে উকবা বিন নাফে [illegible] নির্মাণ করেছিলেন। তাদের আরেকটি অবদান হলো তিউনিসিয়ার জামে যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয়, যেটি অতীতের কয়েক শতাব্দীকালে ইসলামের ঐতিহ্য

[illegible] এই গ্রন্থটিকে দ্বাদশ শতকের ভূগোল-বিশ্বকোষ হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে প্রায় [illegible] মানচিত্র রয়েছে। এটি প্রণয়ন করা হয় ১১৫৪ সালে। আল-ইদরিসি দ্বিতীয় রোজারের আমন্ত্রণে প্রায় [illegible] বছর মানচিত্রের ভাষ্য ও চিত্র নিয়ে কাজ করেছিলেন।

সংরক্ষণ করেছিলো। আজ অবধি জ্ঞানের জগতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]
অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ছাড়া আগলাবি রাজাগণ শহরে এবং গ্রামে অনেক মাদরাসা ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। তারা কায়রাওয়ানের ৫ কি. মি. এবং ৯ কি. মি. দূরে যথাক্রমে আব্বাসিয়া শহর ও রিকাদাহ শহর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্বশেষ এই 'রিকাদাহ' শহরটি নির্মাণ করেছেন আগলাবি শাসক রাজা দ্বিতীয় ইবরাহিম এবং এই শহরকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন রাজধানী হিসেবে। ফাতিমি সাম্রাজ্যের বিজয় হওয়া পর্যন্ত আগলাবি সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিলো এবং ২৯৬ (৯০৯ ইং) হিজরিতে ফাতিমি সাম্রাজ্যের হাতে আগলাবি সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন হয়।[২৬২]

ইখশিদি সাম্রাজ্য

তুলুনি সাম্রাজ্যের পতনের পর ৩০ বছর (৯০৫-৯৩৫ ইং পর্যন্ত) ধরে মিশর আব্বাসি খিলাফতের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই ৩০ বছরে মিশরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এর কুপ্রভাব পড়ে। অবশেষে ৩২৪ (৯৩৫ ইং) হিজরিতে আব্বাসি খলিফা রাযি বিল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ বিন তুঘ্‌জ আল-ইখশিদ[২৬৩] মিশরের শাসক নিযুক্ত হন।

মুহাম্মাদ বিন তুঘ্‌জ মূলত তুর্কিস্তানের ফারগানা অঞ্চলের একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার বাবা ছিলেন তুলুনি রাজবংশের খুমারুওয়াইহ'র সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, যিনি 'ইখশিদ' নামে পরিচিত হন। নিজের যোগ্যতা ও সুশাসনের জন্য শাসক মুহাম্মাদ বিন তুঘ্‌জ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠেন। তিনি দেশকে সংগঠিত করেন এবং যাবতীয় বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন; ফলে মিশরে ফিরে আসে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা।

[২৬২] দ্রষ্টব্য—*তারিখে তাবারি*: ৮/৩২৩; ইবনু আসির, *আল কামিল*: ৬/১৫৪; *তারিখে ইবনে খালদুন*: ৪/৪১৯; মাহমুদ শাকির, *আত-তারিখুল ইসলামি, আদ-দাওলাতুল আব্বাসিয়া*: ১/১৭২; সাইয়্যেদ আবদুল আযিয সালিম, *তারিখুল মাগরিব ফিল আসরিল ইসলাম*: ২৮৯, ৩৩৪

[২৬৩] তার নাম তুঘ্‌জ ইবনে জুফ। 'ইখশিদি' তার উপাধি, যেটি আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ আর-রাযি বিল্লাহ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মিসরের সুলতান এবং ইখশিদি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৮ ফেব্রুয়ারি ৮৮২ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ২৬ আগস্ট ৯৩৫ ইং থেকে ২৪ জুলাই ৯৪৬ ইং পর্যন্ত তিনি শাসক ছিলেন। ২৫ জুলাই ৯৪৬ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইখশিদ কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিসাধন ও খাল খনন করেন। [illegible] মনোযোগ দেন সামরিক বিষয়ে; তিনি ৪০ হাজার সৈন্যের একটি সেনাবাহিনী [illegible] করেন।

শাম দেশের অন্তর্ভুক্তি

মিশরের পরিস্থিতি শান্ত, সেখানকার শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং শামকে [illegible] শাসনাধীন করার জন্য তার সেনাবাহিনীকে শামের দিকে প্রেরণ করেন, [illegible] তুলুনি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ বিন তুলুনও করেছিলেন।

তখন শাম ছিলো বিন রাইক নামে এক ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন। তিনি [illegible] আল-ইখশিদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং শামের সেনাবাহিনীকে একত্রিত করলেন। কিন্তু যুদ্ধে বিন রাইক পরাজিত হয় এবং আল-ইখশিদ [illegible] যুদ্ধের পরে দুজনের মধ্যে একটি চুক্তি সংঘটিত হয় এবং দুজনই শাম [illegible] করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়; বিন তুঘ্‌জ নেন শামের দক্ষিণ অংশ [illegible] নেন উত্তর অংশ। শাম বিভক্ত ও দ্বিখণ্ডিত হয়েই থাকে। বিন রাইকের [illegible] বিন তুঘ্‌জ আশঙ্কা করেন যে, যদি তিনি এখন কিছু না-করেন, তবে [illegible] এমন কোনো শাসক আসবে, যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। [illegible] দিকে অগ্রসর হন দ্রুত এবং দক্ষিণ অংশ কোনো রক্তপাত ছাড়াই উত্তর-[illegible] সাথে যুক্ত করেন।

হিজাযের অন্তর্ভুক্তি

ইতোমধ্যে ইখশিদ যে-সব অঞ্চল দখল ও জয় করেছেন, তাকে তিনি [illegible] করেননি; বরং হিজাযের গভর্নরদের দুর্বলতার সুযোগও কাজে লাগিয়েছেন। [illegible] হিজায দখল করতে সক্ষমতা রাখে এমন একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী [illegible] প্রেরণ করেন। এর মাধ্যে তিনটি বড় বড় রাজ্য তার করতলে চলে আসে; [illegible] হলো মিশর, শাম এবং হিজায।

আলেপ্পোর আমির সাইফুদ্দাওলাহ আল-হামদানি[২৬৪] ইখশিদের কাছ [illegible] শাম ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু 'কিন্নাসরিন' অঞ্চলে সাইফুদ্দাওলাহ [illegible]

[২৬৪] তার পুরো নাম আবুল হাইজা আবদুল্লাহ ইবনে হামদান ইবনুল হারিস [illegible] তার উপাধি 'সাইফুদ্দাওলাহ' (সাম্রাজ্যের তলোয়ার); এ-উপাধিতে তিনি [illegible] আলেপ্পো রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ২২ জুন ৯১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং [illegible]

...হাঁরা পরাজয় বরণ করে এবং তাদের পিছু নিয়ে ইখশিদের সেনাবাহিনী ঢুকে ... আলেপ্পো শহরে। সাইফুদ্দাওলাহ'র কাছে ইখশিদের উদারতার কথা বর্ণনা। ... তিনি সন্ধি করেন এবং শামের উত্তর অংশ তার জন্য ছেড়ে দেন।

কাফুর আল-ইখশিদির শাসন

মুহাম্মাদ বিন তুগজ আল-ইখশিদের ইন্তেকালের পর তার দুই পুত্র স্থলাভিষিক্ত হন। পুত্রদ্বয় বয়সে ছোট ছিলেন বিধায় তারা কাফুর আল-ইখশিদির পরামর্শে দেশ পরিচালনা করতেন। কাফুর ছিলেন একজন হাবশি (ইথিওপীয়) ক্রীতদাস। ইখশিদ এ ক্রীতদাস ক্রয় করে শিক্ষা-দীক্ষা দেন এবং সভ্য করে তোলেন। ফলে এই ক্রীতদাস বিভিন্ন পদে উন্নতি করে সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন-চীফ (প্রধান সেনাপতি) পদে উন্নীত হন। পরিশেষে তিনি মিশরের সিংহাসন ও রাজপ্রাসাদের অভিভাবক হয়ে উঠেন। এরপরে তাকে 'আল-উসতায আবুল মিস্ক কাফুর আল-ইখশিদি আল-আলি বিল্লাহ'—এই উপাধি প্রদান করা হয়।

কাফুর আল-ইখশিদি উত্তর-সিরিয়ার হামাদানি রাজবংশের সাথে যুদ্ধ করেন এবং হামাদানিদের পরাজয় করেন। এর মাধ্যমে তার শাসনাধীন শামকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। তার শাসনকালে মিশর উন্নত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য গতিশীলতা লাভ করে। তিনি কবি-সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করতেন; সম্মান দিতেন। তার যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি হলেন আবুত তায়্যিব আল-মুতানাব্বি[২৬৫], যিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে কাফুরের গুণকীর্তন করতেন, আবার নিন্দাও করতেন। কাফুরের প্রশংসায় লেখা মুতানাব্বির কিছু শ্লোক এখানে উল্লেখ করা হলো:

> পরিণত বয়স হওয়ার আগেই হলেন তিনি বিজ্ঞ শাসক;
>
> মিশর-অ্যাডেন, ইরাক-রোম আর নুবের ধারক-বাহক।
>
> এ-সব দেশের প্রজাসকল গাছপালা আর চন্দ্র-দিবাকর;
>
> এই রাজার হুকুম মেনে চলতে হতো তাদের জীবনভর।
>
> 'মাহবুব' হওয়ার আগেই আমি চাই না তোমার 'মুহিব' হতে;

---

৯৬৭ সালে সিরিয়ার আলেপ্পোতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন একজন শিয়া।

[২৬৫] মুতানাব্বি ছিলেন একজন প্রথিতযশা কবি; ৯১৫ সালে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রথমে সাইফুদ্দাওলাহ্ এবং পরে কাফুরের তারিফ করতেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী ও উচ্চাভিলাষী লোক।

আমায় ভালোবাসা হলে, তবে চাই তোমায় ভালোবাসতে।

৯৬৮ সালে কাফুরের মৃত্যুর পরে মিশরে ইখশিদি সাম্রাজ্যের [illegible] দুর্বল হতে থাকে। অতঃপর প্রায় ৩৪ বছর রাজত্বের পর ৩৫৮ ([illegible]) সালে ফাতিমিদের হাতে ইখশিদি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।[২৬৬]

[২৬৬] দ্রষ্টব্য—*আন-নুজুমুয যাহিরা*: ৩/২৯২-২৯৩; ড. মাহমুদ আল হুয়াইরি, *[illegible] উসুরিল উসতা*: ১৩১; ড. সাইয়েদা ইসমাইল কাশিফ, *মিসর ফি আসরিল ইখশিদিয়্যিন*: [illegible]

ফাতিমি সাম্রাজ্য

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদের ﷺ কন্যা (চতুর্থ খলিফা আলির রা. সহধর্মিণী) ফাতিমাতুয যাহরা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নামের সাথে সম্পৃক্ত করে ফাতিমি সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়।[illegible] এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্তর-আফ্রিকার অন্যতম শিয়া দাঈ (দ্বীন-প্রচারক) আবু আবদুল্লাহ আশ-শিঈ। ২৮৮ হিজরিতে তিনি উত্তর আফ্রিকায় নিজ মতবাদের প্রচার করেন। এর আগে হজের মওসুমে কুতামা নামক বার্বার গোত্রের একদল লোককে শিয়া মতবাদে আকৃষ্ট করতে তিনি সফল হন। হজের মওসুমের পরে এই লোকগুলোর সাথে তাদের দেশে সফর করেন। তিউনিসিয়ায় তিনি আগলাবি সাম্রাজ্য-বিদ্রোহীদের একত্রিত করেন; এই বিদ্রোহীদের সাথে একীভূত হয় আরব ও বার্বার সম্প্রদায়ের অনেকগুলো দল। এই লোকগুলোর মধ্য থেকে কিছু লোককে বাছাই করে তিনি একটি বাহিনী গঠন করেন, যার মাধ্যমে তিনি আগলাবি[illegible] সাম্রাজ্যের রাজধানী রাক্কাদা শহরে আক্রমণ চালান। ২৯৬ হিজরি মোতাবেক ৯০৯ সালে তিনি রাক্কাদা দখল করেন এবং ইবরাহিম ইবনুল আগলাবের গড়া সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেন। ১৮৩ হিজরিতে (৮০০ সালে) খলিফা হারুনুর রশিদ ইবরাহিম ইবনুল আগলাবকে উত্তর-আফ্রিকার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা জোরদার করতে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। আবু আবদুল্লাহ আগলাবি সাম্রাজ্য[illegible] দখলের পর সাঈদ ইবনুল হাসান নামক একজন শিয়া ইমামকে ডেকে

[illegible] তবে আলেমদের অনেকেই একে ফাতেমি সাম্রাজ্য বলে মেনে নেননি। তারা একে অভিহিত করেছেন উবাইদি সাম্রাজ্য নামে। তাদের মতে উবাইদিদের ফাতেমি হওয়ার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

[illegible] বর্তমান ত্রিপোলি, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া—এই অঞ্চলগুলো জুড়ে বিস্তৃত ছিলো আগলাবি সাম্রাজ্য। ২১৮ সালে সিসিলি উপদ্বীপে নৌ-হামলায় সাফল্যের পর আগলাবি সাম্রাজ্য উপদ্বীপটি দখল করে এবং এখানেই শিকড় গাড়ে। ২৪৮ সালে আগলাবি সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী ইতালি দখলে নেয়; সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে রোমের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে যায়।

[illegible] প্রায় ১০৯ বছর আগলাবি সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিলো।

[illegible] এবং এই শিয়া ইমামকে তিনি নতুন ফাতিমি সাম্রাজ্যের খলিফা বলে ঘোষণা করেন। এই খলিফার উপাধি দেওয়া হয় 'উবাইদুল্লাহ আল-মাহদি'।[২৭০]

সাম্রাজ্যের [illegible]

উবাইদুল্লাহ আল-মাহদি। তিউনিসিয়ার উপকূলীয় শহর মাহদিয়্যাহকে নিজের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের সকল গোত্র তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। [illegible] সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত ও সুদৃঢ় করা আল-মাহদির পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। তিনি মিশর বিজয়ের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু এ-আশা বাস্তবায়ন হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ৯৩৪ সালে আল-মাহদির পুত্র মুহাম্মাদ বিন উবাইদুল্লাহ (আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ) তার স্থলাভিষিক্ত হন।

আল-কায়িমের শাসনকালে ইতালির উপকূলসমূহে যুদ্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। তিনিও তার পিতার মতো মিশর দখল করতে এবং মিশরের শাসক মুহাম্মাদ বিন তুগজকে হত্যা করতে বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ৩৩৪ হিজরি মোতাবেক ৯৪৬ সালে তার মৃত্যু হয়।

এরপরে তার পুত্র আল-মানসুর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন, যার শাসনামল অব্যাহত ছিলো ৭ বছর। এ-সময়ে কয়েকটি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ হলেও তিনি সেগুলো দমন করতে সক্ষম হন। ৩৪১ হিজরিতে মাহদিয়্যাহ শহরে আল-মানসুর[২৭১] ইন্তেকাল করেন।

মিশর বিজয়

আল-মানসুরের ইন্তেকালের পর তার পুত্র আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহ খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন আলেম ও সাহসী খলিফা, যিনি সাম্রাজ্যের শক্তিবর্ধনে ব্যাপক কাজ করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি জাওহার আস-সিকিল্লির নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী গঠন করে মিশর বিজয়ের জন্য পাঠান। অতঃপর সেনাপতি জাওহার বড় ধরনের কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন না-হয়ে

[২৭০] দ্রষ্টব্য—ড. আবদুল ফাত্তাহ আল-গানিমি, *মাউসুআতুল মাগরিবিল আরাবি*: ২/৫৭; ইবনুল আসির, *আল কামিল*: ৫/১১ ও তৎপরবর্তী

[২৭১] তার নাম ইসমাঈল, উপাধি আল-মানসুর বি-নাসরিল্লাহ। তিনি ৯১৩ সালে রাক্কাদা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ মে ৯৪৬ ইং থেকে ১৯ মার্চ ৯৫৩ ইং পর্যন্ত প্রায় ৮ বছর তিনি ফাতেমি সাম্রাজ্যের তৃতীয় খলিফার দায়িত্ব পালন করেন।

আলেকজান্দ্রিয়া দখল করতে সক্ষম হন। পরে তিনি 'ফুসতাত' দখল করতে ইচ্ছুক হন, সেটাও বিজয় করেন। এভাবে ৩৫৮ হিজরিতে তিনি দখল করেন ইখশিদি রাজ্য।

বিজয় অর্জনের পর তিনি মিশরবাসীর মন জয়ের জন্য ইচ্ছা করেন আর সেই দেশের জনগণের মাঝে প্রচুর পরিমাণ শস্য বিতরণ করেন। অতঃপর জাওহার নামের প্রসিদ্ধ সেনাপতি কায়রো প্রতিষ্ঠা করে সেখানে খলিফা আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহর জন্য একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ৩৬১ হিজরিতে একই সাথে তিনি জামিউল আযহারের (আল-আযহার জামে মসজিদ) নির্মাণকাজও সম্পন্ন করেন।[২৭১]

ফাতিমি খলিফার মিশরে গমন

৩৬২ হিজরিতে সেনাপতি জাওহার আস-সিকিল্লি কর্তৃক কায়রো শহর নির্মাণ সম্পন্ন হলে ফাতিমি খলিফা মিশরে স্থানান্তরিত হন এবং কায়রো শহরকে নিজের রাজধানী হিসেবে বেছে নেন। কথিত আছে, তিনি তার পিতা ও পূর্বপুরুষদের দেহাবশেষ এনে নতুন রাজধানী কায়রোতে দাফনের আদেশ দিয়েছিলেন।

খলিফা আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহর মিশরে স্থানান্তরিত হওয়া এবং শাম ও হিজাযকে ফাতিমি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে ফাতিমি সাম্রাজ্যের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বেড়ে যায়; শক্তিশালী হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। এর ফলে সাম্রাজ্যটি খিলাফতে আব্বাসিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দেয়—যে-খিলাফতে আব্বাসিয়া বাগদাদে তুর্কি নেতাদের কর্তৃক খলিফাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো।

ফাতিমি খলিফা আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহর রাজত্বকালে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়, তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ৬০০ জাহাজ দ্বারা নৌ-যুদ্ধবহর গঠন।
- সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী ও কর্মকর্তাদের জন্য ইউনিফর্ম তৈরি করতে 'দারুল কিসওয়াহ' নামে একটি ঘর নির্মাণ।
- কৃষি এলাকা বৃদ্ধি ও সেচ-ব্যবস্থাপনার জন্য বাঁধ ও খাল নির্মাণ।

[২৭১] *আল ফাতহুল আরাবি ফি লিবিয়া*: ৩৬২; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ১৫/১৬৪

- শিল্পের প্রতি উৎসাহিতকরণ—যেটি মিশরের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

আল-মুইয শিয়া মতবাদের বিস্তার ও প্রচার-প্রসারে গুরুত্বারোপ করেন। তার শাসনকালের শেষ দিকে কারমাতিয়ানদের সৈন্যবাহিনী মিশরে হামলা করে এবং কায়রো অবরোধ করে। অতঃপর আল-মুইয রাজধানী রক্ষা করার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি কারমাতিয়ানদের মিত্রের (যিনি বনু তাইয়ের একজন বয়স্ক ব্যক্তি) কাছে মোটা অংকের জাল মুদ্রা নিয়ে যান। ফলে লোকটি অত্যাচারীদের সহায়তা করা বন্ধ করে দেন। এতে তারা (কারমাতিয়ানগণ) কায়রোর অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয় এবং যেখান থেকে এসেছে, সেখানে ফিরে যায়।

সমৃদ্ধির উচ্চতায় ফাতিমি সাম্রাজ্য

আল-আযিয বিল্লাহর শাসনামলে ফাতিমি সাম্রাজ্য প্রধান সারির রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। পিতা আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহর ইন্তেকালের পর পুত্র আল-আযিয বিল্লাহ খিলাফতের মসনদে বসেন। আল-আযিয বিল্লাহর শাসনকাল ছিলো উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের যুগ। তার শাসনকালে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন হয়; বড় বড় প্রাসাদে পূর্ণ হয়ে যায় কায়রো শহর: 'কাসরুল খলিফা', 'কাসরুদ দিয়াফাহ' এবং 'কাসরু মানাযিলিল ইয'—এই বিশাল প্রাসাদগুলোর অন্যতম। আল-আযিয বিল্লাহ 'জামিউল হাকিম' নামে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন; খলিফা আল-হাকিমের দিকে সম্বন্ধ করে এই মসজিদের নামকরণ করা হয়। আল-আযিযের শাসনামলে জামিউল আযহারের ব্যাপক উন্নয়ন হয় এবং এটি ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। খলিফার নিজস্ব ফান্ড থেকে প্রদান করা হতো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য থাকা-খাওয়া এবং ইউনিফর্মের খরচ।

ফাতিমি খলিফা আল-আযিয বিল্লাহ আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে তার উজির ইয়াকুব বিন কিল্লিস (যিনি ইহুদি থেকে মুসলিম হয়েছিলেন) এবং আরেক উজির ঈসা বিন নুসতূরুসের (যিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান) ওপর নির্ভর করতেন; তাদের সহযোগিতা নিতেন। আল-আযিয বিয়ে করেছিলেন তৎকালীন আলেকজান্দ্রিয়ার কপ্টিক অর্থোডক্স চার্চের পোপের এক বোনকে। ৩৮৬ হিজরি মোতাবেক ৯৯৬ সালে কায়রো শহরে আল-আযিয মৃত্যুবরণ করেন।

আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ'র খিলাফত

আল-আযিযের মৃত্যুর পরে তার পুত্র আবুল আলি আল-মানসুর (আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে তিনি কম বয়সী হওয়ায় তার উস্তায (বায়ারজিওয়ান/বীরজাওয়ান) ভারপ্রাপ্ত শাসক হিসেবে কাজ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনা করতেন, তিনি হলেন সেনাপতি বিন আম্মার, যাকে 'আমিনুদ দাওলাহ' (রাষ্ট্রসচিব) উপাধি দেওয়া হয়। কায়রোতে তুর্কি ও মরক্কোর সৈন্যবাহিনীর মাঝে লেগে-থাকা বিবাদের সময় তিনি নিহত হন। বিন আম্মারের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন খলিফার অভিভাবক ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বয়ারজিওয়ান।[২৫৩]

আল-মানসুরের ব্যতিক্রমী কার্যক্রম

ক্ষমতার চাবি যখন আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহর হাতে আসে, তখন তিনি স্বীয় উস্তায বীরজাওয়ানের সাথে শত্রুতা শুরু করেন; একপর্যায়ে তিনি নিজের উস্তাযকে হত্যার আদেশ দেন। কিছু অদ্ভুত ও বিকৃত কার্যক্রম ও হুকুম জারি করার কারণে অল্প সময়ে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। যে-সব কার্যক্রম তাকে অদ্ভুত ও বিকৃত হিসেবে কুখ্যাত করে, সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

- প্রভুত্বের দাবি: মসজিদের মিম্বারে তার নাম উচ্চারণের সাথে সাথে তাকে সিজদার আদেশ জারি করেন তিনি।
- দিনের বেলায় দোকানপাট বন্ধের নির্দেশ প্রদান: তিনি দিনের সময় বাজারের যাবতীয় দোকানপাট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন; তবে রাতে খোলা যাবে। প্রজারা তার এই হুকুম মেনে নেয়; তারা নিজেদের দোকানপাট ও ব্যবসাকেন্দ্র শুধু রাতেই খোলা রাখতো। তারা ভোর পর্যন্ত দোকানপাটে কাজ করতো।
- মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া ও জুতো পরিধান করায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ।
- মধু, তেল, পাটশাক খেতে ও মদ পানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং আঙ্গুর বাগান নির্মূলের নির্দেশ প্রদান করেন তিনি, যাতে লোকজন এর থেকে মদ, শিরা ও কিশমিশ ইত্যাদি আঙ্গুরজাত পানীয় ও দ্রব্য তৈরি না-করে।

---

[২৫৩] দ্রষ্টব্য—*যাইলু তারিখি দিমাশক*: পৃ.৬০; *তারিখুল বাতারিকা*: ২/১০২; *আকবাত ওয়া মুসলিমুন মুনযুল ফাতহিল আরাবি ইলা আম ১৯২২*: ১২৭-১২৮; *তারিখু আবিল মাকারিম*: ১/১২

যখন আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহর কুকর্ম বেড়ে যায় এবং তার নির্যাতন মারাত্মক হয়ে ওঠে, তখন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার জনগণ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। তার সেনাবাহিনী ও পরিবার-পরিজনও তার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তার বোন 'সিত্তুল মুল্ক' ও আল-হাকিমের প্রতি চরম হিংসাত্মক ও বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। 'সিত্তুল মুল্ক' নিজের ভাই আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং দেশ উদ্ধার করতে 'ইবনে দিওয়াস' নামক এক উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু সেনা সদস্য আল-হাকিমের অনুসন্ধানে লেগে থাকে; একপর্যায়ে তারা মিশরের নিকটে মুকাত্তাম পাহাড়ে রাতের বেলায় চলাচলের সময় হত্যা করে। এটা ৪১১ হিজরি মোতাবেক ১০২০ সালের ঘটনা।

আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ নক্ষত্রবিদ্যা অধ্যয়নে খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে একটি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করেন, যেখানে তিনি আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে রাত কাটাতেন। তিনি আলেম ও বিজ্ঞানীদের জন্য 'দারুল হিকমাহ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা-সেমিনার ও শিয়া মতবাদের প্রচার-প্রসারের কাজ আঞ্জাম দেওয়া হতো। আল-মানসুরের (আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ) শাসনকাল ছিলো প্রায় ২৫ বছর; এর মধ্যে সাত বছর তিনি স্বীয় উসতাদ বীরজাওয়ানের তত্ত্বাবধানে কাটান। তাকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তার বয়স ছিলো ৩৭ বছর।

আবুল হাসানের কাঁধে খিলাফত

আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহর নিহত হওয়ার পর তার বোন সিত্তুল মুল্ককে আবুল হাসান আলর কাছে প্রেরণ করা হয়। আবুল হাসান ছিলেন আল-হাকিমের পুত্র। দামেশক থেকে আবুল হাসানকে সিত্তুল মুল্কে তলব করা হয়। আবুল হাসান সিত্তুল মুল্কের কাছে হাজির হলে উজির-নাজির, বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আবুল হাসানের আনুগত্য গ্রহণ করে নেয়। তখন আবুল হাসানকে 'আয-যাহির লি-ইযাযি দ্বীনিল্লাহ' উপাধি দেওয়া হয়; তবে কার্যকরী ক্ষমতা ছিলো সিত্তুল মুল্কের হাতে, যিনি ৪ বছর ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরেছিলেন; এই ৪ বছরে সিত্তুল মুল্ক দেশের শৌর্য-বীর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনেন।

সুন্দর দেশপরিচালনার কারণে জনগণ তাকে ভালোবাসতো এবং সম্মান করতো। ৪১৫ হিজরিতে তার মৃত্যুর পর থেকে ভাতিজা আলি আয-যাহির শাসনভার

ফাতিমি সাম্রাজ্যের পতন

আল-মুসতানসিরের পরে এমন এক যুগ আসে, যে-যুগে বাড়তে থাকে ফাতিমি খলিফাদের দুর্বলতা। এ-সময়ে খলিফারা ক্ষমতার পুনর্গঠন ও উন্নতিসাধনে অক্ষম হয়ে পড়ে। খলিফাগণ রাষ্ট্রীয় কার্যাবালি পরিচালনার ভার তাদের মন্ত্রী-সান্ত্রীদের হাতে সঁপে দেন; পরে এ-সব মন্ত্রী, উজির-নাজিরগণ ফাতিমি শাসনের শেষ পর্যায়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। এই উজিরগণ ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার করে খিলাফতের দাবি করে বসে।

ইতিহাস ফাতিমি খিলাফতের এই প্রতিকূল সময় ও পর্যায়কে 'ক্ষমতাসীন উজিরগণের যুগ' হিসেবে পরিচয় দেয়। ক্ষমতা নিয়ে উজিরদের পারস্পরিক বিতর্ক, বিরোধ ও সংঘাতের ফলে ফাতিমি সাম্রাজ্যের প্রভাব ও কার্যকারিতা সংকুচিত হতে শুরু করে। এতে উত্তর-আফ্রিকা ও সিসিলি উপদ্বীপে সাম্রাজ্যের যে-সব মালিকানাভুক্ত বিষয়সম্পত্তি ছিলো তাও হাতছাড়া হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান বিভক্তি সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়; একপর্যায়ে ফাতিমি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে পতন নেমে আসে।

৪৮৭ হিজরিতে খলিফা আল-মুসতানসিরের মৃত্যুর পর থেকে ফাতিমি সাম্রাজ্যের পতনের শেষ সময় পর্যন্ত ৬ জন খলিফা ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। তারা হলেন:

- আহমাদ আল-মুসতালি বিল্লাহ ইবনুল মুনতাসির (শাসনকাল: ৪৮৭ - ৪৯৫ হিজরি)
- আলি আল-আমের বি-আহকামিল্লাহ ইবনুল মুসতালি (শাসনকাল: ৪৯৫ - ৫২৪ হি.)
- আল-মাইমুন আল-হাফেয লি-দ্বীনিল্লাহ ইবনুল আমির আবুল কাসিম (শাসনকাল: ৫২৪ - ৫৪৪ হি.)
- ইসমাঈল আয-যাফের বি-আমরিল্লাহ ইবনুল মাইমুন (শাসনকাল: ৫৪৪ - ৫৪৯ হি.)
- ঈসা আল-ফায়েয বি-নাসরিল্লাহ বিন ইসমাঈল (৫৪৯ - ৫৫৫ হিজরি)
- আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-'আদেদ লি-দ্বীনিল্লাহ (শাসনকাল: ৫৫৫ - ৫৬৭ হি.)

খলিফা আল-আদেদ লি-দ্বীনিল্লাহর শাসনকালে ক্ষমতা নিয়ে দুই উজিরের এক বিবাদ লেগে যায়। এই বিবাদ আন্দোলনের রূপ নেয়। এই দুই উজির হলেন দিরগাম বিন সিওয়ার' এবং 'শা-ওয়ার বিন মুজিরুদ্দীন আবু শুজা। প্রথমজন অর্থাৎ দিরগাম বিন সিওয়ার আন্দোলনে বিজয়ী হওয়ার জন্য ক্রুসেডারদের (যারা ফিলিস্তিনে ঘাপটি মেরেছিলো) সাহায্য চান। আর দ্বিতীয়জন অর্থাৎ শা-ওয়ার ইবনুল তুর্কির সুলতান নুরুদ্দীন যেনগির সাহায্য পেতে শামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন।

দ্বিতীয়জন শামের শাসক নুরুদ্দীন যেনগির কাছে শা-ওয়ার পৌঁছামাত্রই তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং নুরুদ্দীন যেনগি আসাদুদ্দীন শেরকোহের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী শা-ওয়ারের সাথে পাঠান। এরপরে এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে শা-ওয়ার মিশরে প্রবেশ করেন। এখানে দিরগাম বিন সিওয়ারের সাথে তার সংঘর্ষ হলে দিরগাম পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর শা-ওয়ার নতুনভাবে আবারও উজিরের পদে অভিষিক্ত হন। এটি ছিলো ৫৫৯ হিজরি সালের ঘটনা।

৫৬২ হিজরিতে ক্রুসেডারদের বিশাল সংখ্যক সেনাদল প্রবেশ করে মিশরে। আসাদুদ্দীন শেরকোহ সেনাপ্রধান হয়ে পুনরায় মিশরে ফিরে আসেন। এ-সময় তার সাথে ভাতিজা সালাহুদ্দীন আল-আইয়ুবিও ছিলেন। এরপর তিনি মিশর থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করে শা-ওয়ারকে হত্যা করেন। শা-ওয়ার নুরুদ্দীন যেনগির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে যেনগির ক্রুসেডার শত্রুদের সাথে মৈত্রীবদ্ধ হয়েছিলেন। আসাদুদ্দীনের সমর্থন ও সহযোগিতায় এই মহান বিজয়ের পরে ফাতিমি খলিফা আল-আদেদ তাকে উজিরের পদে নিযুক্ত করে 'আল-মালিক আল-মানসুর' উপাধি প্রদান করেন।

উজিরের দায়িত্ব পাওয়ার ১৩ মাস পরে আসাদুদ্দীন শেরকোহ বিন শাযি ইন্তেকাল করেন। আসাদুদ্দীনের মৃত্যুর পর আল-আদেদ উজিরের দায়িত্ব অর্পণ করেন সালাহুদ্দীন আল-আইয়ুবিকে। খলিফা তাকে 'আল-মালিক আন-নাসির' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৫৬৭ হিজরি সালে ফাতিমি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ খলিফা আল-আদেদ লি-দ্বীনিল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে কোনো প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই সালাহুদ্দীন আইয়ুবি ফাতিমি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। দুই শতাব্দী বেশি সময় ক্ষমতা-বিচ্ছিন্ন থাকার পর মিশরে পুনরায় আব্বাসি খলিফার খুতবা প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবি।

হামদানি সাম্রাজ্য

বনু তাগলিব[২৭৭] নামক এক আরব গোত্রের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হামদান বিন হামদুন মসুল (মাওসিল) নগরী স্বাধীন করেন। এটি হলো আরব-জাতিকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করে তুর্কিরা খিলাফতে আব্বাসিয়ার কর্তৃত্ব দখল করার পরের ঘটনা।

৩১৭ হিজরি মোতাবেক ৯২৯ সালে হামদানিগণ মাওসিলকে নিজেদের আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে বেছে নেন। এখানে সাম্রাজ্যের পতাকাতলে ফুরাত নদী এবং শামের বৃক্ষহীন মরু-অঞ্চলে-থাকা ভ্রাম্যমাণ গোত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হামদানি সাম্রাজ্যের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ দুজন সেনাপতি হলেন আবদুল্লাহ বিন হামদানের দুই পুত্র আল-হাসান এবং আলি; এই সহোদর ইরাকে তুর্কিদের প্রতিরোধ করতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখেন।

আব্বাসি খলিফাকে উদ্ধারের চেষ্টা

হাসান বিন আবদুল্লাহ আল-হামদানি আরবদের দিয়ে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি সৈন্যদলটি নিয়ে তার ভাইয়ের সাথে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হন; উদ্দেশ্য তুর্কিদের শক্তি চূর্ণ করা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে আব্বাসি খলিফা আল-মুত্তাকি বিল্লাহকে উদ্ধার করা। হাসান রাজধানী প্রবেশ করলে খলিফা তাকে সংবর্ধনা দেন এবং তাকে আমিরুল উমারার (চিফ গভর্নর, প্রধান আমির) পদ প্রদান করেন। এই পদটি সাধারণত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়। একই সাথে হাসানের ভাইকেও 'সাইফুদ্দাওলাহ' (রাষ্ট্রের তলোয়ার) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এভাবে হামদানিগণ ৩৩০ হিজরিতে তুর্কিদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা

[২৭৭] বনু তাগলিব ইবনে ওয়ায়েল আরবদের বড় গোত্রগুলোর একটি; এদের উৎপত্তি ইয়েমেন থেকে, সেখান থেকে গোত্রটি হিজায এবং নজদে স্থানান্তরিত হয়ে শাম অতঃপর মেসোপটেমিয়াতে (দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল) অবস্থান নেয়। তাগলিব গোত্র থেকে অনেক কবি, অশ্বরোহী সৈন্য ও বীরদের জন্ম হয়। গোত্রটি ইবনে ওয়ায়েল নামক আরেকটি গোত্রের সাথে 'বাসুস' যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।—লেখক

[illegible] সক্ষম হন। আবার সৈন্যদল বাগদাদে প্রবেশের আগে তুর্কি সেনাপতিরা ক্ষমতার কেন্দ্র নিয়ে বিবাদে জড়িয়েছিলো।

ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে তুর্কিদের অপসারণের বছর পার না-হতেই তুর্কি 'তুযুন' নামক তাদের এক আমিরের নেতৃত্বে আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়। কারণ তুর্কিদের মাঝে তুযুন নামক ব্যক্তিটি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বাগদাদ থেকে হামদানিদের বের করে দিতে সক্ষম হন; ফলে ৩৩১ হিজরিতে তারা মসুল (মাওসিল) ফিরে আসেন।

এ-দিকে তুযুন আব্বাসি খলিফা আল-মুত্তাকি বিল্লাহর দুই চোখ উপড়ে ফেলে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন; আর মুত্তাকি বিল্লাহর স্থানে ৯৪৪ সনে আল-মুসতাকফি বিল্লাহকে খলিফা নিযুক্ত করেন তুযুন।[২৭৮]

হলবকে হামদানিদের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ

৩৩৩ হিজরিতে সাইফুদ্দাওলাহ্ মসুল থেকে উত্তর-শামের হলবে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ক্ষমতা নিজের হাতে আসার এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিশিষ্ট ওই অঞ্চলে ইখশীদিদের ক্ষমতা ধ্বংস করার পর সাইফুদ্দাওলাহ রাজধানী স্থানান্তরের কাজটি করেন। সে-সময় মিশর, শাম এবং হিজায শাসন করতো ইখশিদ রাজবংশ।

সাইফুদ্দাওলাহ ফিরে এসে ইখশিদের ওপর আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি কিন্নাসারিনের গুরুতর ও চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাস্ত হন। যুদ্ধরত উভয় দলের মধ্যে একটি সন্ধির মাধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে; অর্থাৎ এই মর্মে সন্ধি হয় যে, শামের উত্তর-অংশ সাইফুদ্দাওলাহর শাসনাধীনে থাকবে।

বাইজান্টাইনদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ

সাইফুদ্দাওলাহ [২৭৯] ছিলেন একজন সাহসী, গম্ভীর ও উদার শাসক; তিনি তার প্রজাসাধারণ ও সৈন্যবাহিনীকে ভালোবাসতেন। তার সৈন্যবাহিনী জাযিরা এবং উত্তর-শামে বাইজান্টাইনদের কয়েকটি আক্রমণ প্রতিরোধ করে। স্বয়ং সাইফুদ্দাওলাহর নেতৃত্বে তারা বাইজান্টাইনদের পরাজিত করে। এ-দিকে বাইজেন্টাইন-সম্রাট নিকফোর ফুকাস আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করে এবং বাইজেন্টাইন-সাম্রাজ্যের

[২৭৮] দ্রষ্টব্য—হাসান ইবরাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম*: ৩/১২২
[২৭৯] তিনি শিয়া ছিলেন। - ইবনু কাসীর

পার্শ্ববর্তী সীমান্ত ও প্রধান প্রধান নগরীসমূহ দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু নিকফোর ফুকাসের সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করা হয়। সাইফুদ্দাওলাহ তাদেরকে সে-সব অঞ্চল থেকে বিতাড়ন করেন, যে-অঞ্চলগুলোতে বাইজান্টাইন-সাম্রাজ্যের বাহিনী গোপনে অনুপ্রবেশ করেছিলো। সাইফুদ্দাওলাহ তার সৈন্যদল নিয়ে এগুতে থাকেন; পর্যায়ে তারা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় ঢুকে পড়েন এবং মারআশ শহরসহ কয়েকটি দুর্গ দখল করে নেন।

বাইজেন্টিয়ামদের বিভিন্ন যুদ্ধ ও সংঘাত থেকে মুসলিম অঞ্চলসমূহের প্রতিরক্ষায় হামদানিগণ বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্রাট শানিশাকের শাসনামলে বাইজেন্টাইনরা মুসলমানদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস দখলের চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু হামদানিগণ তাদের প্রতিরোধ করে এবং তারা শাম অতিক্রম করার সময় তাদের সৈন্যদলের পিছনের অংশকে আক্রমণ করে। ফলে হামদানিদের প্রতিরোধ কারণে বাইজেন্টাইন সৈন্যরা প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। এভাবে শাম ও ফিলিস্তিনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে হামদানিগণ বাইজেন্টাইন-সাম্রাজ্যকে পরাজয় করে; এর আগে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের আমলে (১৫ - ১৬ হিজরির সময়) ফিলিস্তিন থেকে বাইজেন্টাইনদের বিতাড়িত করা হয়েছিলো।[১৮০]

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্যের বিকাশ

সাইফুদ্দাওলাহর শাসনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। বাদশাহ হারুনুর রশিদ এবং তার পুত্র আল-মামুনের শাসনামলের মতো সাইফুদ্দাওলাহর হলবের রাজপ্রাসাদেও কবি-সাহিত্যিকদের আসর ও সভা বসতো। তিনি মুক্তহস্তে কবি-সাহিত্যিকদের পুরস্কার ও বকশিশ দিতেন; জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রচার-প্রসারে উৎসাহিত করতেন। তার যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ও কবি-সাহিত্যিক হলেন:

- আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানি (প্রসিদ্ধ কিতাবুল আগানির লেখক)
- মহান কবি আবুত তায়্যিব আল-মুতানাব্বি
- দার্শনিক আল-ফারাবি (দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের লেখক)
- সুপ্রসিদ্ধ খতিব বিন নাবাতাহ

[১৮০] দ্রষ্টব্য—হাসান ইবরাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম:* ৩/১২৮-১২৯

- আবু ফারাস (অসাধারণ কবি এবং সাহসী ঘোড়সওয়ার)

হামদানি সাম্রাজ্যের সমাপ্তি

৩৫৬ হিজরিতে সাইফুদ্দাওলাহ ইন্তেকাল করেন। এরপরে হামদানি সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করে। দুর্বলতা সাম্রাজ্যটিকে পুরোপুরি গ্রাস করে নেয়। একপর্যায়ে আবুল মাআলি শরীফের শাসনামলে অর্থাৎ ৩৯৪ হিজরিতে (১০০৩ ইং) এ-সাম্রাজ্যটির বিলুপ্তি ঘটে। এর আগে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন তিনজন শাসক। তারা হলেন:

- সাদুদ্দাওলাহ (যিনি ৩৫৬ হিজরিতে সাইফুদ্দাওলাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ৩৮১ পর্যন্ত শাসক ছিলেন।)
- সাঈদুদ্দাওলাহ (তিনি সাদ আদ-দাওলাহর পরে ৩৯২ পর্যন্ত শাসন করেন।)
- আবুল হাসান আলি (তিনি সাঈদ আদ-দাওলাহর পরে ৩৯৪ পর্যন্ত শাসন করেন।)[২৮১]

গযনভি সাম্রাজ্য

আফগানিস্তানে গযনভি সাম্রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে এবং এর ক্ষমতা ও প্রভাব মা-ওয়ারাউন নাহ্‌র, খুরাসান ও ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ৩৫১ হি. থেকে ৫৮২ হি. (৯৬২ - ১১৮৬ ইং) পর্যন্ত প্রায় ২১৫ বছর গযনভি সাম্রাজ্যের শাসনকাল স্থায়িত্ব লাভ করে। আফগানিস্তানের গাযনাহ নামক একটি শহরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এই ইসলামি সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়। গযনভি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সবুক্তগিন গাযনাহকে (গযনি) নিজ সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন।

সবুক্তগিন ছিলেন সামানিদের পক্ষ থেকে গযনির গভর্নর। সামানিগণ[২৮২] ইতোপূর্বে ট্রান্স-অক্সিয়ানা (মা-ওয়ারাউন্ নাহর) শাসন করেছিলেন খিলাফতে

[২৮১] দ্রষ্টব্য—শাকির মুস্তাফা, *মাউসুআতু দুয়ালিল আলামিল ইসলামি ওয়া রিজালিহা*: ১/৩৫২; ইবনুল আসির, *আল কামিল*: ৭/৪২

[২৮২] সামানিগণ হলেন পারস্যের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশধর; খলিফা আল-মামুন আসাদ ইবনে সামানের পুত্রদেরকে ট্রান্স-অক্সিয়ানার শাসক নিযুক্ত করেন। তাদের ক্ষমতা খুরাসান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সামানিগণ খেলাফতে আব্বাসিয়ার প্রতি আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ওঠে এবং তারা মধ্য-এশিয়ায় ইসলাম প্রচারে অবদান রাখে। প্রায় ২৫ বছর (৮৭৪ - ৯৯৯ ইং) তাদের শাসনকাল স্থায়ী হওয়ার পর তুর্কিস্তান ও গযনভি সাম্রাজ্য সামানিদের ক্ষমতা দখল করে

[illegible] নাম ধারণ করে। এরপর সবুক্তগিনের ক্ষমতা খুরাসান পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। সেখানে তিনি এবং তার পুত্র মাহমুদ বনু বুওয়াইহের উপর বিজয় লাভ করেন। বনু বুওয়াইহ খুরাসান দখল করতে অনেক চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু তারা সবুক্তগিনের হাতে পরাজয় বরণ করে। ৩৬৯ হিজরিতে সবুক্তগিন ভারত অভিমুখে রওনা দিলে সেখানে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসক জয়পালের সাথে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে সবুক্তগিন জয়ী হন। তিনি লুমগান শহরে প্রবেশ করে সেখানকার মন্দিরগুলো ধ্বংস করেন এবং কেল্লার ভিতরের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলে সেখানে ইসলামের প্রতীক ও নিদর্শন স্থাপনের নির্দেশ দেন। ভারত থেকে ফিরে তিনি [illegible] অনুগত করেন।[২৮৫]

৩৮৮ হিজরিতে সবুক্তগিনের ইন্তেকালের পরে তার পুত্র মাহমুদ গযনভি শাসনভার গ্রহণ করেন। ইসলামের পথে ত্যাগ-সাধনা ও সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ আব্বাসি খলিফা আল-কাদের সুলতান মাহমুদ গযনভিকে ইয়ামিনুদ্দাওলাহ (সাম্রাজ্যের ডান হাত) উপাধি প্রদান করেন। ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকেন। একপর্যায়ে পাঞ্জাব অঞ্চল দখলপূর্বক নিজের রাজত্বের সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হন। তিনি মা-ওয়ারাউন নাহরও (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) তার রাজত্বের অধীন করেন। এরপরে তিনি খুরাসানের দিকে রওনা দেন। ৩৮৯ হিজরিতে মারভ শহরে সামানিদের পরাজিত করে তাদের কাছ থেকে খুরাসান দখল করে নেন।

৩৯৩ হিজরিতে সুলতান মাহমুদ গযনভি 'সিজিস্তান' দখলের পর পশ্চিম দিকে তার অভিযান অব্যাহত রাখেন। ৪২০ হিজরিতে 'তাবারিস্তান' প্রবেশ করে রায় শহর থেকে বুওয়াইহিদের বিতাড়িত করেন।

সুলতান মাহমুদ গযনভি ছিলেন একজন সাহসী ও ক্ষমতাবান মুজাহিদ ব্যক্তিত্ব। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। ৪২১ হিজরিতে সুলতান মাহমুদের ইন্তেকাল হলে ক্ষমতার চাবি হাতে নেন তার পুত্র মাসউদ, যিনি ভারত-বিজয়ের কাজ অব্যাহত রাখেন।

লাহোর থেকে শুরু করে গযনভিদের কেন্দ্র রাজধানী পাঞ্জাবসহ পুরো ভারতে [illegible] অভিযান চলতে থাকে। এ-সব অভিযান গযনভিদের রাজত্ব ও ক্ষমতার

সং.—[illegible]

[২৮৫] দ্রষ্টব্য—আল-আলামুল ইসলামি ফিদ দাওলাতিল আব্বাসি: ৩৮৬; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ১৭/৪৮৪

ভিত্তি মজবুতকরণে এবং উত্তর-ভারতের সমগ্র এলাকায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে সহায়ক হয়।[২৮৪]

মাসউদ বিন মাহমুদ গযনভি ভারত-জয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার সুযোগ গ্রহণ করে সেলজুকিরা কয়েকটি হামলা চালায়, যেখানে গযনভি ও সেলজুকি সৈন্যদের মাঝে কয়েকটি সংঘর্ষ ও গোলযোগ হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ও ভয়াবহ ছিল সেই যুদ্ধ, যেটি ৪২৬ হিজরিতে মারভ ও সারাখ্সের মাঝখানে অবস্থিত নিসা নামক অঞ্চলে সংঘটিত হয়।

এখানে সেলজুকিদের ওপর আক্রমণ হলে তারা সন্ধিচুক্তি করে, সে-সন্ধিচুক্তি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এর ৩ বছর পরে উভয় পক্ষের মধ্যে আবার যুদ্ধ লেগে যায়; ৪২৯ হিজরিতে সারাখ্সের নিকটবর্তী এক শহরে সংঘটিত-হওয়া এ-যুদ্ধে সেলজুকিরা গযনভিদের পরাজিত করে নিশাপুরের দিকে এগুতে থাকে। তারা নিশাপুর দখল করতে সক্ষম হলে তাদের নেতা তুঘরিল (তুঘরুল) বেগ সেখানে সুসংহত হন এবং কেন্দ্র স্থাপন করেন।

মাসউদ বিন সুলতান মাহমুদ গযনভি নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব ফিরিয়ে আনতে এবং সেলজুকিদের কাছ থেকে খুরাসানকে পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন; ৪৩১ হিজরিতে দিনদাকানের নিকটবর্তী এক স্থানে তাকে পরাজিত করা হয়। এর মাধ্যমে খুরাসানে গযনভি সাম্রাজ্যের শাসনাবসান ঘটে। মাসউদ নিজের রাজধানী গযনিতে ফিরে এলে এখানেও এক বিরুদ্ধবাদী আন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ-আন্দোলন মাসউদকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তার ভাই মুহাম্মাদকে ক্ষমতাসীন করে। পিতার মৃত্যুর পর থেকেই মুহাম্মাদ ক্ষমতা নিয়ে নিজের ভাই মাসউদের সঙ্গে বিবাদ ও কলহে জড়িত থাকে।

দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত-থাকা অধঃপতন গযনভি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। এর আগেই সাম্রাজ্যটি তুর্কিস্তানের হাতে ট্রান্স-অক্সিয়ানাকে হারায় এবং অবশেষে ঘুরি গোত্রসমূহ এই সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে নতুন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ঘুরি সাম্রাজ্য ভারতের ইসলামি অঞ্চলসমূহের তত্ত্বাবধান করে। সাম্রাজ্যটি এই

---

[২৮৪] দ্রষ্টব্য—*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১৫/৬৪৩; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: [illegible]

অঞ্চলগুলোতে ইসলামের শক্তি ও প্রভাব সুদৃঢ় করে। একপর্যায়ে মঙ্গোলরা এসে এ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনে উঠেপড়ে লাগে।[২৮২] [২৮৩]

বুওয়াইহিয়্যাহ সাম্রাজ্য

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবু শুজা বুওয়াইহ হলেন পারস্যের বনু বুওয়াইহ গোত্রের লোক; গোত্রটি প্রাচীনকালে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত দাইলাম এলাকায় বসবাস করতো। আবু শুজা বাগদাদে খিলাফতে আব্বাসিয়ার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইরানের খলিফা আল-রাজির শাসনকর্তাদের সাথে বিরোধ শুরু করেন। এরপর আবু শুজা শিরাজ অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হন। এখান থেকেই বনু বুওয়াইহর (আবু শুজার পুত্র আলি, হাসান এবং আহমাদ) আন্দোলন অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে-সব অঞ্চলে তারা তাদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত করে।

অতঃপর তারা দক্ষিণ ইরানে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুতকরণে মনোযোগ দেয় এবং শিরাজ নগরীকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করে। নিজেদের ক্ষমতা বিস্তৃত ও প্রসারিত করতে তারা একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীও গঠন করে।[২৮৪]

আব্বাসিয়ার উপর বুওয়াইহিয়্যাদের নিয়ন্ত্রণ

৩৩৪ হিজরিতে আহমাদ বিন শুজা এক বিশাল সৈন্যদলের নেতৃত্বে বাগদাদ অভিমুখে রওনা দেন। তিনি বাগদাদে প্রবেশ করলে আব্বাসি খলিফা আল-মুসতাকফি বিল্লাহ তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং মুইয্যুদ্দাওলাহ উপাধি দেন। তার ভাই আলিকে 'ইমাদুদ্দাওলাহ' এবং হাসানকে 'রুকনুদ্দাওলাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

[২৮২] দ্রষ্টব্য—ইবনুল আসির, আল-কামিল ; আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়া ফুনদু কিয়ামিহা: ২২-২৬; আন-নুজুমুয যাহিরা: ৫/৫০; মাদখাল ইলা তারিখিল হুরুবিস সালিবিয়্যা: ২৯; তারিখুল [illegible]: ৭২৭-৭২৮

[২৮৩] ঘুরিদের পতন হয় সুলতান আলাউদ্দিন খাওয়ারেজম শাহের হাতে ৬১২ হিজরিতে।

[২৮৪] দ্রষ্টব্য— ড. তাক্কুশ, তারিখুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়া: ২২০; মাহমুদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামি: ৬/১৪১; ইয়াকুত হামাবি, মুজামুল বুলদান: ৪/৪৪৬; ইবনুল আসির, আল-কামিল: ৬/২৫৪-২৫৫

আহমাদ বুওয়াইহর বাগদাদে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন এবং খলিফা আল মুসতাকফি বিল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। যদিও এই খলিফা একসময় তাকে এবং তার দুই ভাইকে উচ্চতর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আহমাদ বুওয়াইহ আল মুসতাকফির পরিবর্তে খলিফা আল মুতী লিল্লাহকে (যিনি আহমাদের ক্রীড়নকে পরিণত হন) খলিফা নিযুক্ত করেন। জুমার খুতবায় খলিফার নামের সাথে নিজের নামও যুক্ত করারও নির্দেশ দেন আহমাদ বিন শুজা।

শক্তি ও গর্বের উচ্চ শিখরে বনু বুওয়াইহ

বনু বুওয়াইহই বাগদাদের শাসকমণ্ডলে পরিণত হন। তাদের নেতা আযুদুদ্দাওলাহ (আদুদুদ্দাওলাহ) আমলে ইরাক ইরানে তাদের ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আব্বাসীদের রাজধানীতে যে-মুদ্রা তৈরি করা হতো, তাতে আযুদুদ্দাওলাহ (রাষ্ট্রের সাহায্যকারী) নিজের নাম খোদাই করার হুকুম দেন। তিনি খলিফা আল মুতি লিল্লাহর মেয়ে বিয়ে করেন এবং খলিফাকে নিজের মেয়ে বিয়ে দেন। এই বিয়ের পেছনে আযুদুদ্দাওলাহর একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা লুকায়িত ছিলো, যার ভিত্তি ছিলো পারস্পরিক বিবাহবন্ধনের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে খিলাফতকে বনু বুওয়াইহর কাছে বদলি করা; কিন্তু তার এই স্বপ্ন ও কল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি।

বাগদাদ এবং শিরাজ (যেটি বুওয়াইহ সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে টিকে ছিলো) নগরীতে আযুদুদ্দাওলাহ কয়েকটি বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাগদাদের 'বিমারিস্তানে আদুদি' (আদুদি হাসপাতাল), যেটি হিজরি চতুর্থ মোতাবেক খ্রিস্ট দশম শতাব্দী অধিক প্রসিদ্ধ হাসপাতালগুলোর একটি ছিলো। আযুদুদ্দাওলাহ জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও কবি-সাহিত্যিকদের সম্মান করতেন; নিজের প্রাসাদে তাদের সাথে সেমিনার ও সভার আয়োজন করতেন এবং গবেষণা ও গ্রন্থনায় (লেখালেখিতে) উৎসাহিত করতেন। ৩৭৩ হিজরি মোতাবেক ৯৮৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বুওয়াইহিয়্যাহ সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি

আযুদুদ্দাওলাহর মৃত্যুর পরে প্রায় ৭২ বছর এই সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিলো; সাম্রাজ্যের শাসকগণ ছিলেন ইরানের শিয়া-সম্প্রদায়ের লোক। প্রথম পর্যায়ে সাম্রাজ্যটি ইরান-ইরাকে নিজ কেন্দ্র ও শক্তির প্রতি যত্নবান ছিলো। এই সময়ে আযুদুদ্দাওলাহর দুই পুত্র (শারফুদ্দাওলাহ এবং বাহাউদ্দাওলাহ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেন। এর

মধ্যে অন্যতম হলো: ৯৯০ হিজরিতে বাহাউদ্দাওলাহর উজির শাপুর বিন ইরদিশিরের সহযোগিতায় একটি শিক্ষা একাডেমি ও লাইব্রেরি নির্মাণ। এই লাইব্রেরিতে প্রায় ১০ হাজার গ্রন্থ মজুদ ছিলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সাম্রাজ্যে দুর্বলতা ঢুকে পড়ে এবং শাসকদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ লেগে যায়। শুরুতে অর্থাৎ ৩৮১ হিজরিতে (৯৯১ সালে) বাহাউদ্দাওলাহ আব্বাসি খলিফা আত-তায় লিল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার স্থানে আল-কাদেরকে নিয়োগ করেন। ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আল-কাদেরের শাসনকাল অব্যাহত ছিলো। ক্ষমতার শেষ সময়ে এসে আল-কাদের বুওয়াইহিয়্যাহগণকে নিজের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক করে দেন অর্থাৎ তিনি এই নিয়ম জারি করেন যে, তারা যেন আল-কাদেরকে সম্মানপ্রদর্শন করে। এরপর তিনি খিলাফতের (আব্বাসি খিলাফতের) প্রভাব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনেন।

দুর্বলতা বুওয়াইহিয়্যাহ সাম্রাজ্যকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যে, এই সাম্রাজ্য ৪৪৭ হি. মোতাবেক ১০৫৫ সালে সেলজুক-নেতা তুঘরুল বেগের হাতে এসে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।[২৮৮] [২৮৯]

সেলজুক সাম্রাজ্য

সেলজুকগণ উঘুয তুর্কের গোত্রসমূহের অন্যতম গোত্র। ৩৭৫ (৯৮৫ ইং) হিজরিতে এক অপ্রতিরোধ্য পরিস্থিতিতে সেলজুকরা তুর্কিস্তানের কিরগিযের বাসস্থান ত্যাগ করে সেলজুক বিন দাকাকের নেতৃত্বে ট্রান্স-অক্সিয়ানায় শরণার্থী হন। তারা বুখারায় বসবাস শুরু করেন এবং এখানেই ইসলামধর্ম (সুন্নি মতবাদ) গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে তারা ইসলামের জন্য উদ্যমী ও উৎসাহী হয়ে পড়ে। তারা সামানিদের পক্ষ হয়ে পৌত্তলিক ও তুর্কিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এরা (পৌত্তলিক ও তুর্কিস্তান) সামানি সাম্রাজ্যের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। সামানিদের সহযোগিতায় সেলজুকিদের চেষ্টা ও অংশগ্রহণের মূল্যায়ন করে সামানিরা জাইহুন (আমু দরিয়া) নদীর তীরের

[২৮৮] দ্রষ্টব্য—ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আয়ান*: ৪/৫৪-৫৫; ইবনুল আসির, *আল-কামিল*: ৭/১১০; ইবরাহিম আইয়ুব, *আত-তারিখুল আব্বাসি*: ১৫৫

[২৮৯] বুওয়াইহিরা নানাভাবে শিয়া মতবাদ উসকে দেয়। তাদের উসকানির কারণে বাগদাদে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা হতে থাকে।

কাছাকাছি জান্দ নামক শহরকে সেলজুকিদের আশ্রয়স্থান হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দেন।[২৯০]

নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি ও কেন্দ্র মজবুত হওয়ার পর সেলজুকিরা তাদের প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রতি মনোযোগ দেন। সেলজুক উক্ত শহরে মারা যান এবং চারজন পুত্র রেখে যান। তারা হলেন: ১. বেগ আরসালান, ২. মূসা বেগ, ৩. ইউনুস, ৪. মিকাঈল। তুঘরুল বিন মিকাঈলের হাতে সেলজুকিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং খুরাসানে গযনভিদের বিরুদ্ধে তাদের একটি সাম্রাজ্য গড়ে যায়। ৪২৯ হিজরিতে খুরাসান দখল করে তুঘরু বেগ।

শরয়ি বৈশিষ্ট্য পূরণ করার জন্য আব্বাসি খলিফা কর্তৃক নিজেদের সাম্রাজ্যের স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে তুঘরুল বেগ খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহর কাছে একটি পত্র লিখেন। পত্রে খলিফার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব রক্ষা, ইসলামি শিক্ষার প্রতি অটুট থাকা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার কথা ঘোষণা করা হয়। পত্রে তুঘরুল বেগ সেলজুকিদের সাথে গযনভিদের যুদ্ধ হওয়ার কয়েকটি কারণও বিশ্লেষণ করে বলেন—সুলতান মাহমুদ গযনভি বেগওয়া আরসালান বিন সেলজুককে গ্রেফতারপূর্বক ভারতে নির্বাসিত করে এক কেল্লায় বন্দি করে রাখেন; এই কেল্লাতেই বন্দি অবস্থায় আরসালানের মৃত্যু হয়; মাহমুদের আমলেই তার পুত্র মাসউদ সেলজুকিদের হামলা করে বিজয় লাভ করে—এটা ছিলো খলিফার কাছে পত্রের তুঘরুল বেগের পত্রের সারাংশ। পত্র হাতের পাওয়ার পর আব্বাসি খলিফা উল্লিখিত বিষয়গুলো অবহিত হন এবং বাগদাদে তুঘরুলকে উপস্থিত করার জন্য একজন দূত পাঠান।

সেলজুকিরা তুঘরুল বেগের নেতৃত্বে অভিযান চালাতে থাকে; তারা পশ্চিমাঞ্চল দখল করতে সক্ষম হয়। এরপর তারা ইরানের কেরমান (কিরমান) অভিমুখে রওনা দিয়ে এই অঞ্চলটিও দখল করে। ৪৪২ হিজরিতে তারা ইসফাহানে প্রবেশ করে এবং এখান থেকে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলগুলোতে গিয়ে সেগুলোও দখল করে নেয়। তুঘরুল বেগ তার সৈন্যদের নিয়ে ৪৪৬ হিজরিতে আজারবাইজানের রাজধানী তাবরিযে প্রবেশ করে। তারা রোমের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং মালাজগির্দ অঞ্চল অবরোধ করে এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

---

[২৯০] দ্রষ্টব্য ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুস সালাজিকা*: ১৯; হাসান ইবরাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম*: ৪/৮-১০।

এসব এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত করে এবং বুওয়াইহিয়াহ সাম্রাজ্যের পতন হলে তুঘরুল বেগ ইরাকের দিকে এগিয়ে যান; কোনো প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই ৪৪৭ হিজরিতে তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন। পরে আব্বাসি খলিফা চমৎকার [illegible] ভঙ্গিতে 'আস-সুলতান রুকনুদ্দাওলাহ তুঘরুল বেগ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইরাকে সেলজুকিদের প্রবেশের মাধ্যমে বুওয়াইহিয়াহ সাম্রাজ্যের পতন ও ক্ষমতার অবসান ঘটে। এর আগে সাম্রাজ্যটি আব্বাসি খলিফার নাম ধারণ করে ৩৩৪ হিজরি থেকে ৪৪৭ হিজরি পর্যন্ত ইরাক-ইরান শাসন করেছিলো।

আব্বাসি খলিফা ও সেলজুকিদের মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত হয়; মূলত ৪৪৭ হিজরিতে তুঘরুল বেগের ভাই চাঘরি বেগের কন্যার (আরসালান খাতুন) সাথে খলিফার বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে এ-সম্পর্কের দৃঢ়তা আরও বেড়ে যায়। যে-বছর এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, সে-বছর তুর্কি-সেনাপতি আল-বাসাসিরির নেতৃত্বে একটি আন্দোলন ওঠে। আল-বাসাসিরি মাওসিল (মসুল) দখল করে এই অঞ্চলকে ফাতিমি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করার ঘোষণা দেন। এরপর অতি শীঘ্রই তুঘরুল বেগ আন্দোলনটি দমন করে নিজের ভাই ইবরাহিম ইনালকে মাওসিল আল-জাযিরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। আন্দোলন দমন করে তুঘরুল বেগ বাগদাদ ফিরে এলে খলিফা তাকে স্বাগত জানান এবং 'মালিকুল মাশরিক ওয়াল মাগরিব' (প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শাসক) উপাধি দিয়ে ধন্য করেন।

মাওসিলের পরিস্থিতি শান্ত না-হতেই সেখানে নতুন আরেকটি আন্দোলন গজিয়ে ওঠে, যার নেতৃত্বে ছিলেন ইবরাহিম ইনাল। তিনি মাওসিল ছেড়ে হামাযানে চলে গেলে সেখানে তুর্কি-সেনাদের একটি দল তার প্রতীক্ষায় থাকে এবং তাকে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

সুলতান তুঘরুল বেগ তার ভাইয়ের এ-আন্দোলনের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন। তিনি মনে করেন, এ-আন্দোলন ক্ষমতাসীন সেলজুকি পরিবারের জন্য একটা বিপদ ও ঝুঁকি, যেটা বিভক্তির মাধ্যমে তাদের পতন ঘটাবে অচিরেই। রোগ বেড়ে যাওয়ার আগেই তা প্রতিকারের সিদ্ধান্ত নেন তুঘরুল। দেরি না-করে তিনি একটি সৈন্যদল নিয়ে তার ভাই ইবরাহিমের আন্দোলন দমনের জন্য ছুটে চলেন। তারা 'রায়' শহরের কাছাকাছি যেতেই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়; এতে ইবরাহিমকে হত্যা করা হয় এবং তার বাহিনী পরাজয় বরণ করে।

যে-সময় তুগরুল বেগ নিজের ভাইয়ের আন্দোলন দমনে ব্যস্ত ছিলেন, ঐ সময় বাগদাদে তুগরুলের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আল-বাসাসিরি সেলজুকদের বিশাল সৈন্যবহরসহ একটি সৈন্যদল বাগদাদ দখলের জন্য সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। আল-বাসাসিরি বাগদাদে প্রবেশ করে আব্বাসি খলিফাকে আটক করে এবং ফাতিমি খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহর পক্ষে ভাষণ দেন। এরপর আল-বাসাসিরি দক্ষিণাঞ্চলের দিকে রওনা দিয়ে ওয়াসিত ও বসরা দখল করেন। কিন্তু আল-বাসাসিরি ইরাকের ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হননি; ফলে হামাদান ও রায় অঞ্চল থেকে সুলতানের সৈন্যরা ফিরে এসে তাকে আক্রমণ করে এবং তার সৈন্যদলকে পরাভূত করার পর তাকে হত্যা করে; এর মাধ্যমেই সেলজুকদের ক্ষমতা ও প্রভাব স্থিতিশীল হয় এবং তাদের কর্তৃত্ব শক্তিশালী হয়।

জীবনের শেষ সময়ে এসে সুলতান তুগরুল বেগ খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহর এক কন্যাকে বিয়ে করেন। এ-বিয়ে ছিলো মূলত আব্বাসি পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক মজবুত করা এবং বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তার মর্যাদা উঁচু করার জন্য। ৪৫৫ হিজরি মোতাবেক ১০৬৩ সালে তুগরুল বেগ ইন্তেকাল করেন, যিনি সেলজুকি সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়করণে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন।

আল্প (আল্প) আরসালানের (যিনি সুলতান তুগরুল বেগের স্থলাভিষিক্ত হন)[২৯১] শাসনামলে সেলজুকিদের মুসলিম-সাম্রাজ্য বিশাল ও সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম পর্যায়ে আরসালান মা-ওয়ারাউন নাহর (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) ও খুরাসান অঞ্চলের বিদ্রোহমূলক কয়েকটি আন্দোলন দমন করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে তিনি আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া বিজয় করেন; এ-দেশ দুটিকে বাইজেন্টাইন-সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় সুরক্ষিত দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৯২]

আলেপ্পো এবং হিজায দখল

৪৬২ হিজরিতে (মোতাবেক ১০৬৯ খ্রিস্টাব্দ) আল্প আরসালান ফাতিমি শাসনাধীন শাম দেশে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা শামে গিয়ে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই হলব দখল করলে সেখানকার শাসক আব্বাসি খলিফার আনুগত্য ঘোষণা করে।

[২৯১] তুগরুল বেগের মৃত্যুর সময় তার কোনো পুত্র ছিলো না; ফলে তার ভাতিজা আল্প আরসালান ইবনে চাগরি সেলজুক শাসনভার গ্রহণ করেন। - লেখক

[২৯২] দ্রষ্টব্য আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৯; ড. মুহাম্মাদ সুহাইল তাক্কুশ, তারিখুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়া: ২৪১-২৪২।

এ-সৈন্যদল শামের অন্যান্য অঞ্চলগুলোও দখল করতে সক্ষম হয়। এরপরে তারা বাইতুল মাকদিস অভিমুখে রওনা দিয়ে এই মসজিদে প্রবেশ করে। অন্যদিকে আরেকটি সৈন্যদলকে হিজাযে পাঠানো হলে তারা এই অঞ্চলটি ফাতিমিদের কাছ থেকে দখল করে নেয়।

রোম-সৈন্যদের পরাজয়

আল্প আরসালানের আর্মেনিয়া, জর্জিয়া এবং শাম বিজয় বাইজেন্টাইন-সম্রাটকে (রোমানুস ডিওজিন/চতুর্থ রোমানুস) আতঙ্কিত করে তোলে। চতুর্থ রোমানুস সেলজুকিদের হত্যা করতে একটি বিশাল সৈন্যবহর প্রেরণ করেন। উত্তর-সীমান্তে অবস্থিত মালাযগিরদ নামক একটি শহরে ১০৭১ সালে রোম ও সেলজুকিদের মধ্যে চরম এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে অধিকাংশ বাইজেন্টাইন সেনা ধ্বংস করা হয় এবং সম্রাট রোমানুসকে গ্রেফতার করা হয়। সুলতান আল্প মুসলিম সৈন্যদলের নেতৃত্বে-থাকা আরসালান তার (রোমানুস) সাথে মহানুভবতার আচরণ করেন এবং পঞ্চাশ বছরের একটি চুক্তি করে রোমানুসকে মুক্তি দেন। চুক্তিতে রোমানুস বার্ষিক জিযয়া প্রদান এবং সমস্ত মুসলমান বন্দিদের মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দেন। মালাযদিগার যুদ্ধের বিশাল বিজয়ের ফল হলো মুসলমানদের ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং আনাতুলিয়ার (এশিয়া মাইনর) বিভিন্ন অংশ মুসলমান-রাজ্যের সাথে যুক্তকরণ। আনাতুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরবর্তীতে বাইজেন্টাইন-সাম্রাজ্যের বিনাশ সাধনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের ঘাঁটি হিসেবে পরিণত হয়। অন্যদিকে এশিয়া মাইনরে (আনাতুলিয়ায়) বাইজেন্টাইনদের শক্তি কমে আসার কারণে তাদেরকে ইউরোপের সাহায্য চাইতে হয় এবং ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।)[৯৩]

মালাযদিগর দেড় বছর পরে অর্থাৎ ৪৬৫ হিজরি (১০৭২ ইং) সনে সুলতান আল্প আরসালান ইউসুফ আল-খাওয়ারিযিমি নামক এক বিদ্রোহী লোকের হাতে নিহত হন; তাকে মারভ নামক শহরে দাফন করা হয়।

[৯৩] দ্রষ্টব্য ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুস সালাজিকা:* ৮০; হাসান ইবরাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম:* ৪/২৭।

মালিকশাহর শাসনামল

সুলতান আলপ আরসালানের ইন্তেকালের পর তার পুত্র মালিকশাহ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপর তিনি সেলজুকি সাম্রাজ্যের ক্ষমতার বিস্তৃতকরণ ও ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্র সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে তার পিতার নীতি অনুসরণ করেন। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালনায় তাকে সহযোগিতা করেন তার উজির নিযামুল মুলক (সিয়াসতনামার গ্রন্থকার)। তিনি শাসনকার্য পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

মালিকশাহ বিভিন্ন বিজয় অব্যাহত রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ফাতিমিদের কাছ থেকে দক্ষিণ শামের সমগ্র অঞ্চল দখল করে নিজের ভাই তুতুশ বিন আলপ আরসালানকে এই অঞ্চলগুলোর গভর্নর নিযুক্ত করে। একইভাবে তিনি সুলাইমান বিন কুতুলমিশকে আনাতুলিয়ায় সেলজুকিদের বিজিত অঞ্চলসমূহের শাসক নিযুক্ত করেন। এই সুলাইমান ৪৪৭ হিজরি (১০৮৪ ইং) আন্তাকিয়া শহর বিজয় করে রোমানদের শাসন থেকে এই অঞ্চল দখল করে নিয়েছিলেন। এই সুলাইমান বিন কুতুলমিশই এশিয়া মাইনরে (আনাতুলিয়া) রোমান সেলজুক-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তুর্কি-অভিজাতদের বিদ্রোহীদের কয়েকটি আন্দোলন দমনপূর্বক নিজের সুবিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুতকরণে মালিকশাহ সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি সেলজুকি পরিবারের পুত্রদের মধ্যকার বিরোধও মীমাংসা করতে সক্ষম হন। ১০৯২ সালে তার মৃত্যুর পর সেলজুকিদের মাঝে বিভক্তি ঢুকে পড়ে এবং এই বিভক্তি তাদের সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দেয়। এতে বিশাল সেলজুকি সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। এশিয়া মাইনরে রোমান সেলজুক-রাজ্য; মাওসিল এবং শামে আতাবেকদের রাজ্য (জেনগি রাজবংশ) এই বিভক্তির ফসল।[২৯৪]

---

[২৯৪] ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৩২; ওয়াফিয়াতুল আয়ান: ৪/৩৭১-৩৭৪; হাসান ইবরাহিম হাসান, তারিখুল ইসলাম: ৪, ৩০-৩১।

আইয়ুবি সাম্রাজ্য

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সালাহুদ্দীন

বীর সেনাপতি সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি হিত্তিনের যুদ্ধে বিরাট সংখ্যক ক্রুসেডারদের ধ্বংস করে এবং বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করে ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। এই রক্তক্ষয়ী হিত্তিনের যুদ্ধ হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী শুরুতে দ্বাদশ হিজরিতে (মোতাবেক খ্রিস্টাব্দ দ্বাদশ শতাব্দী) ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়।

সালাহুদ্দীন আজারবাইজানের এক সম্ভ্রান্ত কুর্দি পরিবারের সন্তান। এই পরিবারকে নিজ গ্রাম 'দারিন' থেকে বের করে দিলে পরিবারটি ইরাকে বসবাস শুরু করে। আব্বাসি খলিফা আল-মুসতারশিদ বিল্লাহর আমলে সালাহুদ্দীনের পিতা নাজমুদ্দীন সামাররার উত্তরে দজলা (তিগরিস) নদীর তীরবর্তী তিকরিত শহরের গভর্নর (শাসক) ছিলেন। এখানেই ৫৩২ (১১৩৮ ইং) হিজরিতে সালাহুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন।

সালাহুদ্দীনের জন্মগ্রহণের বছরেই আব্বাসি খলিফা আর-রাশেদ বিল্লাহ ও সুলতান মাসউদ সেলজুকির মধ্যে কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়। খলিফার ইসফাহানে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে। ইসফাহানে পালিয়ে গেলে খুরাসানের এক লোক আর-রাশেদকে হত্যা করে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নাজমুদ্দীন আইউব সপরিবারে তিকরিত ছেড়ে স্বীয় বন্ধু ইমাদুদ্দীন যেনগি'র কাছে চলে যান। নুরুদ্দীন যেনগি মাওসিল ও আলেপ্পোতে যেনগি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এখানে নাজমুদ্দীন নুরুদ্দীনের সান্নিধ্যে কাজ করতে থাকেন। নাজমুদ্দীন এবং তার সহোদর আসাদুদ্দীন শেরকোহ দুজনই সেনাবাহিনীর উচ্চপদে উন্নীত হন।

উৎকৃষ্টতার সাথে বেড়ে ওঠেন সালাহুদ্দীন বিন নাজমুদ্দীন। তিনি গভীরভাবে ফিকহ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধকৌশলেরও প্রশিক্ষণ নেন নাজমুদ্দীন। হলবে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এরপর তিনি বেড়ে ওঠেন বর্তমান

লেবাননের উত্তরাঞ্চলীয় ঐতিহাসিক বালাবাক (বাআলবেক) শহরে। তখন এই শহর ও এখানকার কেল্লার শাসক ছিলেন তার বাবা নাজমুদ্দীন বিন আইয়ুব।

৫৪৯ হিজরিতে নুরুদ্দীন মাহমুদ বিন ইমাদুদ্দীন যেনগি (যানকি) দামেশক জয় করার পর নাজমুদ্দীন পরিবার নিয়ে এখানে বাস করেন। সালাহুদ্দীন নিজ ভাই তুরান শাহর দায়িত্বে থেকে পুলিশ অফিসারের পদ লাভ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি উন্নতি করে শামের শাসক নুরুদ্দীন যেনগির সেনাবাহিনীর উচ্চপদে উন্নীত হন।[২৯৫]

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ভিত্তি শক্তকরণ

সালাহুদ্দীন তার চাচা আসাদুদ্দীন শেরকোহর সাথে বিভিন্ন সামরিক অভিযানে অংশ নেন; মিশরে ক্রুসেডারদের দমন করতে এই অভিযানগুলো প্রেরণ করতেন নুরুদ্দীন যেনগি। এই ক্রুসেডাররা মিশরের গভীরে প্রবেশ করে দেশটিতে সাথে মিশে যেতে শুরু করেছিলো। ওইসব বিজয়াভিষিক্ত অভিযান ও যুদ্ধে সালাহুদ্দীনের প্রতিভা ও শক্তি প্রকাশিত হয়। এই অনন্য-অসাধারণ সেনাপতিই মিশরে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয়-ধারার প্রথম বিজয়ের রেকর্ড গড়েন।

৫৬৪ হিজরিতে কায়রোতে চাচা আসাদুদ্দীনের ইন্তেকালের পরে ফাতিমি খলিফা আল-আদেদ সালাহুদ্দীনকে উজিরের পদ প্রদানপূর্বক 'আল-মালিক আন-নাসির' উপাধিতে ধন্য করেন। জনগণ তাকে ভালোবেসে তার চারপাশে জড়ো হওয়া শুরু করে। পতনোন্মুখ ফাতিমি সাম্রাজ্যের একদল অনুসারী অভ্যন্তরীণ যে-সব ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলো, সালাহুদ্দীন সেগুলো নস্যাৎ করে মিশরে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনেন।

৫৬৭ হিজরিতে ফাতিমি খলিফার ইন্তেকাল হয়। এই খলিফার মাধ্যমে ফাতিমি শাসনের সর্বশেষ পৃষ্ঠা গুটিয়ে যায়; প্রায় ২৬২ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতস-থাকা ফাতিমি সাম্রাজ্যের শুরু হয়েছিলো ৯০৯ হিজরিতে তিউনিসিয়ায় আগলাবি সাম্রাজ্যে ধ্বংস সাধন এবং ৯৬৯ হিজরিতে মিশরে ইখশিদি সাম্রাজ্যকে ক্ষমতাচ্যুতকরণের মধ্য দিয়ে।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবি মিশরে ধারাবাহিক সংস্কারের কাজ শুরু করেন। দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি সৌন্দর্যকরণ ও বিশৃঙ্খলা রোধে উদ্যোগ নেন। জুমার খুতবায়

[২৯৫] দ্রষ্টব্য—জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ওয়াসিল, *মুফরিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব*: ১/৫-৬; *ওয়াফিয়াতুল আয়ান*: ১/১৪১।

আব্বাসি খলিফা আল-মুসতাদির নামে দুআ করার রীতি পরিবর্তন করেন। তিনি ফকিহ আবদুল মালিক বিন দিরবাস আশ-শাফিয়িকে বিচারকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। শাফিয়ি ও মালিকিদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন সালাহুদ্দীন বিন নাজমুদ্দীন বিন আইয়ুব। তেমনিভাবে শত্রুদের আক্রমণ থেকে কায়রোর সুরক্ষার জন্য একটি প্রাচীর ও কেল্লাও নিমার্ণ করেন তিনি। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীরগুলোরও সংস্কার সাধন করেন।

এমনিভাবে মিশরে স্বীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবি। অতঃপর তিনি ক্রুসেডারদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মাশরিকে ইসলামির (পূর্ব ও দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি এলাকা) একত্রীকরণে অগ্রসর হন, যারা শাম এবং ফিলিস্তিনের উপকূলে শক্তভাবে গেড়ে বসেছিলো। ১১৭৪ সালে নুরুদ্দীন যেনগির ইন্তেকালের পর একদল সৈন্য নিয়ে দামেশকের পথে এগিয়ে চলেন সুলতান সালাহুদ্দীন এবং ১১৭৫ সালে দামেশকসহ শামের অনেক রাজ্য দখল করেন। এ-দিকে সালাহুদ্দীনের ভাই তুরান শাহ ইয়েমেন দখল করে নেন।

পরবর্তী ধাপে সালাহুদ্দীন হলব, জাযিরা এবং মসুল (মাওসিল) ইত্যাদি অঞ্চলকে স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই অঞ্চলগুলো নুরুদ্দীন যেনগির পুত্র (যার উপাধি ছিলো 'আল-মালিক আস-সালেহ') এবং তার চাচা ইয্যুদ্দীন মাসউদ (মসুলের গভর্নর) শাসন করে আসছিলেন। এই উদ্যোগের ফলে সালাহুদ্দীন ক্রুসেডারদের মোকাবেলা ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষায় মুসলিম-অঞ্চল ও ভূখণ্ডগুলোকে পুনরায় একত্রিত করতে সক্ষম হন।[২৯৬]

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সালাহুদ্দীনের যুদ্ধসমূহ

মুসলিম এলাকাসমূহ একাট্টা করার পর সালাহুদ্দীন সে-সব অঞ্চল ও শহরগুলোর জন্য যুদ্ধ শুরু করেন, যে-সব অঞ্চল ও শহরে ক্রুসেডারগণ দখলপূর্বক প্রায় ৮৫ বছর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলো। ১০৯৮ সালে তাদের এ-দখলদারিত্ব শুরু হয় আন্তাকিয়া, তারসুস (মেরিন) ও ফুরাতের উরফা শহর দিয়ে। ১০৯৯ সালে বাইতুল মাকদিস এবং ১১০৯ সালে ত্রিপলি ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ দখল করে ক্রুসেডাররা।

[২৯৬] তাকুশ, *তারিখুল আইয়ুবিয়্যিন* অবলম্বনে।

সালাহুদ্দীন মাশরিকে ইসলামির অঞ্চলসমূহ একত্রিত করার আগেই ক্রুসেডাররা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এতে আক্রান্ত-হওয়া খিলাফত আব্বাসিয়া সামরিক অভিযান চালাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এ-দিকে খলিফা মুসতানসিরের মৃত্যুর পর ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিকানা নিয়ে উজিরদের মাঝে সংঘাত-বিশৃঙ্খলা ঢুকে-পড়া ফাতিমি সাম্রাজ্য ওই ভয়াবহ যুদ্ধের মোকাবেলা করতে অপারগ হয়ে পড়ে।

ইউরোপে ক্রুসেড যুদ্ধ ও সামরিক অভিযান সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্র

ইতিহাসের প্রসিদ্ধ হিত্তিনের যুদ্ধে সালাহুদ্দীন বিজয় লাভ করেছিলেন এবং ক্রুসেডার সৈন্যদের চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন করেছিলেনস; এই যুদ্ধের পরে আরও কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মারজ উয়ুনের যুদ্ধ (আইয়ুন বর্তমান লেবাননের একটি শহর)। ৫৭৫ (১১৭৯ ইং) হিজরিতে সংঘটিত-হওয়া এ-যুদ্ধে ফিরিঙ্গি সৈন্যদের পরাজয় হয় এবং তাদের শত শত অশ্বারোহী সৈন্য ও সেনাপতি গ্রেফতার হয়।

একই বছর সুলতান সালাহুদ্দীন সাফেদ (ফিলিস্তিনের সুউচ্চ প্রার্থনাগৃহ আল-জালিলুল আলায় অবস্থিত) শহরের পাশে ফিরিঙ্গিদের নির্মিত 'হিসনুল আহযান'-এ (শোক-দুর্গ) হামলা করেন। তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ দুর্গটি অবরুদ্ধ করে এর ভেতরকার যাবতীয় অস্ত্র-হাতিয়ার দখলপূর্বক ক্রুসেডারদের ৭০০ জন সাধারণ সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যকে বন্দি করেন।

৫৭৮ হিজরিতে দক্ষিণ-পূর্ব জর্ডানের কেরাক দুর্গের গভর্নর প্রিন্স রেজিনাল্ড ডি শ্যাটিলিয়ান হিজায দখলের উদ্দেশ্যে একটি নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এ-খবর জেনে সালাহুদ্দীনের সহোদর ও মিশরের গভর্নর আল-আদেল সাইফুদ্দীন আহমদ দ্রুত ছুটে গিয়ে হুসামুদ্দীন লুলুর নেতৃত্বে একটি নৌবহর পাঠান। ইয়ানবুর উত্তরে লোহিত সাগরে সংঘটিত এক যুদ্ধে ক্রুসেড হামলার সম্মুখীন হন হুসামুদ্দীন।

এই যুদ্ধ ক্রুসেডারদের পরাজয় ঘটায় এবং এতে তাদের কয়েকজন সেনাপতি ও শাসকসহ এক বিরাটসংখ্যক সৈন্য ও নাবিকদল বন্দি হয়। এর মাধ্যমে তিনি (আল-আদেল সাইফুদ্দীন/হুসামুদ্দীন) রেজিনাল্ডের উদ্যোগ ও ভয়ংকর পরিকল্পনা

নগ্যাৎ করেন। রেজিনাল্ড ছিলেন ক্রুসেডার শাসক ও গভর্নরদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক গোঁড়া ও ঝামেলাপ্রিয় লোক। ইনি অনেকবার মুসলিম হাজিদের কয়েকটি কাফেলাকে আক্রমণ করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেন; এর মাধ্যমে রেজিনাল্ড শান্তিপূর্ণ কাফেলাকে বাধা না দেওয়ার যে-শপথ ও মৈত্রীচুক্তি হয়েছিলো, তা ভঙ্গ করেন।

হিত্তিনের যুদ্ধের পরের ৩ বছর বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেগুলোতে শুধু মুসলমানরাই বিজয় লাভ করে। এ-সব বিজয় ছিলো ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বৃহত্তর যুদ্ধের অবতরণিকা।

হিত্তিনের চূড়ান্ত লড়াই

৫৮৩ হিজরি (১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ) সনে একটি সৈন্যদল নিয়ে দামেশক থেকে কেরাক দুর্গ অভিমুখে রওনা দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি। প্রচণ্ড এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এই দুর্গটি দখল করতে সক্ষম হন তিনি। এরপরে তার সৈন্যবাহিনী তাবারিয়্যাহর (টিবেরিয়া/টাইবেরিয়া) দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রায় ৬ দিন এ-শহরটি অবরুদ্ধ করে রাখার পর দখল করতে সক্ষম হয়।

টাইবেরিয়াসের নিকটেই মুসলিম-সেনাবাহিনী ও ক্রুসেড-সৈন্যদের মাঝে ৫৮৩ হিজরির রবিউস সানি মাসে (৩-৪ জুলাই ১১৮৭ ইং) এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্রুসেডারদের পক্ষে এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন জেরুসালেমের শাসক এবং সুর, আক্কা, নাসেরাহ কেরাকের গভর্নরগণ। এতে তাদের পক্ষে ছিলো ২০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ১৩ হাজার সামরিক ব্যাটালিয়ান ও নিরাপত্তা বাহিনী এবং ৭ হাজার সহযোগী সামরিক যোদ্ধা। অপরদিকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবির সৈন্যসংখ্যা ছিলো ১২ হাজার এবং কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

জুমাবার সকালে হিত্তিনের যুদ্ধ শুরু হয় এবং সৈন্যরা এক তীব্র ও প্রচণ্ড সমরে জড়িয়ে পড়ে। এই চূড়ান্ত ও গুরুতর যুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির জয় হয় এবং ফিরিঙ্গিরা চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করে। এতে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জেরুসালেমের শাসক গাই দে লুসিগন, কেরাক দুর্গের গভর্নর রেজিনাল্ড শ্যাটিলন এবং অনেক বড় বড় শাসক ও সেনাপতি। ফিরিঙ্গিদের ১৪ হাজার সাধারণ সৈনিকও বন্দি হয়েছিলো হিত্তিনের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ফিরিঙ্গিদের প্রায় ৯ হাজার যোদ্ধা নিহত হয়। পানির অভাবে এবং শুকনো ঘাস ও খড়কুটোতে

প্রজ্বলিত আগুনে তাদের অনেকেই ধ্বংস হয়ে যায়। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুড়ে মারা হলে তৎক্ষণাৎ তাদের ঘোড়ার খুরের নিচে এবং সেনাছাউনির চারপাশে অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে এবং তাদের ধ্বংস করে দেয়।

মহান সম্রাট সালাহুদ্দীন আইয়ুবি ক্রুসেডারদের গ্রেফতারকৃত লোকগুলোর সাথে উত্তম আচরণ করেন এবং জেরুসালেমের গভর্নর গাই অফ লুসিগনানকে মুক্তি দেন। এর আগে সালাহুদ্দীন লুসিগনানের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তিনি মুসলমানদের শত্রুতা ও যুদ্ধের প্রতি প্ররোচিত করবেন না। অন্যদিকে কেরাক দুর্গের গভর্নর রেজিনাল্ডের (যিনি বারবার চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করাসহ মুসলমানদের কাফেলায় আক্রমণ করেছেন) শিরশ্ছেদ করা হয়। সালাহুদ্দীন নিজের হাতের কাছে পেলে এই বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করার শপথ করেছিলেন। তাকে হত্যা করে তিনি নিজের কসমের সত্যতা প্রমাণ করলেন। একইভাবে সালাহুদ্দীন রেজিনাল্ডের সে-সব অশ্বারোহী সৈন্যদেরও হত্যা করেন, যারা শান্তিপূর্ণ কাফেলার সম্পদ লুণ্ঠন করে কাফেলার লোকদের নির্যাতন করেছিলো।[২৯৭]

বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস সমাপ্তকারী হিত্তিনের যুদ্ধে মহান বিজয় অর্জনের পর নিজ সৈন্যদল নিয়ে সালাহুদ্দীন উত্তর-সাহেলের দিকে রওনা হন। এখানে তারা আক্কা, সিডন, বৈরুত, জাফফা, নাবলুস এবং রামলা অঞ্চল দখল করেন। এরপর শহরের চারদিক থেকে কঠিন এক অবরোধের মাধ্যমে ৫৮৩ হিজরি (অক্টোবর ১১৮৭ ইং) তারিখে তারা বাইতুল মাকদিস বিজয় করেন। উদার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক সালাহুদ্দীন আইয়ুবি পবিত্র শহরে (জেরুসালেম) প্রবেশ করে ফিরিঙ্গি (ক্রুসেডার) বন্দিদের (নারী-পুরুষ-শিশুসহ যাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৭ হাজার) নিরাপত্তাপ্রদানপূর্বক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

সালাহুদ্দীন মসজিদে আকসা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার আদেশ দেন; প্রস্তরখণ্ডগুলো পবিত্র পানি ও গোলাপজল দিয়ে ধৌত করেন। মিহরাবের দিকে মসজিদের মিম্বার স্থাপন করেন এবং এখানে নামায প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এভাবে বাইতুল মাকদিস তথা আল-মাসজিদুল আকসার সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনা হয়। ১০৯৯ ইং হতে প্রায় ৮৮ বছর ক্রুসেডারদের দখলে থাকার পর বাইতুল মাকদিস পরিমণ্ডলে মুয়াযযিনের 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার...'-এর

[২৯৭] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য—ড. রাগেব সিরজানি, *কিসসাতুত তাতার*: ২১০।

আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে। এর মাধ্যমে প্রাচ্যে ফিরিঙ্গি ক্রুসেডারদের রাজত্বের দেয়াল ধসে পড়ে। তাদের দখলে থেকে যায় কেবল সুর, ত্রিপোলি, আন্তাকিয়া, উপকূলবর্তী কিছু দুর্গ এবং এর আশপাশের কয়েকটি ছোট ছোট শহর।[২৯৮]

ইউরোপিয়ান রাজাদের সামরিক হামলা

ল্যাটিন রাজত্বের পতন এবং মুসলমানদের কর্তৃক বাইতুল মাকদিসের পুনরুদ্ধার-কার্য ইউরোপে এক প্রচণ্ড কম্পন ও ঝাঁকুনি সৃষ্টি করে। ফলে প্রাচ্যের যে-অঞ্চলগুলো ফিরিঙ্গিরা হারিয়েছিলো, সে-সব অঞ্চল (বিশেষ করে জেরুসালেম) দখল করার জন্য ইউরোপের শাসকগণ একটি সামরিক অভিযান প্রস্তুত করে। এই অভিযান ছিলো সবচেয়ে বড় ক্রুসেড অভিযান; তাদের তিনজন শাসক এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তারা হলেন: ১. জার্মানির সম্রাট ফ্রেডরিক বারবারোসা। ২. ফ্রান্সের শাসক ফিলিপ অগাস্টাস। ৩. ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড (হার্ট অব লায়ন)।

পথিমধ্যে সম্রাট ফ্রেডরিক বর্তমান তুরস্কের কিলিকিয়া নদীগুলোর অন্যতম এক নদীতে ডুবে যান। ফলে তার সৈন্যদল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের একটি বড় অংশ নিজেদের দেশে ফিরে যায়। শুধু ৫ হাজার সৈন্য শামের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে পৌঁছতে পারে।

ফিরিঙ্গিরা তাদের হারানো শহর জেরুসালেম ও অন্যান্য শহরগুলোর পুনরুদ্ধার ও দখলের জন্য 'আক্কা' শহরকে ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেয়। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস এবং সুর ও জার্মানের শাসকদের সৈন্য দিয়ে গঠিত ফিরিঙ্গিদের সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী স্থলপথ ও জলপথ উভয় দিক থেকে জেরুসালেমে হামলা করে। উপরি ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড রেগুলাসের সৈন্যদল দিয়ে ওই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা হয়।

৫৮৫ থেকে ৫৮৭ হিজরি পর্যন্ত দুই বছর অনুপম সাহসিকতার সাথে সালাহুদ্দীন এই অপ্রতিরোধ্য আক্কা শহর প্রতিরোধ ও রক্ষা করেন। সড়ক পথ ও নৌপথে যদি ফিরিঙ্গিদের কাছে একের পর এক ত্রাণ ও সহায়তা না পৌঁছতো, তবে ওই আক্কা শহরের ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে প্রবেশ করে সেটি দখল করতে তারা সক্ষম হতো না।

[২৯৮] তকীউদ্দীন মাকরিযি, *আসসুলুক লিমা'রিফাতিল মুলুক* ও ইবনে আসির, *আল কামিল ফিত তারিখ*

আক্কা শহরের পতনের পর ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড ও তার সহযোদ্ধা ফ্রান্সের রাজা অগাস্টাসের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। অগাস্টাস নিজের দেশে ফিরে যান; অন্যদিকে রিচার্ড বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারে তার যে-লক্ষ্য ছিলো, সে-লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু রিচার্ড উপকূলে (সাহেল) কয়েকটি সীমিত বিজয় অর্জন করলেও বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হননি।

রামলার সন্ধি

রিচার্ড রেগুলাস (লায়ন'স হার্ট) বুঝতে পারেন যে, যুদ্ধের মাধ্যমে সুলতান সালাহুদ্দীনকে পরাজিত করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই তিনি সালাহুদ্দীনের কাছে পারস্পরিক আলোচনার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড সালাহুদ্দীনের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করেন যে, জেরুসালেম এবং উপকূলীয় শহরগুলোর বিনিময়ে সালাহুদ্দীনের ভাই আল-আদেলের সাথে তিনি (রিচার্ড) নিজের বোন রাজকুমারী জুয়ানাকে বিয়ে দিতে চান। অর্থাৎ জেরুসালেম এবং উপকূলীয় শহরগুলো রিচার্ডের দখলে দিলে তিনি নিজের বোন জুয়ানাকে সালাহুদ্দীনের ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিবেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ুবি এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জেরুসালেমে চলে যান, যেখানে তিনি শহরের সুরক্ষায় কাজ করেছেন।

এ-দিকে রিচার্ড নতুনভাবে ফিরে এসে আবার আলোচনার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠান। উভয়পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ৫৮৮ হিজরিতে রামাল্লা শহরে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। চুক্তিতে ফিরিঙ্গি তীর্থযাত্রীদের বাইতুল মাকদিস পরিদর্শনের অনুমোদন এবং সুর শহর থেকে প্রাচীন জাফ্ফা বন্দরনগরী পর্যন্ত ফিরিঙ্গিদের অধীন থাকার কথা উল্লেখ করা হয়। চুক্তিস্বাক্ষরের পর ব্রিটেনের রাজা রিচার্ড রেগুলাস নিজ দেশে ফিরে আসেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির ইন্তেকাল

বাইতুল মাকদিসের যাবতীয় বিষয় সুশৃঙ্খল করার পর সালাহুদ্দীন দামেশকে ফিরে আসেন এবং ইয্যুদ্দীন জর্ড বেগকে ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং বাহাউদ্দীন বিন ইউসুফ আশ-শাফিয়িকে বিচারকের পদে নিয়োগ দেন। দামেশকে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ৫৮৯ হিজরিতে (১১৯৩ ইং) পঞ্চান্ন বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন; দামেশকের উমাইয়াহ মসজিদের (দামেশক গ্রেট মসজিদ) পাশে তাকে দাফন করা হয়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, মহান নেতা এবং বীর মুজাহিদ, যিনি প্রাচ্যে ইসলামির ঐক্যের পতাকা বহন করেছিলেন।

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা

সালাহুদ্দীনের ইন্তেকালের পরে তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থির ও বিস্তৃত থাকলেও তার শাসনকালের মতো ছিলো না। ৬৪৮ হিজরি পর্যন্ত সময়কালে আইয়ুবি পরিবারের বেশকজন শাসক ধারাবাহিকভাবে এই সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ছিলেন:

১. আল-মালিকুল আদিল সাইফুদ্দীন

তিনি নিজ ভাই সালাহুদ্দীনের মৃত্যুর পর আইয়ুবি পরিবারের টুকরো-টুকরো বিবাদ ও গোলযোগ নিরসন করতে সক্ষম হন। সাইফুদ্দীনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শাম, মিশর ও ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তিনি ফিরিঙ্গি ক্রুসেডারদের ফ্রন্ট প্রতিরোধ এবং সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ৬১৫ হিজরি মোতাবেক ১২১৮ সালে ক্ষমতায় থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করেন সাইফুদ্দীন।

২. আল-মালিকুল কামিল নাসিরুদ্দীন

তিনি স্বীয় পিতা সাইফুদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে জন অভ ব্যারেন এবং হাঙ্গেরির শাসক দ্বিতীয় এন্ড্রুর নেতৃত্বে ১২১৯ সালে মিশরে যে-আক্রমণ হয়, সে-ই ক্রুসেড হামলার প্রতিরোধ করেন। দখলদার বাহিনী দুময়াত দখল করার পর তিনি ব্যারেন এবং তার সহযোদ্ধাকে যুদ্ধ থামাতে এবং মিশর ত্যাগে রাজি করাতে এদের দুজনের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করেন। নাসিরুদ্দীন এ-দুজনকে সহস্রাধিক দিনারসহ কয়েকটি উত্তম শর্ত দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা (ব্যারেন এবং এন্ড্রু) তার -সহজ শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তিনি সেতু ও বাঁধগুলো ভেঙে পানিতে তাদের জমিজমা ডুবিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

অতঃপর ফিরিঙ্গি সৈন্যবাহিনী ও সেনাছাউনিগুলোও ঘেরাও করে তাদেরকে এলাকা খালি করে দিতে বাধ্য করা হয়। দুর্গগুলোকে তাদের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করতে বাধ্য করা হয়, যে-দুর্গগুলো তাদেরকে মানসিকভাবে এবং আর্থিকভাবে কষ্ট দিয়েছিলো। ১২২১ সালে ক্রুসেডাররা সমুদ্রপথে নিজেদের দেশে ফিরে যায়।

১২২৮ সালে জার্মান-সম্রাট ফ্রেডরিকের নেতৃত্বে একটি নতুন সামরিক অভিযানের মুখোমুখি হতে হয় মাশারিকে ইসলামিকে। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিলো মিশর এবং সে-সব এলাকা দখল করা, যেগুলো থেকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবি ক্রুসেডারদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন; বাইতুল মাকদিসও এ-অঞ্চলগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আল-কামিল নাসিরুদ্দীন সম্রাট ফ্রেডরিকের কাছে জেরুসালেম হস্তান্তর করা হবে মর্মে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনত; এতে সমগ্র মুসলিম দেশে ক্ষোভের ঢেউ উথলে উঠে।

৩. আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দীন আইয়ুব

তিনি ক্রুসেডারদের কাছ থেকে বাইতুল মাকদিসকে পুনরুদ্ধার করেন। এর আগে আল-মালিকুল কামিলের শাসনামলে জার্মান-সম্রাট এই মসজিদটি দখল করেছিলেন। মুসলমানদের কর্তৃক বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের খবর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে ফ্রান্সের রাজা নবম লুইস একটি সামরিক অভিযান প্রস্তুত করে মিশর অভিমুখে প্রেরণ করেন। অতঃপর ১২৪৯ সালে লুইস দুময়াত শহর দখলপূর্বক এখান থেকে আল-মানসুরা এসে এই শহরটিও দখল করে নেন।

রাজা লুইসের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আল-মানসুরা দখলের পর আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুব ইন্তেকাল করেন। তার স্ত্রী শাজারাতুদ দুর স্বামীর মৃত্যুর খবর গোপন রাখেন। পরে মিশরে লুকিয়ে-থাকা তার পুত্র তুরান শাহ উপস্থিত হন। তুরান শাহ ক্ষমতা গ্রহণ করেই একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আল-মানসুরা শহরের দিকে রওনা দেন। সেখানে তিনি ক্রুসেডারদের সাথে এক ভয়ানক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে রাজা লুইসের সৈন্যবাহিনীর প্রতিরোধ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে; ফলে তারা সুউচ্চ নীলনদের পানিতে ভেসে-ওঠা ওই অঞ্চল থেকে আর বেরুতে সক্ষম হয়নি। লুইসের অনেক সাধারণ সৈন্য ও সামরিক-অফিসার এই স্ফীত পানিতে ডুবে যায়। এ-দিকে ফ্রান্সের রাজা লুইস গ্রেফতার হন; তাকে আল-মানসুরার দারে লুকমানে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে অনেক অভিজাত লোকও তার সাথে ছিলো। অবশেষে লুইস জিযয়া (ফিদ্য়া) প্রদান করলে তার পক্ষের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের অবসান

৫৬৭ হিজরি মোতাবেক ১১৭১ সালে আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুবের পুত্র তুরান শাহের কাছ থেকে ফ্রান্সের রাজা লুইস ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। আর এর মাধ্যমে

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির প্রতিষ্ঠিত আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতন ও পরিসমাপ্তি ঘটে। ৬৪৮ হিজরিতে প্রিন্স লুইস তুরান শাহকে কায়রোতে হত্যা করেন। মূলত আল-মালিকুস সালিহের স্ত্রী শাজারাতুদ দুরের ঐকমত্যে মামলুক-নেতাদের হাতে তুরান শাহ নিহত হন।

ইসলামের প্রতিরক্ষায় আইয়ুবি সাম্রাজ্য অনেক গৌরবময় কর্মসূচির আঞ্জাম দেয়। ক্রুসেড অভিযানের মোকাবেলাও করতে হয় এ-সাম্রাজ্যকে। বাইতুল মাকদিস এবং সালাহুদ্দীন মাশরিকে ইসলামির নেতৃত্ব দেওয়ার আগে যে-সব অঞ্চল ফিরিঙ্গিরা দখল করেছিলো, সে-সব এলাকাও পুনরুদ্ধার হয় এই আইয়ুবি সাম্রাজ্যের শাসনকালে।

আইয়ুবিদের আমলে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি ও গতিময়তা লাভ করে। এই শাসনামলে মিশর ও বৃহত্তর শামে অনেক মাদরাসা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের যুগে কেবল দক্ষ সাহিত্যিক ও বিজ্ঞ বিচারকও তৈরি হয়।[২৯১]

মামলুক সাম্রাজ্য

তুরান শাহ নিহত হওয়ার পর মিশরে মামলুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। মামলুকগণ ছিলেন মূলত ক্রীতদাস, যাদেরকে আইয়ুবি শাসকগণ ককেশাস ও তুর্কিস্তান থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আইয়ুবিরা তাদেরকে আরবি-ভাষা শিক্ষা দেন; সুসভ্য করে তোলেন এবং যুদ্ধবিদ্যা প্রশিক্ষণ দেন। মামলুকদের মধ্য থেকে এমন কিছু লোক তৈরি হয়, যারা ক্ষমতার চাবিকাঠি হস্তগত করে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ২৫০ বছর মামলুক সাম্রাজ্য ক্ষমতাসীন ছিলো।

মামলুকগণ মিশরে তাদের শাসনকালের শুরুর দিকে শাজারাতুদ দুর-কে নিজেদের সম্রাজ্ঞী নিয়োগ দেয়। শাজারাতুদ দুর ছিলেন মূলত আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুবের প্রাসাদের ক্রীতদাসী। পরে আস-সালিহ তাকে বিয়ে করে। খলিল নামে এক পুত্রসন্তান জন্ম দেন এই ক্রীতদাসী। ইনি সেই নারী, যিনি কয়েকজন মামলুক সৈন্যের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৎপুত্র (তার স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে) তুরান শাহকে হত্যা করেন। তুরান শাহর সাথে তার মতবিরোধ ও বিবাদ থাকায় তিনি তাকে হত্যা করেন।

[২৯১] দ্রষ্টব্য— ড. আবদুল হালিম ওয়াইস, *কিতাবুন দিরাসাতুন লিসুকুতি সালাসিনা দাওলাতিন ইসলামিয়া* অবলম্বনে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি পরিচালনায় নিজেদের রানি শাজারায়ে দুরকে সহযোগিতা করার জন্য মামলুকগণ ইয্যুদ্দীন আইবেক তুর্কমানিকে মনোনীত করে। আইবেক রানিকে বিয়ে করার পর রানি ক্ষমতা ছেড়ে দেন (সম্রাজ্ঞীর পদ ত্যাগ করেন।) আইবেক শাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাকে আল-মুইয্য উপাধি দেওয়া হয়। শাজারাতুদ দুরের পরিণাম ছিলো মামলুকদের হাতে নিহত হওয়া। তার এই নির্মম পরিণতির কারণ নিজের স্বামী আইবেককে হত্যা। অর্থাৎ দুর নিজ স্বামী আইবেককে হত্যা করেন। আইবেক প্রায় ৭ মাস ক্ষমতা পেয়েছিলেন।[৩০০]

মামলুকদের বংশধর

মামলুক বংশ দুই ভাগে বিভক্ত।

১. বাহরিয়্যাহ মামলুক (নাবিক মামলুক বংশ)

আল-মালিক আস-সালিহ বাহরি বংশকে ক্রয় করে তাদেরকে নীলনদের 'রাওদা' দ্বীপে বাস করার সুযোগ দেন। বাহরি রাজবংশের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন: আইবেক, আয-যাহির বাইবার্স, আল-মানসুর কলাউন এবং আল-আশরাফ খলিল। ১২৫০ ইং থেকে ১৩৮২ ইং পর্যন্ত বাহরি রাজবংশের সাম্রাজ্য স্থায়ী ছিলো।

২. বুরজিয়্যাহ মামলুক (বুরজি রাজবংশ/সারকাশিয়ান মামলুক)

সুলতান আল-মানসুর কলাউন বুরজিদেরকে কায়রো ক্যাসল টাওয়ারে (কায়রো প্রাসাদ) বিভিন্নকাজে নিয়োগ দেন। বুরজি রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন আয-যাহির বারকুক এবং শেষ সুলতান ছিলেন কানসুহ আল-ঘুরি। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ তুর্কি উসমানিদের কর্তৃক মিশর দখলের সময় পর্যন্ত বুরজি মামলুকদের সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করে।[৩০১]

ক্রুসেডারদের দুর্গ ও আশ্রয়স্থল নির্মূল

ক্ষমতা গ্রহণের পর মামলুকগণ আইয়ুবি সাম্রাজ্যের সুলতানদের নীতি অনুসরণ করেন, যে-আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিলো ফিরিঙ্গি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

[৩০০] দ্রষ্টব্য *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১৩/১৮০-১৯২; মাকরিযি, *আসসুলুক*: ১/৩২২।
[৩০১] দ্রষ্টব্য ইবরাহিম আলি শাউত, *মিসর ফি আহদি বানাতিল কাহেরা*: ১৬৯; সামির ফারাজ, *দাওলাতুল মামালিক*: ৩২।

৬৫৮ হিজরিতে (১২৬০ ইং) 'সুলতান আয-যাহির বাইবার্স আল-বুনদুকদারি' ক্ষমতা পেয়ে নিজের নেতৃত্বে কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। অবিরাম ধারাবাহিক যুদ্ধের পর ৬৬০ হিজরিতে তিনি ফিরিঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রসিদ্ধ কেরাক দুর্গ ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন; ৬৬৩ হিজরিতে কায়সারিয়া শহরসহ কয়েকটি দুর্গ দখল করেন এবং ৬৬৬ হিজরিতে জাফ্ফা ও 'আশ-শাকিফ' দুর্গ (বেলফোর্ট ক্যাসল) নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেন; একই বছর রমযান মাসে আন্তাকিয়া ও এর দুর্গগুলোও পুনরুদ্ধার করেন বাইবার্স। ৬৬৯ হিজরিতে সাফিতা, আল-মাজদাল (আসকালান) এবং কুর্দিদের কেল্লাও দখল করেন।

৬৭৬ হিজরিতে দামেশকে বাইবার্সের ইন্তেকালের সময় অধিকাংশ শহর ও দুর্গের পতন হয়েছিলো; আক্কা, ত্রিপোলি, সাহেল ও হামার কয়েকটি কেল্লা ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ শহর ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো না।

বাইবার্স ছিলেন একজন সাহসী ব্যক্তি, মহান সেনাপতি, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার গুণে গুণান্বিত শাসক। কল্যাণমূলক কাজের জন্য তার ভালোবাসা ছিলো উল্লেখযোগ্য। তিনি বন্দরসমূহ সংস্কার এবং খালগুলো খনন করেন। শাম ও মিশরে কয়েকটি মসজিদ ও মাদরাসাও নির্মাণ করেন তিনি। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি গাজা শহরে তাতার মঙ্গোলদের ওপর বিজয় লাভ করে সুলতান মুযাফ্ফার কুতুযকে আইনে জালুতের যুদ্ধে প্রেরণ করেন; সেখানে তিনি মঙ্গোলদেরকে চরমভাবে পরাজিত করেন। (মঙ্গোলদের যুদ্ধ সম্পর্কে পরবর্তীতে আমরা সবিস্তার আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ)

রুকনুদ্দীন বাইবার্সের নমুনায় সুলতান আল-মানসুর কলাউন (যিনি ৬৭৮ হিজরিতে ক্ষমতাসীন হন) সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ৬৮৪ হিজরিতে তিনি সিরিয়ার বেনিয়াসের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত 'আল-মারকাব' দুর্গ দখল করেন। এরপরে ৬৮৮ হিজরিতে প্রায় ১ মাস অবরুদ্ধ থাকার পর ত্রিপোলি শহরের পতন হয়।

১১০৯ সালে ক্রুসেডারদের দখল করা ত্রিপোলি শহরের পতনের পর তাদের নিয়ন্ত্রণে সুরক্ষিত ও আক্কা শহর ছাড়া আর কোনো অঞ্চল বা দুর্গ ছিলো না। ৬৮৯ হিজরিতে আল-মানসুর কলাউনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সুলতান আল-আশরাফ খলিল ক্ষমতা গ্রহণ করে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। অবরোধের যাবতীয় রসদপত্র সরবরাহ করে তিনি এই সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করেন আক্কা শহরে। তার

সেনাবাহিনী আক্কা অবরোধ করলে সেই শহরেরও পতন হয়। এটা ছিল ৬৯০ হিজরির (১১৯১ খ্রিস্টাব্দ) ঘটনা।

এভাবে দুর্গসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে পড়লে মুসলমানরা সবগুলো শহর পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। শহরগুলো ফিরিঙ্গি ক্রুসেডারদের বাকি অংশ থেকে পবিত্র হয় এবং মাশরিকে ইসলামিতে তাদের উপস্থিতির শেষ পৃষ্ঠাটিও গুটিয়ে ফেলা হয়।[৩০২]

মামলুক শাসনামলে ইসলামি ভূখণ্ড

এক সিরিজ যুদ্ধ-সংগ্রামের পর ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে-থাকা অঞ্চলসমূহ স্বাধীন করতে মামলুকগণ সফলকাম হয়; এ-সব যুদ্ধে মামলুকরা ফিরিঙ্গিদের ওপর বিজয় অর্জন করে এবং তাদেরকে মাশরিকে ইসলামির অঞ্চলসমূহ থেকে বিতাড়িত করে। তেমনিভাবে তারা (মামলুক) ভয়াবহ মঙ্গোল যুদ্ধের মোকাবেলা করে। এই গুরুতর যুদ্ধ ইরাক, ইরান ও বৃহত্তর শামকে বিধ্বস্ত করে দেয়। মামলুক মঙ্গোলদেরকে বিসানের নিকটবর্তী আইনে জালুতের যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত ও শাম থেকে বিতাড়িত করে।

মামলুকদের শাসনামলে মিশরীয় শহরগুলোর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং এর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায়। মামলুক সুলতানগণ কৃষি-শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্যশিল্পে বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। তারা কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরে অনেকগুলো ভবন ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন; সুপ্রতিষ্ঠিত করেন অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও হাসপাতাল। আমরা এখানে বিশেষ করে আল-মানসুর হাসপাতালের কথা উল্লেখ করছি। এই হাসপাতালে রোগের চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশেষ ওয়ার্ড ছাড়াও একটি মেডিসিন স্কুলও প্রতিষ্ঠাও করা হয়, যে-স্কুলের জন্য সে-যুগের প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের শিক্ষক হিসেবে নিয়ে আসা হতো।

মামলুকদের অনেক গৌরবময় কাজের পাশাপাশি সুলতান বাইবার্স আব্বাসি খিলাফত পুনর্জীবিতকরণের চেষ্টা করেন। এ-লক্ষ্যে তিনি আবুল কাসেম নামক আব্বাসি পরিবারের এক পুত্রসন্তানকে (যিনি হালাকু খানের হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন) মিশরে ডেকে পাঠান। আবুল কাসেম মিশরে উপস্থিত হলে লোকেরা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে এবং 'আল-মুসতানসির' উপাধিতে ভূষিত করা

[৩০২] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য— আল মাকরিযি, *আসসুলূক*: ১/৪৩৬; ইবনু ইয়াস, *বাদাইউয যুহূর*: ১/৯৭-৯৮; *আননুজুমুয যাহেরা*: ৭/৮৪, ২৬৭; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ১৩/২৪৪; *তারীখু ইবনিল ফুরাত*: ৭/৩৫।

অতঃপর বাইবার্স এই নবনিযুক্ত খলিফার সাথে একটি সামরিক বাহিনী দিয়ে বাগদাদ পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠান। তিনি (আবুল কাসেম আল-মুসতানসির) আব্বাসীদের রাজধানী বাগদাদে পৌঁছার আগেই মঙ্গোলরা আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করে।

অন্যদিকে ১৩৯০ সালে বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যের (১৫১৭ সালে তুর্কি উসমানি রাজবংশের হাতে বুরজি সাম্রাজ্যের পতন হয়) সুলতানরা বাহরি মামলুক সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত হলে এই সুলতানদের শাসনামলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং মামলুক রাজবংশ বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়। অতিরিক্ত সম্পদের কারণে মামলুক সুলতানগণ বিলাসিতা ও শৌখিনতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। বেশি আয়ের জন্য মামলুকগণ জনগণের ওপর অতিরিক্ত রাজস্ব ও কর আরোপ করে—বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর।

এদের শাসনামলের শেষ পর্যায়ে এসে মিশর ও শামের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে; সাম্রাজ্যটি রাজস্বের বিশাল এক উৎস হারিয়ে ফেলে। প্রাচীন বাণিজ্যপথ নতুন সমুদ্রপথে পরিবর্তন হওয়ায় এই ক্ষতি হয়েছিলো মামলুক সাম্রাজ্যের। ১৪৯৭ সালে উত্তমাশা অন্তরিপের কাছাকাছি এই নতুন সমুদ্রপথটি আবিষ্কার করেন পর্তুগিজ নাবিক ও পর্যটক ভাস্কো দা গামা। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক চলাচল মিশর এবং সিরিয়ার বন্দর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এতে মামলুকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক উৎস হারিয়ে যায় এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ে। এভাবে সাম্রাজ্যে দুর্বলতা ও অবনতি ঢুকে পড়ে; এরই ফলে পতন ঘটে মামলুক সাম্রাজ্যের।[৩০৩]

. তাক্বুশ, তারিখুল মামালিক: ৪৯২; ইবনু ইয়াস, বাদাইউয যুহূর: ৪/২৭০।

ক্রুসেড

দশম অধ্যায়ে আমরা সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবং ক্রুসেডারদের মাঝে সংঘটিত ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ, হিত্তিনের যুদ্ধের (যে-যুদ্ধ ফিরিঙ্গি সৈন্যদের চূড়ান্ত পরাজয় ও ল্যাটিন সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিলো) পর সালাহুদ্দিন কর্তৃক বাইতুল মাকদিস ও উপকূলীয় শহরসমূহ পুনরুদ্ধার হওয়ার ঘটনা আলোচনা করেছি।

ওই সময়ের শেষ পাঁচ বছরে সুর ও জাফফার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উপকূল ত্রিপোলি এবং আন্তাকিয়া শহর এবং কয়েকটি গ্রাম ও কেল্লা ছাড়া আর কোনো অঞ্চল ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো না। আইয়ুবি-সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সুলতান তুরান শাহ নিহত হওয়ার পর মিশরের শাসনক্ষমতার চাবিকাঠি মামলুক শাসনের হস্তগত হয়। এ-শাসনকালের প্রথম পর্যায়ে পালাক্রমে একের পর এক ক্রুসেডারদের পতন হতে থাকে। প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের অবসান ঘটেছিলো ১২৯১ সালে।

যে-সব কারণ ইউরোপকে ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেড অভিযান প্রেরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলো, সে-সব কারণ এবং পূর্ব-পশ্চিমে (প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে) এই যুদ্ধগুলোর ফলাফল ও প্রভাব কী কী, তা নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হলো:

সেলজুকদের গতিরোধে বাইজেন্টাইন

সেলজুকগণ এশিয়া মাইনর (আনাতোলিয়া, তুরস্ক) দখল করে নেওয়ার পর যখন বাইজেন্টাইন-সম্রাট দিওগেন উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তার সাম্রাজ্য হুমকির মুখে পড়েছে, তখন তিনি (বাইজেন্টাইন-সম্রাট) সপ্তম পোপ গ্রেগোরির কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখে পাঠান। পত্রে বাইজেন্টাইন-সম্রাট (দিওগেন) উল্লেখ করেন যে, সেলজুকিরা খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করে এবং ইউরোপ-থেকে-আসা তীর্থযাত্রীদের জন্য জেরুসালেমের নিরাপদ রাস্তা অতিক্রম করাও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বাইজেন্টাইন-সম্রাটের এ-আবেদনে পোপ গ্রেগোরি রোমের সাথে ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চকে পুনরায় যুক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পেলেন।

পোপ মনে করলেন, এই সুযোগে ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চকে রোমের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হবে। ইতোপূর্বে প্রায় ১৯ বছর যাবৎ এই চার্চটি পোপের প্রভাবমুক্ত হয়ে আছে; অর্থাৎ চার্চটির সাথে পোপের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ১৯ বছর ধরে। এটি ১০৫০ সালে কন্সটান্টিনোপলে মিকাইল ক্যারোলিরিয়াসের শাসনামলে হারানো প্রভাব ফিরে পায়।

পোপ গ্রেগোরি সেলজুকিদের গতিরোধ করতে এবং আনাতোলিয়া (এশিয়া মাইনর) থেকে তাদের শক্তি ও ক্ষমতার অপসারণ করতে বাইজেন্টাইনদের সাথে অংশগ্রহণের জন্য ইউরোপ থেকে একটি অভিযান প্রস্তুত করতে মনস্থ করেন। কিন্তু জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ব্যাপারে পার্থিব ক্ষমতার অনুপ্রবেশ-সংক্রান্ত এ-সব বিষয়ে পোপ ও জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরির মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক পোপ গ্রেগোরিয়াসের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এই সময়ে সেলজুকিরা একটি বিশাল সামরিক বাহিনী গঠন করে এবং একটি সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তুর্কিস্তানের 'তুর্ক' গোত্রের 'সালজুক' নামক এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে তাদেরকে 'সেলজুকি' বলা হয়। শুরুতে তারা বুখারায় বসবাস করতো; অতঃপর তারা নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত করতে বুখারার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে যাত্রা করে।

৪২৮ হিজরিতে তুঘরুল বেগ খুরাসান দখলপূর্বক সেখানে সুসংহত হন। এখানে তিনি বনু বুওয়াইহর সাম্রাজ্য দখল করার জন্য তার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করতে শুরু করেন। ৩৩৪ হিজরি (৯৪৫ ইং) থেকেই বনু বুওয়াইহ ইরাক-ইরানে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তৃত করে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে বনু বুওয়াইহ-পরিবারে যে-বিরোধ বিদ্যমান ছিলো, সেটার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন তুঘরুল বেগ। তিনি ইরাক ও ইরানে রওনা করে ৪৪৭ হিজরিতে বাগদাদে প্রবেশ করেন। এভাবে তিনি বুওয়াইহিয়্যাহ সাম্রাজ্য দখল করেন এবং দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে-পড়া আব্বাসি-সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নেন। সেলজুকিরা ক্ষমতায় আরোহণ করলে তাদের সাম্রাজ্য বিকাশ লাভ করে এবং আল্প্ আরসালানের শাসনামলে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

আল্প্ আরসালান সেই সম্রাট, যিনি আলেপ্পো এবং হিজায দখল করেন এবং রোমে প্রবেশ করে বাইজেন্টাইন-সম্রাট রোমানুস দিওগেনকে ১০৭১ সালে আর্মেনিয়ার ম্যালাজদিগর যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত করেন। আল্প্ আরসালান এই সম্রাটের কাছ থেকে এশিয়া মাইনরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিনিয়ে নেন।

ক্রুসেড যুদ্ধের প্রতি আহ্বান

বাইজেন্টাইন সাহায্য চাইতে ফিরে আসে। সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনেনাস পোপ দ্বিতীয় উরবানের কাছে একটি আহ্বান প্রেরণ করেন; এতে তিনি সেলজুকদের (যারা ইতোমধ্যে সৈন্যদল নিয়ে মারমারা সাগরের তীরে পৌঁছে গেছেন) দমন করার জন্য পোপের সাহায্য চান। ইউরোপে এই বলে গুজব ছড়ানো হয় যে, খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীগণ সেলজুকিদের দ্বারা নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে। এই গুজব পোপের কাছে সম্রাটের সাহায্যের আবেদন ও আহ্বানকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এই গুজব শুনে পোপ উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং ১০৯৫ সালের ১৮ নভেম্বর ফ্রান্সের ক্লেরমন্ট-ফেরান্ড শহরে একটি ভাষণ দেন। ভাষণে পোপ দ্বিতীয় উরবান ইউরোপের রাজা ও জনগণকে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ থেকে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি ছিনিয়ে আনার আহ্বান করেন।

এভাবে পোপ দ্বিতীয় উরবান বাইজেন্টাইন-সম্রাটের ডাকে সাড়া দিয়ে ইউরোপের রাজাদেরকে উৎসাহিত করতে থাকেন এবং তাদেরকে এই অঞ্চলে প্রথম ক্রুসেড অভিযান প্রেরণের আহ্বান জানান যে, কন্সটান্টিনোপলের গির্জায় পোপের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ফিরে আসবে। পোপ আশা করেন যে, তার এই আহ্বানের ফলে কন্সটান্টিনোপলের গির্জাকে রোমের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এবং গির্জার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব বেড়ে যাবে।

লক্ষ্য এবং উচ্চাভিলাষ

পোপের আহ্বান বাস্তবায়নের মধ্যে ইউরোপের রাজা, অভিজাত শ্রেণির লোক ও জমিদারগণ এক সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পান। তারা মনে করেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে পোপের এই আহ্বান বাস্তবায়িত হলে তারা প্রাচ্য থেকে মুনাফা এবং প্রচুর সম্পদ হস্তগত করতে পারবেন। তাদের বিশ্বাস, এই ডাকের মাধ্যমে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং একই সময়ে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের কারণে তাদের দেশ যে-অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিলো, সে-সংকট থেকে মুক্তি পাবে।

এ-সব কারণ ও চালিকাশক্তিই মূলত ক্রুসেডারদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এই ক্রুসেডাররা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো ভেনিস, জেনোভা এবং পিসা অঞ্চলের ব্যবসায়ী হিসেবে প্রাচ্যের বাণিজ্যিক আন্দোলনে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য। উল্লেখ্য যে, এই অঞ্চলগুলো ক্রুসেড-সৈন্যদের বহন করার জন্য জাহাজ

...: এই জাহাজগুলো বিভিন্ন বন্দরে জড়ো হতো। অন্য দিকে ধর্মীয় উপাদান, ...র স্লোগান ইউরোপে জনগণের আবেগ ও উৎসাহ উস্কে দিয়েছিলো, সেই ...নকে সুবিধাভোগী ও স্বার্থপরেরা নিজেদের বিভিন্ন পার্থিব উচ্চাভিলায ...বায়নের ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছিলো; অর্থাৎ স্বার্থপরেরা জনগণের ধর্মীয় ...ভূতিকে পুঁজি করে নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করছিলো।

ক্রুসেড অভিযানের ধাপসমূহ

প্রথম ধাপে ৪৯০ হিজরিতে (১০৯৭ ইং) কন্সটান্টিনোপল শহরে ফিরিঙ্গিদের বিশাল সমাগম হয়; এই সমাবেশে উপস্থিতির অধিকাংশই ছিলো ফরাসি (ফিরিঙ্গি/ ফ্রাংক) এবং নর্মদি (নর্মান)। পরে এই 'ফিরিঙ্গি' নামটি সমস্ত ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে থাকে। এদের সবাই নিজেদের বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন ধারণ করতো; ফলে তারা 'ক্রুসেডার' হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যায়।

প্রথম ক্রুসেড আক্রমণ

পোপের যুদ্ধ ঘোষণার পর একে একে চারটি বিশাল সেনাবাহিনী বায়তুল মাকদিস জয়ের সংকল্প নিয়ে রওনা হয়। পাদরি পিটারের অধীনে লাখের মতো খ্রিস্টানের এক বিশাল বাহিনী কন্সটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওনা হয়। আরও যে-সব বাহিনী ছিলো, তন্মধ্যে প্রথম বাহিনী ছিলো ফরাসিদের। এই বাহিনীর নেতা ছিলেন গডফ্রে ডিউক চিলবিন। তার সঙ্গে ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। দ্বিতীয় বাহিনী ফ্রান্স বাজফিলিপের ভাই হিউ অপ দরমান্দুর নেতৃত্বে ছিলো। তৃতীয় বাহিনী স্বয়ং রোমে প্রস্তুত হয়েছিলো এবং তাদের নেতা ছিলেন বুহিমন্দ। তিনি ইতালির 'তারানাত' নামক স্থানের সরদার ছিলেন। এই তিন বাহিনীর সমগ্র সৈন্যসংখ্যা ছিলো প্রায় সাত লাখ। এই বিশাল বাহিনী কুসতুনতুনিয়া প্রণালী অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। সুলতান তাদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হন। কারণ, এই সময়ে মুসলিম-জগত অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত ছিলো।

বাগদাদের সিংহাসন নিয়ে সেলজুকি সুলতান মালিক শাহের পুত্রদের এবং দামেশক ও আলেপ্পোর আধিপত্য নিয়ে মালিক শাহের ভ্রাতুস্পুত্র রিজওয়ান ও ...দের মধ্যে বিবাদ চলছিলো। স্পেনের আরবরা পরস্পর গৃহযুদ্ধ ও প্রতিবেশী খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। মিশরের খলিফা ছিলেন হীনবল এবং বিলাস-স্রোতে

ভাসমান। ফলে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার মুসলিম জনসাধারণ এই [illegible] সাহায্য পায়নি।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী ৪৮৯ হিজরি (১০৯৬ ঈ:) সালের [illegible] ক্রুসেড-যোদ্ধারা বিপুল সংখ্যায় যাত্রা করে এবং তাদের অগ্রভাগে ছিলো পাদ্রি ধর্মযাজক। তাদের এই দলের মধ্যে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা না-থাকায় পথে পথে লুটপাট আরম্ভ করে। ফলে তাদের বুলগেরীয় ও হাঙ্গেরীয় লোকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। যুদ্ধে তাদের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করলে সুলতান কেলিজ আরসালানের সৈন্যরা তাদেরকে খতম করে দেয়। কিন্তু ক্রুসেডারদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা আর সফল হতে পারেনি।

বিজয়ী খ্রিস্টানরা অগ্রসর হতে হতে আন্তাকিয়া পৌঁছে যায়। নয় মাস পর ইন্তাকিয়াও চলে যায় তাদের দখলে। সেখানকার সমস্ত মুসলমানকে তারা হত্যা করে। মুসলমানদের ওপর ক্রুসেডারদের নির্যাতন ছিলো বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জাজনক অধ্যায়গুলোর একটি। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ—কেউ তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারলো না। প্রায় এক লাখ মুসলমান নিহত হয়। আন্তাকিয়ার পর বিজয়ী বাহিনী সিরিয়ার কয়েকটি শহর দখল করতে করতে হিমস পৌঁছে।

১০৯৭ সালে গডফ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সাত লক্ষ খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধা কন্সটান্টিনপোলের পথে এশিয়া মাইনর আক্রমণ করে। ইকনিয়ামের সেলজুক সুলতান কিলিজ আরসালান দাউদ খ্রিস্টান-বাহিনীর গতিরোধ করতে গিয়ে পরাজিত হন। খ্রিস্টানরা পথের মাঝে যে-সমস্ত নগর ও গ্রাম পেয়েছে, সেগুলোর সব পুড়িয়ে ফেলে ও অধিবাসীদের হত্যা করে। যেহেতু যুদ্ধ, তাই হত্যাগুলো হয়েছে নির্দয়ভাবে। এরপর খ্রিস্টানরা আন্তাকিয়া নগর অবরোধ করে।

খ্রিস্টান-ধর্মযাজকরা প্রচার করেছিলো যে, যারা মুসলমানের মাংস ভক্ষণ করবে, তারা নিষ্পাপ অবস্থায় স্বর্গে আরোহণ করতে পারবে। খ্রিস্টান-সর্দার বোহিমন্ড এন্টিয়কের রাজা ঘোষিত হন।

১০৯৯ সালে ফরাসি কাউন্ট রেমন্ডের নেতৃত্বে খ্রিস্টান যোদ্ধারা সিরিয়ার মেরাতুন্নোমান নগর ভস্মীভূত করে এবং এর এক লাখ অধিবাসীকে হত্যা করে।

খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা শামের সুমদ্র-উপকূলবর্তী হাইফা জাফফা, কাইসারিয়া, আক্কা, তারসূস প্রভৃতি নগর দখলপূর্বক নগরসমূহের মুসলমান ও ইহুদি

অধিবাসীদেরকে হত্যা করে। অন্যদিকে জেরুসালেমের রাজা গডফ্রের মৃত্যু হয়। ১১০০ সালে তার ভাই বল্ডউইন রাজপদে অধিষ্ঠিত হন।

এন্টিয়ক-রাজা বোহিমন্ড সেলজুক-সেনাপতি গোমিস্তিগিন কর্তৃক পরাজিত ও বন্দি হন। ক্রুসেডার দলপতি রেমন্ড সিরিয়ার ত্রিপোলি বন্দর অবরোধ করেন। অন্যদিকে বিভিন্ন দলপতির নেতৃত্বে পরিচালিত চার লক্ষাধিক খ্রিস্টান যোদ্ধা এশিয়া মাইনরের আনাতোলিয়া প্রদেশে খাদ্যাভাব, মহামারী ও তুর্কি সৈন্যদের হাতে প্রাণ বিসর্জন করে। এরপর তারা জেরুসালেমের অধিকর্তা হয়ে ওঠে। অন্যান্য লাতিন রাজ্যগুলোর মতো এখানেও তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় ক্রুসেড আক্রমণ

মসুলের স্বাধীন আমির আতাবুক ইমাদুদ্দিন জেঙ্গি ক্রুসেডার ডিউক জসেলিনকে পরাজিত করে সিরিয়ার এডেসা দখল করেন। জার্মান-সম্রাট তৃতীয় কনরোড ও ফ্রান্স-রাজ সপ্তম লুইয়ের নেতৃত্বে নয় লক্ষ খ্রিস্টান ক্রুসেডার সিরিয়া আক্রমণ করে। ফরাসি রানি ইলিয়ানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হজার নারীও এই যুদ্ধে যোগ দেন। ১১৪৭ সালে এই বিরাট বাহিনী সিরিয়ায় উপস্থিত হলে দ্বিতীয় ক্রুসেড আরম্ভ হয়। খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা আন্তাকিয়া নগর পুনঃদখল করে।

আলেপ্পোর আমির নুরুদ্দিন জেঙ্গি ও তার ভাই মসুলপতি ইমাদুদ্দিন জেঙ্গি ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম রাজশক্তি ওই দুর্দিনে সিরিয়াবাসীর সাহায্যে আসেনি। দামেশক নগরের কাছে ক্রুসেডাররা যেনগি ভাতৃদ্বয়ের কাছে পরাজিত হয়। আলেপ্পো-রাজ নুরুদ্দিন জেঙ্গির সাথে এডেসার ডিউক দ্বিতীয় জোসেলিনের বিবাদ শুরু হয়। নুরুদ্দিন জোসেলিনকে বন্দি করেন। ১১৫১-১১৫৩ সালে জেরুজালেম-রাজা তৃতীয় বল্ডউইন মিশরীয় বাহিনীকে পরাজিত করে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী আস্কালন বন্দর দখল করেন।

দ্বিতীয় ক্রুসেড মুসলমানদের দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও জাগরণের কারণে ব্যর্থ হয়েছে। সম্রাট কনরাড ফ্রান্সে ফিরে আসেন। তারপর ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই তার অনুসরণ করেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম ক্রুসেড আক্রমণ

তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের পর, ইতালির প্রিন্স বনিফাস এবং তার বন্ধু ফ্রান্সের প্রিন্স ফ্ল্যান্ডার ফিলিস্তিনে আক্রমণের জন্য একটি ক্রুসেড তৈরি করে। এই লক্ষ্যে তারা ১২০৩ সালে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে। তখন পদচ্যুত দ্বিতীয় আইজাককে বাইজেন্টাইনের সম্রাট হিসেবে পুনরায় ক্ষমতায় বসানো হয়। ক্রুসেড পূর্বাঞ্চলে অব্যাহত রাখার আগে সম্রাট আইজাকের বিরুদ্ধে কনস্টান্টিনোপলে একটি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; তাই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিলো। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পর ক্রুসেড যুদ্ধের নেতা নির্বাচন করা হয় তাকে; পূর্বের ল্যাটিন রাজ্যের সম্রাটের অধিকারী করার অঙ্গীকারও দেওয়া হয়। তার বন্ধু প্রিন্স বনিফেস থেসালোনিকিতে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলো। এ-সকল খ্রিস্টান-নেতা চতুর্থ ক্রুসেডে অংশ নেয়।

তারপর হাঙ্গেরির রাজা দ্বিতীয় অ্যান্ড্রুর নেতৃত্বে ১২১৯ সালে পঞ্চম ক্রুসেড সংঘটিত হয়। সমুদ্রপথে তারা মিশরে অবতরণ করে। কিন্তু তারা লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। (এ-বিষয়ে দশম অধ্যায়ে আলোচনা গত হয়েছে।)

ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্রুসেড

১২২৮ সালে জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ক্রুসেড যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। আল মালিকুল কামিল ও তার ভাইদের মধ্যে বিরোধের কারণে বায়তুল মুকাদ্দাস শহর ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কামিলের উত্তরসূরি সালিহ তা আবার ক্রুসেডারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। বায়তুল মুকাদ্দাস যথারীতি মুসলমানদের আয়ত্তে থেকে যায়। (এ-বিষয়েও দশম অধ্যায়ে আলোচনা গত হয়েছে।)

সপ্তম ক্রুসেড ১২৪৮ সালে ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুইয়ের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। ১২৪৯ সালে মানসৌরার শহরে আক্রমণ চালানো হয়। (এ-বিষয়ে দশম অধ্যায়ে আলোচনা গত হয়েছে।)

২১ বছর পর ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই অষ্টম ক্রুসেড পরিচালনা করে। ১২৭০ সালে তিউনিশিয়ায় ব্যাপক আক্রমণ চালায় এবং কার্থেজ অবরোধ করে রাখে। কিন্তু তাদের এ-ক্রুসেড ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সেনাবাহিনীতে প্লেগ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বহু সেনা এতে আক্রান্ত হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ক্রুসেডের প্রভাব

ইউরোপ যখন ক্রুসেড যুদ্ধ পরিচালনা করছিলো, তখন তারা বৈজ্ঞানিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে ছিলো। প্রাচ্যের ইসলামি জনপদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ফলে এদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদে সমৃদ্ধি আসে। বিজ্ঞান ও শিল্পে উন্নয়ন-অগ্রগতি দেখা দেয়।

ক্রুসেড ইউরোপে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিলো, যা বারো ও তেরো খ্রিস্টাব্দ তথা ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরির পূর্বে তারা অর্জন করতে পারেনি। তাদের এই প্রভাবের সংক্ষিপ্তসার:

- তারা ইসলামি রাজ্যসমূহ থেকে ওষুধ, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যামিতি-শাস্ত্রের আরবি বইগুলো স্থানান্তরিত করে এবং ইউরোপের বিজ্ঞানীদের দ্বারা অনুবাদ করে।
- তারা এখান থেকে স্যানাটোটোরিয়াম ও হাসপাতালের চিকিৎসার পদ্ধতি রপ্ত করে। দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে তারা ইউরোপে স্যানাটোটোরিয়াম এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা শুরু করে।
- প্রাচ্যের বিভিন্ন ধরনের গাছপালা তাদের দেশে নিয়ে যায় এবং সেগুলো তাদের দেশে চাষ করে। যেমন: চাল, তিল, ভুট্টা, আখ, তরমুজ, অ্যাপিক্রট বা খুবানি ও লেবু ইত্যাদি।

- প্রাচ্য থেকে সামরিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য কবুতরের ব্যবহার, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের কারিগরি শিক্ষা রপ্ত করে নেয়।
- ক্রুসেডাররা প্রাচ্যের বিভিন্ন সংস্কৃতি বিশেষ করে স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা, অ্যারোমাথেরাপি, খাদ্যে মশলার ব্যবহার, মিষ্টি তৈরির জন্য চিনি ব্যবহার এবং নারী-পুরুষদের প্রাকৃতিক সুবিধাজনক পোশাকের কারিগরি ইত্যাদি আয়ত্ত করে নেয়।
- প্রাচ্য থেকে তারা শিল্পবিপ্লব শিখে নেয়। বাজারের নানাবিধ পণ্য—যেমন টেক্সটাইল, কার্পেট, গ্লাস, পাত্র ইত্যাদির বানিজ্যিকীকরণ রপ্ত করে।
- তবে ওই সময়টাতে প্রাচ্যের মুসলিম-দেশগুলো ইউরোপ থেকে কোনোরূপ উপকৃত হয়নি। কারণ তাদের কাছে তখন বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পসহ নেয়ার

মতো কিছু ছিলো না; অথচ ইউরোপকে মধ্যযুগের অন্ধকার হতে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার দিকে নিয়ে গিয়েছিলো মুসলমানরা।

সারকথা, প্রাচ্যের মুসলমানরা পাশ্চাত্যের ক্রুসেডারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নত হয়নি, ভেঙে পড়েনি। একজোট হয়ে তারা আল্লাহর পথে জিহাদের ধারা অব্যাহত রাখে এবং ইসলাম অবশ্যম্ভাবীরূপে বিজয় লাভ করে।[৩০৪]

[৩০৪] বিস্তারিত দেখুন: Maalouf, A. (1984). *The Crusades Through Arab Eyes.* New York: Schocken.; Ochsenwald, W. & Fisher, S. (2003). The Middle East: A History. (6th ed.). New York: McGraw-Hill.; he Wordsworth Pocket Encyclopedia, (1993). Wars and Battles. Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd. p.14-15.

মঙ্গোল আক্রমণ

মঙ্গোলদের উৎস এবং উৎপত্তি

মঙ্গোলরা মধ্য-এশিয়ার জাতি। মঙ্গোলিয়া তাদের আবাসভূমি। নির্মমতা, ধ্বংসযজ্ঞ [illegible] এবং [illegible] বেশ কিছু জাতির সামগ্রিক রূপ হিসেবে এরা সর্বত্র পরিচিত। এরা মঙ্গোলিয়া থেকে তুরস্ক সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অঞ্চলে নিজ শক্তি বলে [illegible] করে আসছিলো। পার্বত্য ও মরু-অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ায় তাদের মধ্যে এক ধরনের খাপছাড়া ভাব চলে আসে। তাদের প্রধান পেশা ছিলো লুটতরাজ ও পশুশিকার। জাতিতে বড় একরোখা মোঙ্গলরা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠেছিল সমরবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। প্রস্তর যুগের মানুষদের মতো ছিলো তাদের স্বভাব ও [illegible]।

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এক সাধারণ গোত্রপতি থেকে নিজ নেতৃত্বগুণে বিশাল সেনাবাহিনী তৈরি করেন তেমুজিন—যদিও বিশ্বের কিছু অঞ্চলে চেঙ্গিস খান প্রায় নির্মম ও রক্তপিপাসু বিজেতা হিসেবে চিহ্নিত, তথাপি মঙ্গোলিয়ায় তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সম্মানিত ও সকলের ভালোবাসার পাত্র। তাকে মঙ্গোল জাতির পিতা বলা হয়ে থাকে। তার নাম পরিচিতি পায় চেঙ্গিস খান হিসেবে, যার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। একজন খান হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে চেঙ্গিস পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ার অনেকগুলো যাযাবর জাতিগোষ্ঠীকে একটি সাধারণ সামাজিক পরিচয়ের অধীনে একত্রিত করেন। এই সামাজিক পরিচয়টি ছিলো মঙ্গোল। তিনি মঙ্গোল গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করে মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তিনি মঙ্গোলিয়ার অরখুন নদীর ওপর অবস্থিত কারা কুম শহরটিকে ৬০৩ হিজরি (১২০৬ ইং) সনে সামরিক ব্যবস্থাপনা-সজ্জিত রাজধানী হিসেবে গঠন করেন।[৩০২]

[৩০২] দ্রষ্টব্য—ড. সাআদ আল-গামিদি, আল আলামুল ইসলামি ওয়াল গাজউল মঙ্গোলি, ১১; ড. আল-আব্বাদ, আল মোগোল ফিত তারিখ: ৩৩৩-৩৩৪

চিন আক্রমণ

[illegible] সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার পর চেঙ্গিস খান তার প্রতিবেশী চিনকে আক্রমণ [illegible] চিনের শাসকরা মঙ্গোলিয়ার সীমান্তবর্তী উত্তরাঞ্চলের বাহিনীর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা [illegible] প্রাচীর নির্মাণ করে। কিন্তু চেঙ্গিস খানের প্রবল আক্রমণে তা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। উত্তরাঞ্চল মঙ্গোলের পদানত হয়। চেঙ্গিস খান [illegible] প্রবেশ করে। চিন তখন রাজবংশের দ্বারা [illegible] অংশে বিভক্ত ছিলো। নিজ নিজ প্রদেশগুলো [illegible] দ্বারা [illegible] হতো। ৯৬০ সালে এই বিশাল দেশটি ঐক্যবদ্ধ হয়।

১২১২ [illegible] আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে মঙ্গোলীয়রা উত্তর [illegible] সক্ষম হয়। তারপর তাদের প্রভাব অন্যান্য অংশে [illegible] পড়ে। অবশেষে চিনের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে তাদের হাতে।[৩০২]

ইসলামি দেশগুলোতে মঙ্গোল হামলা

[illegible] চিনের বৃহত্তর অংশটি গ্রাস করতে পারেনি, এমন সময়ে সে ইসলামি দেশগুলোতে আক্রমণ শুরু করে দেয়। তুর্কিস্তানের খাওয়ারিজম রাজ্য (বর্তমান উজবেকিস্তান) থেকে সে তার আক্রমণ শুরু করে, যা আব্বাসীয় খিলাফত থেকে স্বাধীন হয়ে মা-ওয়ারাউন নাহর শহরে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলো; [illegible] আমু দরিয়ার তীরে অবস্থিত খাওয়ারিজম-প্রশাসকরা এটি শাসন করতেন। এখানকার সর্বাধিক বিখ্যাত সুলতান হলেন আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ। তিনি একজন আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ় মনোবলের মানুষ ছিলেন। তার আমলে তিনি খাওয়ারিজম-সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটান এবং কেন্দ্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন।

মা-ওয়ারাউন নাহর আক্রমণের জন্য চেঙ্গিস খান অজুহাত খুঁজতে শুরু করে। সে খুরাসানে কিছু মঙ্গল বণিকের গ্রেফতার ও নিহত হওয়ার ঘটনাকে অভিযোগ হিসেবে দাঁড় করায়। এই নাটক সাজানোর পর চেঙ্গিস খান ক্ষুব্ধ হয়ে—মোঙ্গলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার না-করলে খাওয়ারিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে—মর্মে

[৩০২] দ্রষ্টব্য—ড. হাফিজ, মুকরুল মগোল: ২১; *জিনকিস খান কাহিরুল আলাম*: ২৩৮

[illegible] মোঙ্গলদের প্রথা অনুযায়ী সবচেয়ে ছোট পুত্র পায় [illegible] সেই হিসেবে নেতৃত্ব আসে হালাকু খানের হাতে। তার [illegible] মোঙ্গলদের অভিযান পরিচালিত হয়। সে সহিংসতা [illegible] কম ছিলো না। তার বাহিনীর সহিংস পদচারণা [illegible] ইরাক ও সিরিয়ার বুকে। গণহত্যা চলতে থাকে সর্বত্র। শহর [illegible] এগিয়ে যেতে থাকে বাগদাদ অভিমুখে।

মোঙ্গল বাহিনী [illegible] সেনা সমাবেশ করল। মোঙ্গলদের [illegible] জন্য মুসতাসিম বিল্লাহর কাছে পত্র পাঠানো [illegible] ছিলো অত্যন্ত অপমানজনক। পত্রে বিশ্রীভাবে মোঙ্গলদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুসতাসিম বিল্লাহকে কাপুরুষ আখ্যা দেওয়া হয়। সন্ত্রস্ত মুসতাসিম [illegible] উমারাদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করলেন। [illegible] মুসতাসিম বিল্লাহর প্রধান উজির ইবনুল আলকেমি তাকে [illegible] পরামর্শ দেন। প্রকৃতপক্ষে আলকেমি ছিলো মোঙ্গলদের [illegible] খলিফা তার পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেনাবাহিনী [illegible]। [illegible] শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে আব্বাসীয়দের পক্ষ থেকে [illegible] মধ্যস্থতা করার জন্য হালাকুর কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু [illegible] হালাকু প্রবীণ [illegible] সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে—বেজে ওঠে [illegible]।

বাগদাদ পতন

৬৫৬ হিজরি (১২৫৮ খ্রি.) সনের মুহাররমে আর্মেনীয় খ্রিস্টান আর চৈনিকদের সমন্বয়-গড়া দুই লাখ সৈন্যের হালাকু-বাহিনী অবরোধ করে বসে বিশ লাখ বাগদাদি জনগণকে। বিশ্বাসঘাতক আলকেমির কুপ্ররোচণায় দুর্বল, দায়িত্বজ্ঞানহীন খলিফা বাগদাদের নগর-ফটক খুলে দিয়ে তার যাবতীয় ধন-সম্পদ সঁপে দেয়। বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে কাপুরুষোচিত ভূমিকা গ্রহণ করেও পার পাননি মুসতাসিম, সাথে মূল্য দিতে হয় বাগদাদের লাখ লাখ নিরপরাধ নাগরিককে। ক্ষুধার্ত আর উন্মত্ত মোঙ্গল-বাহিনী তাদের নিষ্ঠুরতার চরম সীমা অতিক্রম করে। শেষে আব্বাসি খলিফাকে তারা বস্তাবন্দি করে তার ওপর ঘোড়া চাপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে।

[৩০১] দ্রষ্টব্য—আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩-২০৩; আস-সাইয়াদ, আত-তাতার: ২৬৫; তারিখুত তাতার: ১৫১; জামিউত তাওয়ারিখ: ৩০০-৩০২

নির্বিচারে যাকে তাকে হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিলো রূপকথার রহস্যনগরী বাগদাদে। কী শিশু, কী নারী, বয়োবৃদ্ধ, মসজিদ, হাসপাতাল—কিছুই রক্ষা পায়নি হালাকুর আগ্রাসন থেকে। তিলোত্তমা নগরী পরিণত হলো ভয়ানক ভূতুড়ে নগরীতে। এ-গণহত্যা চললো টানা এক সপ্তাহ নাগাদ। নির্বোধ আর অপরিণামদর্শী মোঙ্গলদের হাতে ধ্বংস হলো বিখ্যাত বায়তুল হিকমা[৩১০] এবং তারই সাথে নিঃশেষ হয়ে যায় শত বছর ধরে সঞ্চিত মানবজাতির জ্ঞানের প্রতিটি পাতা।

বাগদাদ আক্রমণের ফলে বহু স্মৃতিসৌধ, প্রাসাদ ও মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অসংখ্য বইপুস্তক বিনষ্ট হয় এবং বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক নিহত হন; এভাবে মুসলিম-বিশ্বের স্বপ্নরাজ্য বাগদাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির যে-দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হলো। তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র বাগদাদ ধ্বংস সম্পর্কে তাই বলা যায়, এটা শুধু মুসলিম-বিশ্বের নয়, সারা বিশ্বের অগ্রগতিকেও ব্যাহত করেছিলো।

মোঙ্গলদের ইরাক দখল এবং আব্বাসি খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর হত্যার মধ্য দিয়ে সোয়া পাঁচ শতাব্দী ধরে চলমান আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ঘটে, যা গোড়াপত্তন হয়েছিলো ১৩২ হিজরিতে এবং এর সমাপ্তি ঘটে ৬৫৬ হিজরিতে (৭৫০-১২৫৮ ইং)। মুসতাসিম ছিলেন আব্বাসীয় বংশধরের সাইত্রিশতম এবং সর্বশেষ খলিফা।[৩১১]

আলেপ্পো ও দামেশক পতন

পারস্য ও ইরাককে তছনছ করার পর মামলুক শাসনাধীন শাম দেশ ও অন্যান্য শহর ধ্বংসের অভিপ্রায়ে ছুটে চললো হালাকু-বাহিনী। সে তার ছেলে আশমতকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পাঠায়।

---

[৩১০] বাইতুল হিকমাহ ছিল আব্বাসীয় আমলে ইরাকের বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রন্থাগার, অনুবাদকেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটিকে ইসলামি স্বর্ণযুগের একটি প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাইতুল হিকমাহ খলিফা হারুনুর রশিদ (শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার পুত্র আল মামুন (শাসনকাল ৮১৩-৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) এর সময় তা সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছায়।

[৩১১] আস-সাইয়াদ, *আত-তাতার*: ২৭৯; হাসান ইবরাহিম হাসান, *আন-নাজমুল ইসলামিয়া*: ১৩০; *তারিখুল হুরুবিস সালাবিয়া*: ৩/৫২২; *তারিখুল আদব ফি ইরান*: ৫৬৪

৬৫৭ হিজরিতে সে জাজিরার প্রদেশসমূহের ওপর আক্রমণ চালায়। বিধ্বস্ত নগর ও গ্রামে চালায় ব্যাপক লুটতরাজ। তারপর এই বাহিনী ছুটে চলে আলেপ্পোর দিকে। হালাকু আসার অপেক্ষায় সেখানে অপেক্ষা করে সে। ৬৫৮ হিজরি সনের সফর মাসে মঙ্গোলরা কয়েক দিন আলেপ্পো ঘেরাও করে রাখে। তারপর হালাকু সেখানকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা দেন। কিন্তু শহরের দরজা খুলে দেওয়ার পর তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। তাদের অনেককে হত্যা করে লুট করা হয় ধন-সম্পদ।

আলেপ্পো থেকে হালাকু তার শীর্ষ কমান্ডার কিতবুগার নেতৃত্বে দামেশকে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। তার হাতে ধ্বংস হয় আলেপ্পো। মঙ্গোলরা সেখানকার দুর্গ, প্রাসাদ ও মসজিদ ভেঙে চুরমার করে দেয়। মুসলিম-অধিনায়ক জামালুদ্দিন হালাবিসহ অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

সেই শহরের মানুষগুলোকেও বরণ করতে হয়েছিলো বাগদাদবাসীর মতো ভয়াবহ পরিণতি। মোঙ্গলদের ভয়ে সিরিয়া থেকে পালিয়ে তখন দলে দলে মানুষ আশ্রয় নিচ্ছিলো মিশরে। এ-দিকে হালাকুর পরবর্তী পরিকল্পনা ছিলো মিশর দখল করা। কেননা, তখনকার সময়ে মিশর জয় করার অর্থ—সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা জয় করে ফেলা। আর উত্তর-আফ্রিকা থেকে জিব্রাল্টার হয়ে একবার স্পেনে ঢোকার মানে হলো, নিমিষেই ইউরোপকে পদানত করা। সেটি করতে পারলেই পূর্ণ হবে পিতামহ চেঙ্গিসের বিশ্ব-জয়ের স্বপ্ন। তাই মোঙ্গলদের বিশ্ব-জয়ের স্বপ্নে একমাত্র বাধা তখন মিশরের তরুণ মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ।

সিরিয়া থেকে মিশর আক্রমণের পূর্বে হালাকু খান মোঙ্গলদের স্বভাবসুলভ হুমকি—'হয় আত্মসমর্পণ, নয় ভয়াবহ মৃত্যু'—মর্মে চিঠি পাঠালো মিশরের সুলতানের কাছে। সাইফুদ্দিন কুতুজ ভালোভাবেই জানতেন ইতিপূর্বে যারা বিনা যুদ্ধে মোঙ্গলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো, তাদের কী করুণ পরিণতি হয়েছিলো। তাই কাপুরুষের মতো বিনা যুদ্ধে অপমানিত হয়ে মারা পড়ার চেয়ে তিনি চাইলেন, এই বর্বর বাহিনীকে মোকাবেলা করতে। সুলতান কুতুজ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মোঙ্গলদের মোকাবেলা করার। এ-দিকে যাত্রাপথে হালাকু খবর পায়, তার ভাই গ্রেট খান মঙ্গে মারা গেছে। তাই সে পারস্যে ফিরে যায়। মঙ্গোল-সেনাপতি কিতুবগা শামে তার প্রতিনিধিত্ব করছিলো। এর পাঁচ বছর পর ১২৯৫ সালে হালাকু মারা যায়।[৩১২]

[৩১২] দ্রষ্টব্য—যাহাবি, দুয়ালুল ইসলাম; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৩৩; আল-মুখতাসারু ফি আখবারিল বাশার: ২০১; জিহাদুল মামালিক: ৮৯-৯৩

আইনে জালুতে মঙ্গোলদের পরাজয়

শাম দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর মঙ্গোলদের এবারের লক্ষ্য মিশর—যে-ইসলামি দেশটি আইয়ুবি শাসনামলে সাহসীভাবে পঞ্চম এবং সপ্তম ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ ও পরাজিত করেছিলো। (এ-বিষয়ে আমরা দশম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।)

সুলতান মুজাফফর কুতুজ মঙ্গোলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলেন। তারা গাজার উপকূলে পৌঁছে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ইসলামি সেনাবাহিনী এক দুর্ধর্ষ বাহিনীর প্রতিরোধে অগ্রসর হয়। মোঙ্গল-বাহিনী শাম থেকে মিশরের পথে এসে অবস্থান নেয়। কুতুজ শুরুতেই তার সব সৈন্যদের দিয়ে আক্রমণ করালেন না, বরং প্রথমে ছোট একটি দল পাঠিয়ে মোঙ্গলদের প্ররোচিত করলেন আগে হামলা করার। শুধু তা-ই নয়, তিনি জানতেন, তার সিরীয় সৈন্যরা আগেও একবার মোঙ্গলদের কাছে হেরে পালিয়ে এসেছে, তাই বিপদে পড়লে এরা আবারও পালাবে; যাতে পালাতে না-পারে সে-জন্য তিনি এদের রাখলেন সবার সামনে।

গাজার পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে আমির বাইবার্সের নেতৃত্বে মুসলিম-বাহিনী মঙ্গোলদের প্রতিরোধে অগ্রসর হন। সুলতান কুতুজ বুঝতে পারলেন, চওড়া প্রান্তরে মোঙ্গলদের মুখোমুখি হওয়া মানে সাক্ষাৎ ধ্বংস ডেকে আনা। তিনি মোঙ্গলদের যুদ্ধক্ষেত্র পছন্দ করার সুযোগই দিতে চাইলেন না, বরং নিজেই সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন তাদের মোকাবেলা করার জন্য এবং বেছে নিলেন ফিলিস্তিনের তাবারিয়ার আইনে জালুত-প্রান্তর।

৬৫৮ হিজরি (১২৬০ ইং) সনের রমযানে এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেখানে মোঙ্গল-বাহিনী মারাত্মকভাবে পরাজয়ের মুখে পড়ে এবং তাদের নেতা কিতুবগাকে হত্যা করা হয়। তারপরই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে মোঙ্গল-সেনাবাহিনী। দিগ্বিদিক পালিয়ে যেতে থাকে বিক্ষিপ্ত মোঙ্গলরা। কুতুজের সৈন্যরা বহু দূর তাড়িয়ে শেষ হানাদার সৈন্যটিকেও হত্যা করে। এভাবেই মামলুক-সৈন্যদের কাছে পরাজয় ঘটে অহংকারী, বর্বর ও জালিম হালাকু-বাহিনীর। নিমিষেই চূর্ণ হয়ে যায় তাদের আকাশছোঁয়া দম্ভ। এরপর ফিরে আসে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ও নিরাপত্তা। পরবর্তীকালে প্রধান বিচারপতি হুসামুদ্দিন হানাফির নেতৃত্বে ন্যায়বিচার ও শান্তি-সমৃদ্ধির পরিবেশ ত্বরান্বিত করা হয়।[৩১৩]

[৩১৩] *জিহাদুল মামালিক*: ১০৫-১০৭; *কিসসাতুত তাতার*: ২৪৫-২৮১

মঙ্গোলদের দম্ভ চূর্ণ ও শামের স্বাধীনতা

আইন জালুতের যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। চেঙ্গিস খান কর্তৃক চীন, তুর্কিস্তান ও খুরাসান আক্রমণের পর মঙ্গোল বাহিনী প্রথমবারের মতো পরাজিত হয়। চেঙ্গিসের নাতি হালাকু পারস্য, ইরাক ও সিরিয়া জুড়ে যে-ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রেখেছিলো, আইন জালুতে তা মুখ থুবড়ে পড়ে। থমকে যায় মঙ্গোলীয় অগ্রগতি। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতা রক্ষা পায় এবং মঙ্গোলদের ভয়াবহ ধ্বংস থেকে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলো সুরক্ষিত থাকে। এই যুদ্ধ ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিয়েছিলো। মানুষের কল্পনার জগত থেকে—'মঙ্গোলরা পরাজিত হয় না'—এই ধারণা মুছে ফেলা হলো।[৩১৪]

তৈমুর লংয়ের উত্থান এবং এশিয়া আক্রমণ

মঙ্গোলদের পরাজিত হওয়ার একশো বিশ বছর পর মঙ্গোলদের রাজা তৈমুর লং তার পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের স্বপ্ন পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়। সে তার রাজবংশের ধ্বংসাবশেষ রক্ষার ধারা সূচনা করে।

তৈমুর লং সমরকন্দকে তার রাজধানী হিসেবে বেছে নেয়। এশিয়ার দেশগুলো বিজয় করতে সে সেনাসমাবেশ ঘটায়। তখন এশিয়া মাইনর এবং উত্তর বলকান ছিলো উসমান বিন আর্তগ্রুল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উসমানি-সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে। (আমরা পরে তাদের কথা বিস্তারিত আলোচনা করবো।)

৭৮২ হিজরি (১৩৮০ ইং) সনে তৈমুর লং পারস্য, খুরাসান ও আজারবাইজানের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে এবং ধারাবাহিকভাবে সহিংস আক্রমণের পর এটি দখল করে। ১৩৯৩ সালে সে ইরাক যায় এবং বিশেষ করে বাগদাদে ব্যাপক লুটপাট করে।

১৩৯৫ সালে তৈমুর লং উত্তর দিক থেকে কিরগিজ এলাকা পাড়ি দিয়ে মস্কো আসে। চৌদ্দ মাস ধরে এটি দখলে রাখার পর এখান থেকে মূল্যবান সম্পদ ও অর্থকড়ি নিয়ে ফিরে আসে সমরকন্দে। তারপর ১৩৮৯ সালে সে ভারতে অভিযান চালায়; ভারতের উত্তরাঞ্চলে আক্রমণ করে দিল্লিতে প্রবেশ করে শহর অবরোধ

[৩১৪] দ্রষ্টব্য—ড. কাইদ, *আল-জিহাদুল ইসলামি জিদ আস-সালিবিয়্যিন ওয়াল মাগুল*: ১২২-১২৩; ড. হামিদ গানিম, *আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যা*: ৪২৪; ড. নূমান জিবরান, *দিরাসাত ফি তারিখিল আইয়ুবিয়্যিন ওয়াল মামালিক*

করে রাখে। সেখানে সহিংস যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অসংখ্য লোককে হত্যা করা হয় এবং ধ্বংস করা হয় বহু শহর।

তার বিজয়-অভিযান এবার এসে ভেড়ে শামে। এখানে তখনো চলছিলো মামলুক-শাসন। ৮০৩ হিজরি (১৪০১ ইং) সনে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তৈমুর লং আলেপ্পোতে প্রবেশ করে। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় এখানেও। সেখান থেকে দ্রুত পৌঁছে যায় দামেশকে। শহর অবরোধ করা হয়। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে ওখানকার সৈন্যরা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। ভেতরে ঢুকেই তৈমুর সেখানকার প্রাসাদসমূহ ও উমাইয়াদের নির্মিত মসজিদগুলো পুড়িয়ে দেয়। এখানেও চালানো হয় ব্যাপক লুটতরাজ।

তৈমুর লং এবার এশিয়া মাইনরের দিকে এগোতে থাকে। আঙ্কারার কাছাকাছি এলে উসমানি-বাহিনীর সঙ্গে তাদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। তৈমুর লংয়ের বাহিনী ১৪০২ সালের জুলাই মাসে উসমানি সুলতান বায়েজিদকে আটক করে। তারপর ব্রুসা শহর লুট করে বিধ্বস্ত করা হয়। এ-ছাড়াও ইজমির ও অন্যান্য উসমানি শহরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়।

তৈমুর লং একটি লোহার খাঁচার মধ্যে উসমানি সুলতান বায়েজিদকে বন্দি করে সমরকন্দ নিয়ে আসে। এর দুই বছর পর সে চিনের উদ্দেশে অভিযানে বের হয়। কিন্তু উত্তরাঞ্চলে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয় তার। এভাবে ১৪০৫ সালে তৈমুর লংয়ের মৃত্যুর মাধ্যমে তৃতীয় মঙ্গোল আক্রমণের ঢেউ থেকে মুক্তি পায় বিশ্ব।[৩১৫]

---

[৩১৫] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, পৃষ্ঠা: ৬৫

উসমানি-সাম্রাজ্য

[illegible] তুর্কিস্তানের একটি জাতি হিসেবে উসমানি (অটোমান) [illegible] গণ্য করা হয়। তুর্কিস্তান মোঙ্গলদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর এই তুর্কি [illegible] দক্ষিণ ককেশাসের উর্বর চারণভূমিতে আবাস গ্রহণ করে। তাদের গোত্রের [illegible] সমভূমি আর্মেনিয়া ও এর আশপাশের পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বেড়ে থাকে এদের বসতি।

এদের অবস্থান যখন সুদৃঢ় হয়, তখনই মারা যান তাদের গোত্রপতি সুলাইমান। তার মৃত্যুর পর গোত্রপতির সম্মানে অভিষিক্ত করা হয় সুলাইমানের ছেলে আর্তুগ্রুলকে। একসময় আর্তুগ্রুল ও তার লোকজন সেলজুক-সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিনের শাসনাধীন দেশ আনাতোলিয়াতে (এশিয়া মাইনর) রওনা হন। তিনি যখন আনাতোলিয়াতে আসেন, তখন এই অঞ্চল বিভক্ত ছিলো। এক অংশ দীর্ঘদিন এবং বাইজেন্টাইন-সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলো; অপর অংশে আধুনিক তুরস্ক ও [illegible] দেশগুলো নিয়ে সেলজুক-সাম্রাজ্য ছিলো। সেলজুক-সাম্রাজ্যের তুর্কমান ও তুর্কি বংশোদ্ভূত সুলতান আলাউদ্দিনকে আর্তুগ্রুল এক যুদ্ধে সাহায্য করেন। আর্তুগ্রুলের এমন কাজে আলাউদ্দিন খুবই খুশি হন। তাই তাকে বাইজান্টাইন-সীমান্তবর্তী সগুত এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান তিনি। বাইজান্টাইনদের হাত থেকে সীমান্তে সেলজুক-সাম্রাজ্যকে রক্ষা করাই ছিলো আর্তুগ্রুলের মূল দায়িত্ব।

৬৮৭ হিজরি (১২৮৮ ইং) আর্তুগ্রুল মৃত্যুবরণ করেন। তার উত্তরাধিকারী হন পুত্র উসমান। এই উসমানের দিকে সম্পৃক্ত করেই উসমানি সাম্রাজ্য বলা হয়। তার ও তার বংশধরদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এই বিশাল সাম্রাজ্য।

আর্তুগ্রুলের ছেলে উসমান ছিলেন অদম্য সাহসী বীর। প্রত্যয়দীপ্ত যুবক। তিনি একটি সম্প্রসারণবাদী আন্দোলন শুরু করেন। বাইজান্টাইন-শাসনাধীন কৃষ্ণ সাগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা পর্যন্ত তার এই আন্দোলনের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান বাইজেন্টাইন-শাসকদের মধ্যে বেশ কয়েকবার ছোট ছোট যুদ্ধ হয়। অবশেষে ১৪৫৩ সালে উসমানি-সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ

বাইজেন্টাইন-সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল জয় করেন। সাম্রাজ্যের শক্তিশালী ভীত মূলত কন্সটান্টিনোপল জয় করার পরই গড়ে ওঠে।[৩১৬]

মঙ্গোলদের আক্রমণ ও পরিণতি

তৈমুর লংয়ের বিধ্বংসী আক্রমণ থেকে রক্ষ পায়নি উসমানি-সাম্রাজ্যও। এরা ১৪০২ সালে আক্রমণ চালায় এবং আঙ্কারায় বেশিরভাগ উসমানি-সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয় এবং সুলতান বায়যিদকে বন্দি করে নিয়ে যায়।। তাদের এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে সুলতান বায়েজিদ-পরিবার এবং এশিয়া মাইনরের উসমানি-রাজ্যগুলোও রক্ষা পায়নি। এখানে বিপুল লুটপাট চালানো হয়।

সেই দুর্যোগের পর বায়েজিদের পুত্র সুলতান প্রথম মুহাম্মাদ দেশটি পুনর্গঠন করতে সক্ষম হন। যখন তার পুত্র দ্বিতীয় মুরাদ ৮২৪ হিজরি (১৪২১ ইং) সনে শাসনভার প্রাপ্ত হন, তখন তিনি যথাযথ শক্তি ও অবস্থান পুনরুদ্ধার না-হওয়া পর্যন্ত সংস্কার ও শুদ্ধি নীতি অব্যাহত রাখেন। সব কটি অঞ্চলে মসজিদ, মাদরাসা এবং হাসপাতাল নির্মিত হয়।

এরপর সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ বলকান ও ইউরোপীয় খ্রিস্টান-রাজ্যসমূহের জোটের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এতে তার বাহিনী শত্রুদের মারাত্মকভাবে পরাজিত করে।[৩১৭]

কন্সটান্টিনোপল বিজয়

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ৮৫৪ হিজরি (১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ) সনে তুরস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয় তার আমলে। কন্সটান্টিনোপল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এর সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। তাই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে সামরিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম খলিফারা কন্সটান্টিনোপল জয়ের জন্য বারবার চেষ্টা করেন।

[৩১৬] দ্রষ্টব্য—ড. আবদুল লতিফ দাহিশ, *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*: ৮; মুহাম্মদ আনিস, *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ওয়াশ শিরকুল আরবি*: ১২-১৩

[৩১৭] দ্রষ্টব্য—*আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিত তারিখিল ইসলামিয়্যাতিল হাদিস*: ৪০

ইউরোপে প্রবেশ করার পর তুর্কিরা সর্বত্র জয়লাভ করছিলো। বলকান রাজ্যগুলো একের পর এক তুরস্কের নিকটে পরাজয়বরণ করে এবং বলকান উপদ্বীপের বৃহত্তর অংশ তুর্কি মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। ইউরোপের এক বিরাট অংশ তুরস্ক তথা উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং কন্সটান্টিনোপল খ্রিস্টানদের অধিকারে থাকলে ইউরোপে যেমন তাদের বিপদ ছিলো, তেমনি এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে তাদের যাতায়াতও নিরাপদ ছিলো না। তাই সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ এ বিজয়ের সংকল্প করেন। তিনি কন্সটান্টিনোপল জয় করার জন্য ব্যাপক সমর-প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

প্রথমে তিনি কন্সটান্টিনোপলের নিকটবর্তী এলাকায় এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেন এবং সেখানে মোতায়েন করলেন তার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। এক শক্তিশালী নৌবহরও তিনি গঠন করলেন। তা ছাড়া যুদ্ধের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের কামানও প্রস্তুত করলেন। এভাবে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সুলতান মুহম্মাদ বহুসংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য নিয়ে কন্সটান্টিনোপল অবরোধ করলেন।

গ্রিক-সম্রাট কন্সটান্টাইনও তুর্কিদের হামলার হাত থেকে রাজধানীকে রক্ষা করার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সে তুর্কিদের হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিস্টান নরপতির নিকট সাহায্যের আবেদন করে। তাদের নিকট থেকে পূর্ণ সমর্থন লাভের আশায় সে গ্রিক ও ল্যাটিন গির্জাকে একীভূত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ল্যাটিন গির্জার অনেক নীতি মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। নানা বিরোধিতার ফলে গ্রিক-সম্রাট কন্সটান্টাইনের সকল পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। তার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য তেমন কেউ এগিয়ে আসেনি। কেবলমাত্র জেনোয়া থেকে জন জাস্টিনিয়ানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য সম্রাটের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

কন্সটান্টিনোপল ছিলো ত্রিকোণাকার। এর দু দিক ছিলো সাগর দ্বারা বেষ্টিত এবং এক দিক ছিলো দুই দেয়াল ও গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। সুলতানের তিনটি কামান একযোগে নগরাভিমুখে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। তুর্কি মুসলিম-বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে দুর্গপ্রাচীরে ভাঙন ধরে। গ্রিক-সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করায় খ্রিস্টান সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে। সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য গ্রিক-সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করেও সে নগর রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয় সে।

১৪৫৩ সালে তার মৃত্যুর সাথে সাথে খ্রিস্টান সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়ন করতে শুরু করে তারা। তুর্কি সৈন্যগণ বীরদর্পে নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মাদ তার পূর্বপুরুষ এবং মুসলিম খলিফাদের আশা বাস্তবে রূপ দেন। এজন্য তাকে 'মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৩১৮]

আরবে উসমানিদের রাজ্য বিজয়

উসমানিরা এবার দৃষ্টি দিল আরবের বিভিন্ন রাজ্যের দিকে। সে-সময় পারস্য ও ইরাকের শাসক ছিলেন সাফাভিরা। আর মিশর, শাম-দেশ ও হিজায ছিলো মামলুকদের নিয়ন্ত্রণে। খ্রিস্টীয় পনেরো শতকের শেষের দিকে ইরানে সাফাভি রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। শাহ ইসমাইল সাফাভির হাতে শাসনভার এলে তিনি ইরাককে ১৫০৮ সালে তার শাসনরাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি এ-সব রাজ্যে শিয়া মতবাদের প্রচার-প্রসার ঘটান।

সাফাভি ও উসমানিদের মধ্যে কোনো সুসম্পর্ক ও মেলবন্ধন ছিলো না। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে ছিলো। কারণ, উসমানি সুলতান প্রথম প্রথম সেলিমের একদল বিরোধীদেকে ইরানে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি। তাদেরকে সম্মান করেছিলেন এবং তাদেরকে সেলিমের বিরুদ্ধে আরও উসকে দিয়েছিলেন। উভয় রাজ্যের মাঝে এই শত্রুতা একসময় যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়।

সুলতান সেলিম ৯২০ হিজরি (১৫১৪ ইং) সনে ইরানে একটি বিশাল সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন। তাবরিজ শহরে সাফাভির বাহিনীর সাথে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেন। উসমানি সুলতানের এই বিজয়ের ফলে সাফাভিদের অন্যান্য রাজ্য—যথা কুর্দিস্তান ও দিয়ারে বকর রাজ্যগুলো উসমানি-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩১৯]

---

[৩১৮] দ্রষ্টব্য—ড. মুহাম্মদ মোস্তফা, *ফাতহুল কুসতানতিনিয়া ওয়া সিরাতুস সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*: ৩৬-৪৬; মুহাম্মদ সাফওয়াত, *ফাতহুল কুসতানতানিয়্যাহ*: ৬৯; আবদুস সালাম ফাহমি, *আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*: ১০২

[৩১৯] দ্রষ্টব্য—ড. মুহাম্মদ নাসর, *আল-ইসলামু ফি আসিয়া মুনযুল গাযওয়িল মুগুলি*: ২৪০; *কিরাআতুন জাদিদাতুন ফি তারিখিল উসমানিয়্যিন*: ৬৩; ডক্টর নাবিল রিজওয়ান, *আল-কুওয়াতুল উসমানিয়্যাতু বাইনাল বাররি ওয়াল বাহরি*: ১১১

উসমানি সেনাবাহিনী নতুন বন্দুক এবং রাইফেলগুলো ছিলো মামলুকদের অস্ত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও উন্নত। এ ছাড়া যুদ্ধের শুরুতে মামলুকদের বেশ দৃঢ়তা দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে তাদের বেশ কিছু সেনাপতি উসমানিদের সাথে যোগ দেওয়ার ফলে মামলুকদের মারাত্মক শক্তিহানি ঘটে।

এভাবে শেষ হয় লেভান্টের (শাম) মামলুক-শাসনযুগ। সুলতান সেলিমের হাতে তাদের পরাজিত হতে হয়। সেলিম মিশরে যাত্রা অব্যাহত রাখেন, যেখানে আল-ঘোরির উত্তরসূরি তুমান বে বিপুল শক্তি নিয়ে অবস্থান করছিলেন। কায়রোর উপকণ্ঠ রায়দানিয়াতে ১৫১৭ সালে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে উসমানি সেনাবাহিনী বিজয় লাভ করে এবং তুমান বে পালিয়ে যায়। এভাবেই উসমানিদের হাতে পতন ঘটে মিশরের মামলুকদের। মামলুক-সেনাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মিশর তার শাসনাধীনে চলে আসে।[৩২০]

হিজায ও ইয়েমেন নিয়ন্ত্রণ

হিজায অঞ্চল ছিলো মামলুকদের শাসনাধীন। তাদের প্রত্যেক সুলতানকে 'খাদিমুল হারামাইন' বা 'দুটি পবিত্র মসজিদের সেবক' বলা হতো। সুলতান সেলিম মিশর জয় করে মামলুকদের থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেন এবং এই উপাধির উত্তরাধিকারী হন। কায়রো ছেড়ে যাওয়ার আগে উসমানি-সাম্রাজ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ শরিফ সেলিমকে দুটি পবিত্র মসজিদের চাবি পাঠিয়েছিলেন। এভাবে হিজায নিয়ন্ত্রণে আসে উসমানিদের। আর শরিফ মক্কায় তার পদ টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন।

এভাবে চলতে থাকে উসমানিদের বিজয়-অভিযান। সুলাইমান আল-কানুনি নামে প্রসিদ্ধ সুলতান প্রথম সুলাইমান এডেন ও ইয়েমেনের উপকূলীয় এলাকায় নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন। এটা ওই সময়ের ঘটনা, যখন পর্তুগিজরা মাসকাট ও আরব-উপসাগর নিজেদের ঘাঁটি হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিলো। উসমানির প্রথমবার ১৫৩৮ সালে এডেনে এবং পরের বার ১৫৫১ সালে ইয়েমেন ও সমগ্র উপকূলে অভিযান চালায়। এ-সব অভিযানে উসমানিরা পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে দুর্বার আক্রমণ চালায়। উল্লেখ্য, পর্তুগিজরা ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ-সব এলাকা দখল করে রেখেছিলো। উসমানিদের অভিযানে পর্তুগিজরা আরবীয় উপসাগর থেকে

[৩২০] দ্রষ্টব্য—ড. মুহাম্মদ হারব, *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ*: ১৭০,১৭১; *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ*: ২৯-৩০

পর্যন্ত যাবার সুযোগ পায়নি। পর্তুগাল তখন ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলগুলো নিয়ে এক বিশাল সামুদ্রিক দেশ ছিলো।[৩২১]

মাগরিবে আরবী নিয়ন্ত্রণ

মরক্কো ছাড়া আরবের পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলো ছিলো উসমানি-সাম্রাজ্যের দখলে। এটি তিনটি রাজ্য নিয়ে গঠিত ছিলো। যথা: তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো। এগুলো মুওয়াহহিদিন রাজ্যের ধ্বংসাবশেষে নির্মিত হয়েছিলো, যা দুই শতাব্দীর শাসনের পর ১১৬১ সালে বিলুপ্ত মূলত মাগরীবে আরবীতে উসমানিদের আগমন ও দৃঢ় অবস্থান রাখতে সহায়তা করেছিলো খায়রুদ্দিন বারবারুসা ও মারাকেশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা। তারা উসমানি সুলতানের কাছে সাহায্যের আবেদন এবং পশ্চিমের রাজ্যগুলোকে উসমানি-সাম্রাজ্যে সংযুক্ত করার আহ্বান জানায়। তখন এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয়। ১৫১৯ সালে আলজেরিয়া এবং ১৫৫১ সালে লিবিয়া উসমানি-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭৪ সালে তুর্কি-নেতা সিনান পাশার হাতে তিউনিশিয়ার বিজিত হয়।[৩২২]

ইরাক বিজয়

১৫০৮ সালে সাফাভিরা ইরাকের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছিলো। সুলতান সুলাইমান কানুনি এটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ-লক্ষ্যে তিনি নিজ উদ্যোগে বিশাল সেনাবাহিনী সজ্জিত করে বাগদাদে আসেন এবং ১৫৩৪ সালে ইরাকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। তারপর ইরাকের অন্যান্য অংশগুলোতেও সাফাভিদের (ইরানিদের) পরাজয় ঘটে।

এভাবে দশম হিজরি শতাব্দী থেকে ষোড়শ হিজরি শতাব্দীর মধ্যে সব কটি আরব দেশ উসমানি-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। আর এভাবেই উসমানি-সাম্রাজ্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি দিন টিকে-থাকা সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে। ইউরোপ থেকে শুরু করে এশিয়া, বলকান, ককেশাস ও উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো উসমানি-সাম্রাজ্য। সারা পৃথিবীতে যে-কয়টি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তার

[৩২১] *দ্রষ্টব্য—তারিখুল আরব, মাজমুআতাম মিনাল আসাতিযা*, পৃষ্ঠা: ৪১-৪২

[৩২২] *দ্রষ্টব্য—হারবুস সালাসি মিয়াহ সানাতান বাইনাল জাযায়িরি ও ইসবানিয়া*: ১৬০,১৬১; আবদুল জলিল আত-তামিমি, *রিসালাতু গারনাতা ইলাস সুলতান সুলাইমান*, সংখ্যা-৩, তিউনিসিয়া; মুহাম্মাদ বাহার ফারিস, *তারিখুল জাযায়িরিল হাদিস*: ৩৪

মধ্যে উসমানি-সাম্রাজ্য ছিলো ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধিতে ভরপুর এক সাম্রাজ্য।

উসমানিদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

সুলতান প্রথম সুলাইমানের শাসনামলে উসমানি-সাম্রাজ্যকে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও প্রাদেশিক প্রশাসনের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা হয়। এই প্রবিধানের অধীনে যে-সব শাসনব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছিলো, তার বিবরণ:

সুলতান হবেন উসমানি পরিবার থেকে। তিনি হবেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ শক্তির কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। তাকে 'খলিফাতুল মুসলিমিন' উপাধিতে অভিহিত করা হবে। তাকে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রীদের সিনিয়র বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তারা সহায়তা করেন। ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান পরিচালিত হবে কাযি (বিচারক) দ্বারা। বিচার বিভাগীয় কাজের তদারকি করবেন 'শায়খুল ইসলাম'। তিনি ফাতওয়া জারি করবেন এবং ইসলামি বিচার-বিভাগের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে ফাতওয়া ও নির্দেশনা দেবেন।

সেনাবাহিনী ছিলো সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটা স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত ছিলো। উসমানি সেনাবাহিনীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বাহিনী ছিলো নতুন সৈন্যরা। তাদের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো অশ্বারোহী (সিপাহী) বাহিনী)।[৩২৩]

প্রশাসনিক বিন্যাস

উসমানিরা তাদের বিশাল সাম্রাজ্য অনেকগুলো রাজ্যে ভাগ করে। প্রত্যেকে রাজ্য পরিচালনার জন্য ছিলো নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী। গভর্নর (পাশা) সুলতান দ্বারা নিযুক্ত হতেন এবং তিনি বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রধান হতেন। তারই তত্ত্বাবধানে কর ও তহবিল সংগ্রহ করে রাজ্য-প্রশাসনের সহায়তায় কন্সটান্টিনোপলে পাঠানো হতো। রাজ্য-শাসনে সিনিয়র বেসামরিক এবং সামরিক কর্মকর্তাদের সহায়তা নেওয়া হতো।

বিচার-বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হতো 'কাযিউল কুযাত' দ্বারা, যিনি 'সামরিক বিচারক' হিসেবে পরিচিত। প্রদেশসমূহে তার অভিপ্রায়ে বিচারকদের

---

[৩২৩] দ্রষ্টব্য—ড. ফারিদুন আমজান, সুলায়মান আল-কানুনি: *সুলতানুল বাররাইন ওয়াল বাহরাইন* অবলম্বনে

নিযুক্ত করা হতো। তারা বিচারকার্যে তাকে সাহায্য করতেন। ওয়াকফ স্টেটের দায়িত্ব ছিলো তার হাতে। তিনি ইসলামি আইনের বিধান প্রয়োগে বিশেষাধিকারী থাকতেন।

প্রত্যেক রাজ্যকে আবার কতকগুলো সানজাকে ভাগ করা হতো। এর শাসককে বলা হতো সানজাক। তার কাজ ছিলো প্রদেশের বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করা, নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং কর সংগ্রহ করা। রাজ্যের প্রবীণ ও দক্ষ ব্যক্তিকে সানজাকের দায়িত্ব দেওয়া হতো। তাদের সার্বিক সহায়তা করতেন 'কাশশাফ' নামে পরিচিত বেতনভুক্ত কর্মকর্তারা।

পাশার আদেশ কার্যকর ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রতিটি রাজ্যে ছিলো সামরিক বাহিনী। এই শ্রেণির কয়েকজন লোক খুবই অবমাননাকর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। যেমন: মানুষের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা ইত্যাদি।[৫২৪]

উসমানি-সাম্রাজ্যের পতনকাল

উসমানিরা পশ্চিমে ভিয়েনা সীমান্ত থেকে শুরু করে পূর্বে ককেশাশ পর্বতমালা পর্যন্ত, বসফরাস তীর থেকে শুরু করে লোহিত সাগর পর্যন্ত, শাম থেকে মিশর পর্যন্ত—এমনকি আলজেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল সাম্রাজ্যে অধিকারী ছিলো। মুসলিম এই রাজবংশের শাসনতলে ছিলো বর্তমান বিশ্বের ইউরোপের ক্ষমতাধর গ্রিস, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়াসহ প্রায় সকল দেশই।

এ-ছাড়া সুদীর্ঘকাল উসমানি সুলতানগণ শাসন করেছেন এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ। উসমানি-সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিলো সাড়ে পাঁচশো বছর। আরও সুনির্ধারিত করে বললে বলা যায়, পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে তাদের জৌলুশ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাদের শক্তি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বহাল থাকে। এরপর শুরু হয় তাদের দুর্বলতা ও পতন। এই দুর্বলতার পেছনে যে-সব উপাদান কার্যকর ছিলো, তা হচ্ছে: এক. সুলতান সুলাইমানের (তিনি ক্ষমতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতীক ছিলেন) পরবর্তী সুলতানদের বিলাসিতা ও বিনোদনপ্রীতি। দুই. শাসন-বিষয়ক কার্যক্রমে উজির-নাজিরদের হস্তক্ষেপ। তিন. রাজস্বের যাচ্ছেতাই ব্যবহার, ঘুষের প্রচলন ও দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য।

[৫২৪] দ্রষ্টব্য—আদনান মাহমুদ সালমান, *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া*: ১/২৬৪, ২৬৫ ও ২৪৯

উপরন্তু সামরিক বাহিনীর প্রতি সবল, সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি না-থাকার ফলে বিভিন্ন যুদ্ধে সেনাবাহিনী উপর্যুপুরি পরাজিত হতে থাকলে উসমানি-সাম্রাজ্যের জন্য সর্বনাশা পতনঘণ্টা বেজে ওঠে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৬৮৭ সালে হাতছাড়া হয় হাঙ্গেরি। ১৭১৮ সালে হারায় বেলগ্রেড, ডেলমাসিয়া ও আলবেনিয়া। ১৮২০ সালে গ্রিস, ১৮৫৬ সালে রোমানিয়া, ১৮৭৮ সালে সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া ইত্যাদি হারিয়ে যায় উসমানি-সাম্রাজ্য থেকে; অথচ এগুলোকে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

কিছু সুলতান উসমানি সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা অনুভব করার পর সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তারা সাম্রাজ্যের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, সামরিক কর্মকর্তা, বিরোধী দলীয় গ্রুপ এবং পুরনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষেরও শিকার হয়েছিলেন। সেসব লোকদের ধারণা ছিলো এসব রাজ্যে উন্নতির দরজা বন্ধ করে রাখলে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে অনুন্নত রাখলে ওগুলোকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর লালসাদৃষ্টি থেকে বাঁচানো যাবে এবং সেসব রাজ্য উসমানীয়দেরই থেকে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা ছিলো বিপরীত। ফলে রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডসহ কিছু উচ্চাভিলাষী দেশের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে উসমানি-সাম্রাজ্যের দুর্বলতার দিকে। তারা এসব রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সবকিছু ছিনিয়ে নেয়।[৩২৫]

[৩২৫] দ্রষ্টব্য—*ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*: ১০২; *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ ফিত তারিখিল ইসলামি*: ৯৪

আরব-দেশগুলোর পরিস্থিতি

সাধারণ দৃষ্টিতে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনায় আরব-দেশগুলো পিছিয়ে ছিলো। ইউরোপে যে-সব জাগরণ চলছিলো সেগুলো থেকে এসব অঞ্চল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলো। উসমানি-সাম্রাজ্যের পতন ও বিচ্ছিন্নতার ধারা আঠারো শতকের শেষ দিক পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপরই উসমানি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। ইউরোপ থেকে ধেয়ে আসা তুফান প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ইউরোপীয়রা পৌঁছে যায় একেবারে আরব বিশ্ব পর্যন্ত। যেগুলো সেসময়ে উসমানি সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও অধঃপতনের কারণে সব ধরনের বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মঞ্চে পরিণত হয়েছিলো।[৩২৬]

আরব-বিশ্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

উসমানি শাসনের দুর্যোগ, অবনতি এবং আরব-দেশগুলোর বিরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী-জাতীয় আন্দোলনের সূচনা ঘটে। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য:

- মিশরে ১৭৬৯ সালে মামলুক-বংশোদ্ভূত আলি বেগ আল-কবির দ্বারা একটি আন্দোলন শুরু হয়। তারা মিশরকে উসমানি-সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে মাঠে নামে। তারা তুর্কি গভর্নরকে বহিষ্কার করে। কেন্দ্রে কর প্রেরণ বাতিল করে দেয়। হিজায ও শামে নিজেদের প্রশাসক নিয়োগ দেয়। পরে উসমানিদের বিশিষ্ট মিত্র মুহাম্মাদ বেগ আবুজ জাহাবের নেতৃত্বে উসমানি-বাহিনী এই আন্দোলন দমনে যুদ্ধ করে। ১৭৭৩ সালে আলি বেগ মারা যান।
- ফিলিস্তিনের কিছু অংশ সাফাদ উপজাতিদের নেতা শেখ জাহের আল-ওমর নিজের আয়ত্তে আনতে সফল হন। সেখান থেকে আঠারো শতাব্দীর শেষের তৃতীয় দশকের দিকে তিনি তার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি তিবিরিয়াস,

[৩২৬] *তারিখুত দাউলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ইসমাইল সারহানক, পৃ: ২১৬; *আদ-দাউলাতুল উসমানিয়্যাহ ফিত তারিখিল ইসলামি*: ১২২

সিদন ও হাইফা জয় করেন। উসমানি-সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী সমুদ্রপথে তার ঘাঁটিতে হামলা চালানোর চেষ্টা করে এবং তার আন্দোলনকে দমানোর প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রথমবার তারা ব্যর্থ হয়। তারপরে ১৭৭০ সালে পুনরায় প্রবল আক্রমণ চালানো হয়। ফলে আরেক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করতে হয় জাহেরকে। শেখ জাহেরকে তার জনৈক শত্রু দ্বারা হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর সাথে সাথে নিভে যায় এখানকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রদীপটিও।[৩২৭]

➦ 'কবির' হিসেবে পরিচিত দ্বিতীয় আমির ফখরুদ্দিন আল-মানি লেবাননে স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি দেশটিতে স্বতন্ত্র স্থানীয় সরকার গঠন এবং উসমানি-সাম্রাজ্য থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে আন্দোলন করেন। আমির ফখরুদ্দিন কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং শক্তিশালী করেন তার অবস্থান। উসমানিরা তাদের বিপজ্জনক উত্থান ও প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তারা তাকে পাকড়াও করতে সেনাবাহিনী পাঠায় লেবাননের দিকে। আমির ফখরুদ্দিনকে ১৬৩৫ সালে গ্রেফতার করে তার সন্তানদেরসহ ইস্তাম্বুল পাঠানো হয়। সেখানে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

ফখরুদ্দিনের অবর্তমানে আমির বশির আশ-শিহাবি আল-কবির এই আন্দোলন বেগবান করেন। পাশাপাশি তিনি মিশরের শাসক মুহাম্মদ আলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। এতে আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তারা শাম-দেশে উসমানি-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে অবদান রাখেন। শেষে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ এবং মুহাম্মদ আলি সাহায্য প্রত্যাহারের ফলে ১৮৪১ সালে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আমির বশির ১৮৫০ সালে ইন্তেকাল করেন।[৩২৮]

➦ ইয়েমেনে উসমানিদের বিরুদ্ধে জায়েদি ইমামদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ চলতে থাকে। তুর্কিদের কঠোর হস্তে দমনের পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লব অব্যাহত ছিলো। ১৮৭২ সালে পুনরায় বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং ১৯১১ সালে ইয়েমেনের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এই বিপ্লব অব্যাহত ছিলো।

---

[৩২৭] দ্রষ্টব্য—ড. জামাল আবদুল হাদি, আদ-দাউলাতুল উসমানিয়া: ৮০

[৩২৮] *কিরাআতুন জাদিদাতুন ফি তারিখিল ইসমানিয়িন: ২০৯; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া দাওলাতুন ইসলামিয়াতুন মুফতারা আলাইহা: ১/১৮১*

পশ্চিম আরব তথা তিউনিসিয়া, লিবিয়া এবং আলজেরিয়ায় উসমানি-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে।

সংস্কার-আন্দোলনের অগ্রদূত

সেই সময়ে আবির্ভূত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কারবাদী আন্দোলন ছিলো মহান সংস্কারবাদী আন্দোলনের পুরোধা শেখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবের আন্দোলন। ('নাজদে সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলন এবং ইসলামি বিশ্বের তার প্রভাব' শীর্ষক শিরোনামে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।)

সংস্কারের আন্দোলনে যারা ধূর্ত ও দুর্নীতিবাজ শাসকদের বিরোধিতা করেছিলেন এবং ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সংবিধান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোর দাবি জানিয়েছিলেন, তারা হলেন:

মিদহাত পাশা

তিনি ১১২৮ হিজরি (১৮২২ ইং) সনে ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার বাবা হাফেজ মুহাম্মাদ আশরাফ ছিলেন একজন বিচারক এবং ধর্মীয় পণ্ডিত। সুতরাং শৈশবে বিদহাত বেড়ে ওঠেন উন্নত ও দ্বীনি পরিবেশে। পড়াশোনা করেন জামে আল-ফাহিতে। সেখানে ধর্মীয় পাঠ, ব্যাকরণ, বালাগাত, মানতিক এবং বিজ্ঞান বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা হতো। তুর্কি ও আরবি ছাড়াও তিনি ফারসি ও ফরাসি ভাষায়ও পাণ্ডিত্য রাখতেন।

মিদহাত পাশা ছিলেন তুরস্কের সংস্কার আন্দোলনের নেতা। তিনি বলতেন, স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের পথ ছেড়ে উসমানি-সাম্রাজ্য যত দিন ন্যায় বিচার এবং সঠিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে সাম্যনীতি, মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত না করবে, তত দিন তাদের নিস্তার নেই।

রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ভিত্তিতে সংস্কার প্রকল্প নিয়ে মিদহাত পাশা সুলতান আবদুল আযিয ও তার সফরসঙ্গীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এ-ঘটনার চাপ ও প্রভাবে মিদহাত পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয়। অভ্যন্তরীণ সংস্কারকার্য শুরু করায় সুলতান আবদুল আযিযের সঙ্গে আবারও সংঘর্ষে লিপ্ত হন তিনি। পরে তিনি পদ হারান।

১৮৭৬ সালে আবদুল আজিজের পর সুলতান হন আবদুল হামিদ। সে-সময় মিদহাত পাশাকে আবার প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন করা হয় এবং তিনি তার সংস্কার-আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তিনি ১১৯টি ধারাসমৃদ্ধ সংবিধান প্রণয়ন করেন। দুই স্তরবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠন করেন। একটিতে দেশের সাধারণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ প্রতিনিধিত্ব করবেন। 'মাজলিসুল মাবউসান' নামে এর নামকরণ করা হয়। আরেকটি পার্লামেন্টের নাম ছিলো 'মাজলিসুল আইয়ান'। কাউন্সিলর কর্তৃক নির্বাচিতরা এর সিনেট সদস্য হিসেবে নিযুক্ত থাকতেন। সাংবিধানিক আইনের চোখে উসমানি-সাম্রাজ্যের সকল নাগরিকের সমতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-অনুমতি, শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং জনগণের অর্থ অপচয় নিষিদ্ধের নীতি গ্রহণ করা হয়। এ-ছাড়াও সুলতানের ক্ষমতা সীমিত রাখা হয়। সংবিধানের এমন নীতি সুলতান আবদুল হামিদ দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং ১২৯৩ হিজরি (১৮৭৬ ইং) সনে একটি পাবলিক ফোরামে এটা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু খুব দ্রুতই সুলতান আব্দুল হামিদ-যিনি সুলতানের সর্বময়ী ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন—যিনি নিজেকে একক ক্ষমতার অধিকারী ভাবতেন, তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করতে থাকেন। সংস্কার-আন্দোলনের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় মিদহাত পাশার বিরুদ্ধে। মিদহাত দেশের বাইরে চলে যান। ঐক্য ও অগ্রগতি আন্দোলন চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত ত্রিশ বছর যাবৎ সংবিধান স্থগিত করা হয়েছিলো।

এরপর ১৯০৮ সালে সুলতান আবদুল হামিদকে দেশের সংবিধান পুনরুদ্ধারে বাধ্য করা হয়। পরে ১৯০৯ সালে আবারও বন্ধ হয় সংবিধান। একপর্যায়ে শাসনভার আসে সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদ রাশাদের হাতে।[৩২৯]

জামাল উদ্দিন আফগানি [৩৩০]

১২৫৫ হিজরি (১৮৩৯ ইং) সনে আসাদাবাদে (আফগানিস্তান) জন্মগ্রহণ করেন জামাল উদ্দিন আফগানি। তিনি বিশ্ববিখ্যাত আলেমদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান,

[৩২৯] দ্রষ্টব্য—জামাল আবদুল হাদি, *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া:* ১১০; ড. আলি হাসুন, *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া:* ২০৫-২০৬

[৩৩০] মৃত্যুর শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও জামাল উদ্দীন আফগানী আজও একজন শক্তিমান চিন্তাবিদ ও সংস্কারক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। বরং অনেক খ্যাতিমান লেখক, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বুদ্ধিজীবিরাও তার চিন্তাধারায় প্রভাবিত। এর অন্যতম কারণ তার বহুমুখী প্রতিভা এবং প্রভাব বিস্তারের ব্যতিক্রম ধারা। ফলে জীবদ্দশায় তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাড়া জাগাতে পেরেছেন। প্রভাবশালী একদল চিন্তাবিদ ও সংস্কারক গড়ে গেছেন। তাদের

জামাল উদ্দিন আফগানি ইসলামের আনুগত্য, বিদআত বর্জন, মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার এবং পাশ্চাত্যের আধিপত্য থেকে প্রাচ্যকে মুক্তির আহ্বান জানাতেন।

শেষে ১৮৭৯ সালে খাদবি ইসমাইলের যুগে মিশর থেকে তাকে বিতাড়ন করা হয়। পাশাপাশি তার জিহাদি আন্দোলনের সতীর্থ শেখ মুহাম্মাদ আবদুহকেও মিশর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। প্যারিসে তিনি এবং তার সঙ্গী আল-উরওয়াতুল উসকা পত্রিকা প্রকাশ করেন। একই সাথে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিতেন এবং প্রাচ্যকে রক্ষার চেষ্টা করে যেতেন। তারপর ১৮৯২ সালে সুলতান আবদুল হামিদের আমন্ত্রণে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য নিজ দেশে ফিরে আসেন। তিনি এখানে সকল মুসলিম-দেশের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করে যান। এর লক্ষ্য ছিলো—পশ্চিমা আধিপত্যবাদী আগ্রাসন থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

বিদগ্ধ আলেম ও সংস্কারক জামাল উদ্দিন আফগানি ৫৮ বছর বয়সে ১৮৯৭ সালে ইন্তেকাল করেন।[৩৩১]

শেখ মুহাম্মাদ আবদুহ [৩৩২]

শেখ মুহাম্মাদ আবদুহ ১২৬৬ হিজরি (১৮৪৯ ইং) সালে মিশরের নাসর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে

[৩৩১] দ্রষ্টব্য—*আস-সুলতান আবদুল হামিদ আস-সানি*: ১৮২; ড. মুহসিন আবদুল হামিদ, *জামালুদ্দিন আল-আফগানি আল-মুসলিহ আল-মুফতারা আলাইহি*: ১৩৭

[৩৩২] জামালুদ্দীন আফগানী যে চিন্তাধারা ও সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, মুহাম্মাদ আবদুহ ছিলেন সেটার পূর্ণাঙ্গ রূপকার। ফলে মেধা, প্রতিভা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত মুহাম্মাদ আবদুহও এক সময় উম্মাহর নেতৃত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যান। সন্দেহ নেই, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে মুহাম্মাদ আবদুহর লেখালেখি এবং সরাসরি অংশগ্রহণ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে মিসরের সমাজ ও শিক্ষা জাগরণে তিনি অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। পরবর্তীতে হাতে গড়া অসংখ্য ছাত্রের মাধ্যমে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে। জায়গা পান উম্মাহর সংস্কারকদের সারিতে। নিঃসন্দেহে তিনি মিসরে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যেটা লেখকের কথায় উঠে এসেছে। কিন্তু আরও কিছু কথা আসা দরকার।

অতিরিক্ত আকল-নির্ভরতা এবং আফগানীর সান্নিধ্য ও চিন্তাধারা তাকে অনেক ভুলে নিমজ্জিত করেছে। কুরআনের তাফসীরকে ইসরাইলী বর্ণনা মুক্ত করতে গিয়ে সালাফের অনেক তাফসীরকে ছুঁড়ে ফেলে কুরআনের ভুল তাফসীর পেশ করেছেন। আকলের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে গিয়ে আকলকেই

অধ্যয়ন করেন। তারপর ইলমে-তাওহিদ, যুক্তিবিদ্যা এবং নীতিশাস্ত্রের একজন উঁচুস্তরের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর দারুল উলুমে তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। সেখানে ইতিহাসের ক্লাসে—বিশেষত মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালদুন এবং তার দর্শনের ব্যাখ্যা করে খ্যাতি লাভ করেন। তার সমাজবিজ্ঞানের ক্লাসগুলোও ছিলো অতুলনীয়।

শেখ মুহাম্মাদ আবদুহ সামাজিক সংস্কার-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ আল-আহরাম পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়, যা মিশরে—বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের মাঝে একটি বড় প্রভাব ফেলেছিলো। জামাল উদ্দিন আফগানি মিশরে এলে শেখ মুহাম্মাদ আবদুহ তার সান্নিধ্যে গভীর নিষ্ঠায় জড়িয়ে থাকেন। তিনি তার দর্শনে গণমানুষের নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা লক্ষ করেন।

শেখ মুহাম্মাদ আবদুহ মিশরীয় পত্রিকা আল-ওয়াকায়ে আল-মিশরিয়ার সম্পাদক ছিলেন; এটাকে তিনি সমাজ-সংস্কারের নির্দেশিকা ও প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে আঠারো মাস কাজ করে যান। এরপর মিশরে আরব-বিপ্লবের পর বৈরুতে নির্বাসিত হন। চলে যান প্যারিসে। এ-সময় তিনি এবং তার শিক্ষক জামাল উদ্দিন আফগানির সাথে আল-উরওয়াতুল উসকা পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদন করেন। পরে ১৮৮৫ সালে আবার ফিরে আসেন বৈরুতে এবং সেখান থেকে ক্ষমা পাওয়ার পর মিশরে ফিরে যান। এখানে তিনি পুনরায় শুরু করেন তার তাজদিদি আন্দোলন। একসময় মিশরের মুফতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

সামাজিক ও শিক্ষাগত সংস্কার, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ, সংস্কারের উন্নয়নশীল পদ্ধতি, বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠু ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক

চিন্তার সম্বল বানিয়ে আজ তিনি আকলানীদের ইমাম বনে গেছেন। আরব জাতীয়তাবাদীদেরও বড় একটা অংশ তাদের মাল-মশলা গ্রহণ করেছে মুহাম্মাদ আবদুহর চিন্তাধারা থেকে। কাসেম আমীনের মতো ব্যক্তিরা তথাকথিত নারী মুক্তির ডাক দিয়েছে তার পথে হেঁটেই। আরব সেক্যুলারদের অনেকেই পাথেয় গ্রহণ করেছে তার ভাবনা থেকে। আফগানীর মতো তাঁরও পশ্চিম ও ইহুদিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল, বিপরীতে উসমানী সাম্রাজ্যের সঙ্গে ছিল বিরোধ ও শত্রুতা।

জামালুদ্দীন আফগানী ও মুহাম্মাদ আবদুহর নিয়ত নিয়ে সন্দেহ পোষণা না করলেও যে বাস্তবতা দুঃখজনক তা হলো, আধুনিক মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে মুতাজিলী ও আকলানী চিন্তাধারা, নস ও সুন্নাহর প্রতি বিরাগ ও বিতৃষ্ণা, হাদীস অস্বীকার ও আকল-পূজার মতো যেসব বিকৃতি ও বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো তাদের চিন্তাধারা থেকেই উদ্গত, তাদের ছায়ায় লালিত ও পালিত। -সম্পাদক

পরিপক্কতা বিষয়ে তিনি বহু বইপত্র লিখেছেন। ১৯০৫ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় মহান এই সমাজসংস্কারক ও ইসলামি দার্শনিক পরপারে চলে যান।

আবদুল রহমান আল-কাওয়াকাবি

তিনি সিরিয়ার হলবে একটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১২৬৫ হিজরি (১৮৪৯ খ্রি.) সনে জন্মগ্রহণ করেন। কাওয়াকাবিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। এখানে আল-আযহার মাদরাসার পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হতো। পড়াশোনা শেষে তিনি দুর্নীতি দমন এবং সমাজ-সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করে যান। ভ্রমণ করেন বহু মুসলিম-দেশ সেখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করেন। পরে সেইসব ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং তা হতে প্রাপ্ত শিক্ষা, তাৎপর্য ও গবেষণা বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর নিবন্ধ লিখেন; তাতে তিনি উসমানি-শাসনের সুব্যবস্থাপনা এবং সমাজশুদ্ধির প্রতি আকুল আহ্বান জানাতেন।

কাওয়াকাবি ছিলেন একজন বিদগ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদ, নদি এবং প্রাচ্য-মুসলিমদের আত্মশুদ্ধির একজন অগ্রসেনানি। উসমানি সুলতান আবদুল হামিদের যুগে অন্যান্য সংস্কারপন্থিদের মতো তাকে শাস্তি ও নির্বাসনের আওতায় আনা হয়েছিলো। তার সবচেয়ে বিখ্যাত বইগুলি হলো: কিতাবুল ইসতিবদাদ ও কিতাবু উম্মিল কুরা। ১৯০২ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মোঘল-সাম্রাজ্য

ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জহির উদ্দিন বাবর। যিনি উত্তর ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ-লক্ষ্যে বহু অভিযান ও যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী বীর ও আলেম। বাবরনামা নামে তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মুসলমানদেরকে দ্বীনকে অব্যাহত রাখতে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার উত্তরসূরিদের ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। ৯৩৭ হিজরি (১৫৩০ ইং) ৫০ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

মোঘল-সম্রাটগণ ভারতবর্ষের (বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ) নানা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। সম্রাট জাহাঙ্গির ও সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে এখানকার রাজ্যসমূহ মুসলমানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। বাণিজ্য ও শিল্পে ব্যাপক সমৃদ্ধি আসে। এ-সময় অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিলো। এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে আগ্রার তাজমহল, যা ১৬৩০ সালে শাহজাহান নির্মাণ করেছিলেন তার স্ত্রীর স্মৃতিস্মারক হিসেবে। এটি এখনো স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত বাণিজ্য-সনদের মাধ্যমে বৃটেন ভারতকে দখল করার আগ পর্যন্ত মোঘল-সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসার পর ভারতে ব্রিটিশ-প্রভাব শক্তিশালী করা হয়।

ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকীকরণ অব্যাহত ছিলো গত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এরপর নানা আন্দোলন ও বিদ্রোহের পর ভারতীয় জনগণ এবং পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৫ সালে স্বাধীন হয় ভারত। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয় পাকিস্তান।

ইউরোপীয়দের উত্থান

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি, খ্রিস্টীয় আঠারো শতাব্দীর শেষের দিক থেকে অবনতির অতলে হারিয়ে যেতে থাকে উসমানি-সাম্রাজ্য। ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব এবং পূর্ব ও পশ্চিম আরবের বিদ্রোহের ফলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা। ১৭৮৯ সালে নেপোলিয়ন বেনাপোর্ট মিশরে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। মিশর দখলের পাশাপাশি সেখান থেকে ভারতের নিয়ন্ত্রণও নিয়ন্ত্রণও তার উদ্দেশ্য ছিলো। কিন্তু নেপোলিয়নের পরিকল্পনা নস্যাত করার জন্য বৃটেন অ্যাডমিরাল নেলসনের কমান্ডের অধীনে নৌবহর পাঠায়। উল্লেখ্য, ১৮৬৭ সালের শুরুর দিকে মিশর পরিণত হয় স্বায়ত্তশাসিত একটি রাষ্ট্রে।

১৮৮২ সনে অ্যাংলো-ইজিপশিয়ান যুদ্ধের মাধ্যেমে মিশর ব্রিটিশদের অধীনে চলে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯১৯ সনে সংঘটিত মিশরীয় অভ্যুত্থানের পর মুহাম্মদ আলি রাজবংশের হাতে 'মিশর-রাজ্য' প্রতিষ্ঠা হয়—যদিও এই সময় মিশরের বহিরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এভাবে ১৯৫৪ সাল নাগাদ অ্যাংলো-ইজিপশিয়ান চুক্তিসহকারে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী হয়।

এর আগে ফ্রান্স ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া এবং ১৮৮১ সালে তিউনিশিয়ার দখল করে। ১৮৯০ সালে ইতালির নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়া। ১৮৬৮ সালে সুয়েজ খাল খোলার পর বৃটেন মিশরে হস্তক্ষেপ করে। এরপর দখল করে সুদান। ১৮০০ সালে মাসকাট ও ওমান উপকূল দখল করে। ১৮২০ সালের মধ্যে আরব-উপসাগরে ব্রিটিশদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এ-দিকে ফ্রান্স ১৯১২ সালে মরক্কোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং এর এক বছর পরই ইতালি দখল করে নেয় লিবিয়া।

এভাবে সমস্ত আরব-দেশ বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইতালির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এ-সময় উসমানি-সাম্রাজ্যের কোনো প্রভাব ছিলো না। আরব-বিশ্ব জুড়ে জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া ছিলো এক মর্মান্তিক ঘটনা। একশো বছর আগেও অধিকাংশ আরব-

অঞ্চল উসমানি খিলাফতের অংশ ছিলো। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি, উসমানি খিলাফত ছিলো একটি বিশাল বহুজাতিক রাষ্ট্র, যার কেন্দ্র বা রাজধানী ছিলো ইস্তাম্বুল। বর্তমানে আরব বিশ্বের মানচিত্র খুবই জটিল একটি গোলকধাঁধার মতো মনে হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের কিছু জটিল ঘটনা উসমানি-সাম্রাজ্যের পতন এবং নতুন জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটায়। নবসৃষ্ট এ-সব রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে বিভক্ত এবং মুসলিমদেরকে একে অন্যের থেকে আলাদা করে ফেলে। এই ঘটনার পেছনে অনেক কারণ থাকলেও, বৃটেনের ভূমিকা ছিলো সবচেয়ে বেশি। সে-সময়ে বৃটেনের ও পক্ষের সাথে সই-করা বিবদমান ৩টি আলাদা চুক্তিতে পরস্পরবিরোধী অঙ্গীকার ছিলো। চুক্তিগুলোর ফলে মুসলিম-বিশ্বের একটি বিশাল অংশ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। শত্রু-মিত্র নির্ণয়ের জটিল প্রক্রিয়া, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, ঔপনিবেশিক বাসনা ও সরকারগুলোর উচ্চপর্যায়ে অব্যবস্থাপনা প্রভৃতি মিলিয়ে এই প্রলয়ংকারী যুদ্ধের সূচনা ঘটে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলা এই যুদ্ধে প্রায় ১.২ কোটি লোক প্রাণ হারান। যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে ছিলো বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং অক্ষশক্তিতে ছিলো জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি।

প্রথম দিকে উসমানি-খিলাফত নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা, তারা যুদ্ধরত জাতিগুলোর মতো ততটা শক্তিশালী ছিলো না এবং নানা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যায় আক্রান্ত ছিলো। ১৯০৮ সালে শেষ শক্তিশালী খলিফা আবদুল হামিদ দ্বিতীয়কে '৩ পাশা' (তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী, নৌমন্ত্রী) উৎখাত করে এবং সামরিক শাসন জারি করে। এরপর থেকে খলিফা পদটি শুধু প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হতো। এই '৩ পাশা' ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ এবং পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী 'তরুণ তুর্কি' গ্রুপের সদস্য। অন্য দিকে উসমানিরা ইউরোপের নানা শক্তির কাছে বিরাট অঙ্কের ঋণের জালে আবদ্ধ ছিলো, যা পরিশোধে তারা ছিলো অক্ষম। এই ঋণ থেকে মুক্তি পবার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত উসমানিরা এই বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উসমানিরা প্রথমে মিত্রশক্তিতে যোগদানে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তীতে ১৯১৪ সালের অক্টোবরে অক্ষশক্তিতে যোগদান করে।

এর ফলে, বৃটেন তৎক্ষণাৎ উসমানি-খিলাফতকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীলনকশা করতে শুরু করে। বৃটেন ১৮৮৮ সাল থেকে মিশর এবং ১৮৫৭ সাল থেকেই ভারতকে দখল করে

নিয়েছিলো! উসমানি-খিলাফতের অবস্থান ছিলো বৃটেনের এই দুই উপনিবেশের ঠিক মাঝখানে। ফলে বিশ্বযুদ্ধের অংশ হিসেবে উসমানি খিলাফতকে উচ্ছেদ করতে বৃটেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

আরব-বিদ্রোহ শুরু হবার আগেই এবং শরিফ হুসেইন তার আরব-রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে বৃটেন ও ফ্রান্সের অন্য পরিকল্পনা করা ছিলো। ১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে, বৃটেনের স্যার মার্ক সাইকস ও ফ্রান্সের ফ্রান্সিস জর্জেস পিকোট উসমানি-খিলাফত পরবর্তী আরব-বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করতে গোপনে মিলিত হন।

বৃটেন ও ফ্রান্স পুরো আরব-বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়ার ব্যাপারে চুক্তি করে, যা পরবর্তীতে সাইকস-পিকোট চুক্তি নামে পরিচিতি লাভ করে। বৃটেন বর্তমানে জর্ডান, ইরাক, কুয়েত নামে পরিচিত এলাকাগুলোর দখল নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। ফ্রান্স পায় বর্তমান সিরিয়া, লেবানন ও দক্ষিণ তুরস্ক।

জায়নিস্টদের (জায়নবাদী) ইচ্ছাকে এখানে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়; সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ফিলিস্তিনের দখল নেওয়ার বিষয়টি পরবর্তীতে ঠিক করা হবে। বৃটেন ও ফ্রান্সের দখলকৃত অঞ্চলগুলোর কিছু কিছু জায়গায় আরবকে সীমিত মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন দেয়ার কথা থাকলেও ইউরোপীয় শাসন-ব্যবস্থাই তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল থাকে। চুক্তি অনুযায়ী, অন্যান্য এলাকায় বৃটেন ও ফ্রান্স সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করার অধিকার পায়। এভাবে উসমানি-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে, যা চারশো বছর ধরে খিলাফতের ধারা বা ইসলামি শাসনের পরম্পরার পরিচয়ে জীবন্ত ছিলো।

মুসলিম জনগণের সংগ্রাম

ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর জনগণ তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য বিশাল সংগ্রাম করে। মিশরে মিশরীয়রা সব উপায়ে বৃটিশ-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো। একপর্যায়ে ১৯২২ সালে মিশরের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় বৃটেন। মিশর একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৩ সালে প্রণয়ন করা হয় সংবিধান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা দুইবার মিশরে হস্তক্ষেপ করতে চায়। প্রথমবার ১৯৪৬ সালে তাদের পূর্বেকার চুক্তির আলোকে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫৪ সালে—অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় দুই বছর রাষ্ট্র পরিচালনার পর।

প্রাচ্যের মুসলিম-দেশগুলোতে ব্রিটিশ ও ফরাসি-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন অব্যাহত ছিলো, যতক্ষণ না তাদের রাজধানী স্বাধীনতা লাভ করেছিলো। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৩০ সাল থেকে বৃটেনের নিয়ন্ত্রণে ইরাক ১৯৫৫ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৬ সালে ফ্রান্সের ম্যান্ডেটের অধীনে-থাকা সিরিয়া ও লেবানন স্বাধীন হয়। একই বছর জর্ডান বৃটেন হতে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৬ সালে সুদানের স্বাধীনতা লাভ হয়।

ফরাসি-ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মরক্কোকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়। ১৯৫৫ সালে ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় দেশটি। ১৯৫৬ সালে তিউনিশিয়া স্বাধীন হয়। ১৯৬২ সালে স্বাধীন হয় আলজেরিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত লিবিয়া ইতালীয় ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিলো। বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী (ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকা) এতে প্রভাব বিস্তার করে। শেষে ১৯৫১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে লিবিয়া।

আরব-উপদ্বীপের মধ্যে কুয়েত ১৮৯৯ সাল থেকে ব্রিটিশদের অধীনে ছিলো। ১৯৬১ সালে কুয়েতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এ-দিকে দক্ষিণ আরব ১৮৩৭ সাল থেকে বৃটেনের নিয়ন্ত্রণে থাকে। শেষে ১৯৬৮ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। এভাবে পূর্ব-পশ্চিমের ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পায় এবং তারা ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি পায়।

ফিলিস্তিন এবং জায়নিজম

ফিলিস্তিন ছিলো উসমানি-সাম্রাজ্যের অধীনে। আরব-মুসলমানেরা ছিলো সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। উনিশ শতকের শেষ দিকে জায়নবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইহুদিদের চোখ পড়ে আরব ভূখণ্ডে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-থাকা ইহুদিরা ফিলিস্তিনে এসে বাসা বাধতে থাকে। তাদের সংখ্যা ক্রমে বাড়ে। সব কিছুর উদ্দেশ্য—আরব ভূখণ্ড দখল করে 'আবাসভূমি' গড়ে তোলা।

বিশ শতকের শুরুর দিকে উসমানি-সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের প্রভাব বাড়ায়। স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানিদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহে নামায় ব্রিটিশ সরকার। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইহুদিদেরও গোপনে আশ্বাস দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের তথাকথিত ইহুদি প্রশ্নের সমাধানকল্পে ব্রিটিশ সরকার স্বদেশের ইহুদিদের সাথে সমঝোতায় আসে এবং ১৯১৭ সালে 'বেলাফোর ডিক্লারেশন' (বেলফোর ঘোষণা) নামে ইতিহাসখ্যাত এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। যে-চুক্তি অনুসারে আরব-অধ্যুষিত তৎকালীন ফিলিস্তিনে ইহুদিদের স্থানীয়ভাবে বসবাসের জন্য সুনির্দিষ্ট একটা ভূমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইহুদিদের সাথে ব্রিটিশ সরকারের 'বেলফোর চুক্তি' করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি-সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে ফিলিস্তিন দখল করা, যা কৌশলগত কারণে ইহুদিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে অর্জন করা সম্ভব ছিলো না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর নবগঠিত 'লীগ অব নেশন্স' (বহুজাতি সংগঠন) ব্রিটিশ সরকারকে দখলকৃত ফিলিস্তিনের ওপর 'ম্যান্ডেট' (প্রশাসনিক ক্ষমতা) প্রদান করে—মূলত ব্রিটিশ সরকারের 'বেলফোর চুক্তি'কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিন নিয়ে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে বৈরিতা বেড়ে যায়। ফিলিস্তিনের ওপর ম্যান্ডেট ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার। একই সঙ্গে এই ভূ-ভাগ্য নির্ধারণে সদ্যগঠিত জাতিসংঘকে অনুরোধ জানানো হয়।

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনকে দ্বিখণ্ডিত করে পৃথক ইহুদি ও আর-রাষ্ট্রের পক্ষে ভোট দেয়। আরবদের বিরোধিতা

সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি এগিয়ে যায়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের নীলনকশায় ইহুদিদের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনের ম্যান্ডেট ছেড়ে দেয়। ওই দিনই ইহুদি-নেতারা ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন। পরদিন আরব-দেশগুলোর সঙ্গে ইসরাইলের যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হয়। উপরন্তু প্রস্তাবিত আরব-রাষ্ট্রের একটি বড় অংশ দখল করে ইসরাইল। সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়।

মিত্রদের সহযোগিতা ও আস্কারায় দিন দিন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে ইসরাইল। ষাটের দশকে পারমাণবিক বোমার মালিক বনে যায় তারা। দখলদারি ও বর্বরতার ব্যারোমিটার বাড়তে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইসরাইলের একগুঁয়েমি ও নৃশংসতায় ফিলিস্তিনে রক্তগঙ্গা বইতে থাকে। আরব-ইসরাইলের মধ্যে ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে আরও তিনটি যুদ্ধ হয়। এতে ফিলিস্তিনের ভাগ্যে দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। ইহুদিদের আগ্রাসন ও আরবদের প্রতি তাদের বৈরী আচরণের এ-হলো সংক্ষিপ্ত চিত্র।

এখনো ইসলামের কাণ্ডারীরা গাজা-উপত্যকায় মানবেতর জীবনযাপন সত্ত্বেও ইহুদি-আগ্রাসন প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় লড়াই করে চলেছেন।

নাজদে মহাসংস্কার-আন্দোলন

খ্রিস্টীয় আঠারো শতকের প্রথম দিকে একজন দ্বীনি আলেম আরব-উপদ্বীপে আবির্ভূত হন। তিনি হলেন শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব। তিনি ১১১৫ হিজরি (১৭০৩ ইং) সনে নাজদের উয়াইনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বীনি পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। কারণ, তার পিতা একজন বিশিষ্ট আলেম ও কাযি। তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মাযহাব অনুসারে ফিকহ অধ্যয়ন করেছিলেন। ভ্রমণ করেছিলেন বহু দেশ। এতে তিনি নিজেই মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। এ-সময় তিনি দেখতে পান তাদের অধঃপতনের কালো দাগ। শুনতে পান পরাজয়ের করুণ সুর। কীভাবে ইসলামি শিক্ষা হতে দূরে সরে ভয়াবহ বিদআত ও কুসংস্কার গ্রাস করেছিলো মুসলিম-বিশ্বকে, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব এই বিদআতগুলো থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তিনি জনগণকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি ইসলামের কোনো নতুন মতবাদের দিকে পরিচালিত করছেন না, বরং এক আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর দিকেই তার এ-আহ্বান। তার সংস্কার-আন্দোলনকে বেগবান করার ক্ষেত্রে তিনি দেখলেন, এ-ব্যাপারে রাজনৈতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এ-লক্ষ্যে তিনি (বর্তমান রিয়াদস্থ) দারইয়্যা অঞ্চলের প্রশাসক আমির মুহাম্মাদ বিন সৌদের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তোলেন। তিনি তার আহ্বানকে স্বাগত জানালেন এবং আরব-জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে এই সংস্কার-নীতিগুলো প্রচার করতে শুরু করলেন। কয়েক বছরের মধ্যে এটি আরব-উপদ্বীপে সৌদি-প্রশাসনের সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম সৌদি রাষ্ট্রের যুগে সংস্কার-আন্দোলন

১১৭৯ হিজরি (১৭৬৫ ইং) সনে প্রিন্স মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল আযিযের হাতে নেতৃত্ব আসে। তিনি ছিলেন দাওয়াতি ও সংস্কার-কাজে একজন

উদ্যোগী ও উদ্যমী ব্যক্তি। তিনি নাজদের সীমানা অতিক্রম করে আল আহসায় আক্রমণ চালিয়ে তা দখলে নেন। এভাবে আরব উপসাগরের রাজ্যগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে দাওয়াতি কার্যক্রম। তার বাহিনী ইরাক-সীমান্তের কারবালায় পৌঁছলে উসমানি সুলতানের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যায়। সুলতান তাদের আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য ইরাকে তার প্রশাসকদের সাহায্য তলব করেন। কিন্তু তারা আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হন।

১৮০৩ সালে প্রিন্স আবদুল আযিযকে হত্যা করা হয় এবং তার পুত্র প্রিন্স সৌদ উত্তরাধিকারী হন। তার সময়কালে সৌদি রাষ্ট্র তার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়। তিনি সৌদি আরব মুক্ত করতে সমর্থ হন। মক্কার গভর্নর শরিফ গালিব পালিয়ে যায় জেদ্দায়। প্রিন্স সৌদ ক্ষমতায় আরোহণে পর তাকে তার উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, হিজাযের শাসন-ব্যবস্থা আরব-উপদ্বীপে অগ্রসরমান নতুন সংস্কারবাদী আন্দোলনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

সৌদিরা ইরাকের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত রাখে এবং নাজাফ ও জুবায়ের এলাকায় আক্রমণ করে। এরপর তাদের অভিযান পরিচালিত হয় সিরিয়ায়। তারা সেখানকার হুরানের দক্ষিণে পৌঁছে যায়। উসমানি সুলতান এই আন্দোলনকে দমন করতে দামেশকের গভর্নরকে নির্দেশ দেন, কিন্তু তিনি তাদের দমন করতে পারেননি। সৌদিরা উসমানিদের কঠোরভাবে প্রতিহত করে। কেননা, তারা ইসলামি শরিয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতো না। ঘুষ ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলো তারা।

উসমানি সুলতান তখনকার চলমান সংস্কার-আন্দোলনের অবসান ঘটানোর জন্য মিশরের গভর্নর মুহাম্মদ আলির সাহায্য কামনা করেন। তিনি একদিকে সুলতানকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং অন্য দিকে আরবদের সম্প্রসারণবাদী আন্দোলন দমানোর জন্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ-লক্ষ্যে তিনি আরব-উপদ্বীপে ১৮১১-১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। একপর্যায়ে তিনি হিজায পুনরুদ্ধার করেন। ১৮১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ইবরাহিম পাশার এই দমন-অভিযান সম্পন্ন করেন। প্রিন্স আবদুল্লাহ বিন সৌদকে—যিনি পিতা সৌদ আল-কবিরের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, কন্সটান্টিনোপলে পাঠানো হয়; সেখানে তাকে ১২৩৩ হিজরি (১৮১৭ ইং) সনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

এর অর্থ এই নয় যে, উসমানি-সাম্রাজ্য সংস্কা-আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পেরেছে। ১৮৪০ সালে মুহাম্মাদ আলি তার উপসাগরীয় এলাকা থেকে সেনা

প্রত্যাহারের সাথে সাথে সৌদিরা তাদের শাসন ফিরে পান এবং ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

ইবনে ওয়াহাবের সংস্কার-আন্দোলনের প্রভাব

- আন্দোলনটি আধুনিক যুগে ইসলামি বিশ্বের উদ্ভূত সকল সংস্কার আন্দোলনের উৎস।
- আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া বিদআত ও কুসংস্কার দূর করতে সফল হয়েছিলো। এই বিদআত ও কুসংস্কার প্রায়শই মুসলিম জাতির পতন ঘটিয়ে থাকে।
- আন্দোলন ইসলামি দেশগুলিতে—বিশেষত মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান এবং ভারতবর্ষে দারুণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।
- আন্দোলনের মাধ্যমে একটি বিশাল ইসলামি রাষ্ট্র গঠন সম্ভব—এই বাস্তবতা পরীক্ষিত হয়।
- উলামা পরিষদের সভা-সেমিনার ও কাউন্সিলগুলোতে অনুষ্ঠিত বিতর্ক ও আলোচনা দ্বারা একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ঘটে। দীর্ঘ দিন ধরে বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তার পর আরবে ইসলামি জাগরণের লক্ষ্যে এর প্রয়োজনীয়তা ছিলো অপরিসীম।
- আরব-উপদ্বীপে ইসলামি আইনের শাসন চালু হয়। এর মাধ্যমে দুর্নীতির অবসান ঘটে। শান্তি ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়।[৩৩৩]

দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্র

প্রিন্স ফয়সাল ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত শাসন করেছেন। এরপর উসমানিরা তাকে মিশরে নির্বাসন দেয়। তিনি সেখানে পলাতক থাকেন। বহু দুঃখ-কষ্টের পর তিনি নাজদে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি স্বদেশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। তার সময়ে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিলো। ১৮৪৩ সালে তার প্রভাব আরও বেড়ে যায়। এরপর আরবের বেশির ভাগ উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণ তিনি গ্রহণ

[৩৩৩] ড. ইবরাহিম জুমআ, *আল-আতলাস আত-তারিখি লিদ-দাওলা আস-সাউদিয়্যাহ;* ড. ইসমাইল আহমাদ ইয়াগি, *তারিখুল আলাম আল-ইসলামি:* ৬৩-৭৮

করেন। আল-আহসা, কাতিফ ও আসির পর্যন্ত তার দেশের বিস্তৃতি ঘটে। ২২ বছর ধরে তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে দেশ পরিচালনা করেন।

১৮৬৫ সালে ফয়সাল বিন তুর্কি মারা গেলে দেশটি আবার বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তার পুত্র আবদুল্লাহ ও সৌদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। তুর্কিরা এই সুযোগটি কাজে লাগায় এবং আহসা এলাকা দখল করে উসমানি-সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করে নেয়।

১৮৭৪ সালে সৌদ বিন ফয়সালের মৃত্যু হলে রিয়াদে তার ভাই আবদুর রহমান আমির হন। এ-সময় আমিরদের মধ্যে যুবরাজদের ব্যাপারে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তুরস্ক এখানে হস্তক্ষেপ করে। শেষে বিন রশিদ রিয়াদে ফিরে আসেন এবং নাজদের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

তৃতীয় সৌদি রাষ্ট্র

প্রিন্স আবদুর রহমান বিন ফয়সাল আলে রশীদের ছত্রছায়ায় জীবন কাটানো সম্ভব ছিলো না প্রিন্স আব্দুর রহমান বিন ফয়সালের। কারণ এই আলে রশীদ একদা আলে সউদের ফরমান-বরদার ছিলো। এখন তারাই শাসক হয়ে গেছে। ফলে আব্দুর রহমান তার পরিবার নিয়ে রবউল- খালী অঞ্চলে চলে যান। সেখানে বনু মুররার কাছে কিছুদিন কাটানোর পরে কাতার চলে যান এবং সেখান থেকে চলে যান কুয়েতে। কুয়েতে ১৩০৯ হিজরি মাফিক ১৮৯১ সনে শেখ মুবারক আল-সাবাহর পরিবারের সদস্যদের আতিথেয়তা বরণ করেন।

সৌদ-পরিবারকে আবদুল আযিযের সমর্থন

আবদুল আযিয যখন তার পিতা আবদুর রহমানের সাথে কুয়েতে পৌঁছেন, তখন তিনি ছিলেন বারো বছরের কিশোর। তার জন্য এ-সময়টি ছিলো বেশ কঠিন। এই অঞ্চলে চলমান বিচিত্র ভূমিকা-পালনকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক স্রোত তিনি স্বচক্ষে দেখেন। তার পরিবারের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশাও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কিশোর বয়সে যা তিনি দেখেছিলেন, তা ভুলে যেতে পারেননি। তাই অবশেষে নিজ পূর্বপুরুষদের নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেন।

রিয়াদের নিয়ন্ত্রণ

আবদুল আযিয কুয়েতে অস্থায়ী জীবনযাপনে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, হয়তো সৌদ-পরিবারের দেশ পুনরুদ্ধার করবো, অন্যথায় এ-লড়াইয়ে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করে নেবো।

এ-লক্ষ্যে তিনি অনূর্ধ্ব চল্লিশজন লোক নিয়ে ১৯০১ সালের শেষ দিকে রিয়াদের উদ্দেশে কুয়েত ত্যাগ করেন। শহরের নিকটবর্তী হয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা সাজান।

১৯০২ সালের জানুয়ারিতে তার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন জালবিসহ দশজন লোক নিয়ে রাতে অনুপ্রবেশ করেন এবং অবশিষ্ট ত্রিশজনকে শহর প্রাচীরের বাইরে রাখেন। এরপর রিয়াদের আমির আজলানখ্যাত বিন রশিদের ডেপুটিকে হত্যা করতে সক্ষম হন। রিয়াদের জন্য এটি ছিলো এক অবাক কাণ্ড। তারা প্রিন্স হিসেবে আবদুল আযিযকে মেনে নিতে জোর দাবি জানায়। সৌদি রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের ধারায় এটি ছিলো সংগ্রামের প্রথম বিজয় এবং নাজদ পুনরুদ্ধারের সূচনা।

এরপর একের পর এক এলাকা নিয়ন্ত্রণে আসতে থাকে। এ-দিকে উসমানি-সাম্রাজ্যের পক্ষ হতে রশিদের সমর্থনে ১৯০৪ সালে আক্রমণ চালানো হয়। এই সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয় ইরাক থেকে। আবদুল আযিয তার সহযোগীদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী সজ্জিত করেন; এর নাম ছিলো 'আল-ইখওয়ান'।

দালাম এলাকায় এই বাহিনী রশিদের বাহিনীকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করে। আফলাজ, হুতা ও ওয়াদিয়ে দাওয়াসির অঞ্চল তাদের হস্তগত হয়। এরপর নিজেদের সীমানা বাড়তে থাকে উত্তরের দিকে। একপর্যায়ে আল-কাসিম এলাকাও তাদের হস্তগত হয়। এভাবে আবদুল আযিয বিন আবদুর রহমান আল সৌদ নাজদের শহরসমূহের অধিকার লাভ করেন।[৩৩৪]

[৩৩৪] *Encyclopædia Britannica Online: History of Arabia*, retrieved 18 January 2011.

সৌদি আরব

সৌদি রাজ্যটি এভাবে কিংডম অব সাউদি আরাবিয়া হয়ে ওঠে। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে একটি রাজকীয় ডিক্রি জারির মাধ্যমে প্রিন্স আবদুল আযিয কর্তৃক আরব উপদ্বীপে শুরু হয় নতুন যুগের সৌদি আরব।

প্রিন্স আবদুল আযিযের যুগে নবজাগরণ

প্রিন্স আবদুল আযিয মহান সংস্কারের ধারার পুনর্জন্ম দেন। দেশ-বিদেশের জনগণ দ্বারা রাষ্ট্রগঠনে তৎপর হন। আরব ও ইসলামি দেশগুলোর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

কুরআন ও ইসলামি আইনের বিধান প্রয়োগ করে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। দূর করা হয় জাতি ও গোত্রগত বিরোধ। নিরাপদ রাখা হয় হাজীদের হজব্রত কার্যক্রম। বেদুইনকে স্থিতিশীল করতে নির্মাণ করা হয় গ্রাম। প্রতিষ্ঠা করা হয় স্কুল ও হাসপাতাল।

এভাবে প্রিন্স আবদুল আযিয আলে সৌদ তার গভীর বিশ্বাস, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে সৌদি আরবকে ইসলামি আইনের নীতিমালা ও আধুনিক নবজাগরণের ভিত্তিতে পুনঃনির্মাণে সফল হন।

১৩৭৩ হিজরির রবিউস সানি মোতাবেক ৯ নভেম্বরে ১৯৫৩ সালে এই মহান শাসক ইন্তেকাল করেন। তাকে সত্যিকারভাবে আরব রাষ্ট্রের নির্মাতারূপে মহিমান্বিত করা হয়। তারপর তার পুত্র সৌদ তার উত্তরাধিকারী হন। ১৯৬৪ সালে প্রিন্স সৌদের গুরুতর অসুস্থতা দেখা দেয়। এটা তাকে ভীষণ দুর্বল করে দেয় এবং তাকে সরকারের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখে।[৩৩৫]

প্রিন্স ফয়সাল বিন আবদুল আযিয

১৩৮৪ হিজরির (১৯৬৪ ইং) রজব মাসে সৌদি আরবের প্রিন্স হিসেবে অভিষিক্ত হন ফয়সাল বিন আবদুল আযিয। তিনি ছিলেন সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা ও ধর্মীয় সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবের অনুসারী আবদুল আযিযের দ্বিতীয় পুত্র।

[৩৩৫] *Encyclopædia Britannica Online: History of Arabia* retrieved 18 January 2011.; al-Rasheed, মাদাবি, *এ হিস্টোরি অব সৌদি আরব* (Cambridge University Press, 2002).

তার মা ছিলেন নাজদের বিশিষ্ট আলেম শেখ আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল লতিফ আলে শাইখের (অর্থাৎ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব র. এর বংশের) কন্যা। প্রিন্স ফয়সাল অনন্য গুণাবলি ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তার গঠনমূলক নীতিমালা তাকে একজন বিজ্ঞ নেতা বানিয়েছে। তিনি আরব ও মুসলমানদের প্রত্যাশা পূরনে সচেষ্ট ছিলেন। তার শাসনামলে দেশের সংস্কারবাদী নবজাগরণ ও দ্বীনি চেতনা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

মানচিত্র

বিশ্বে ইসলামের বিস্তার

ইসলাম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পন্থায় এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং ভূমধ্য দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয়-অভিযানের ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় এবং বৃহত্তর মুসলিম-সম্প্রদায়ের সাথে সংমিশ্রণ।

ইসলাম সব মানুষের জন্য সমানভাবে হেদায়াতের বার্তা নিয়ে এসেছে। ইসলাম এমন রিসালাত নিয়ে এসেছে, যা প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীকে এক উম্মত বলে আখ্যা দেয়। জাতীয়তা বা আঞ্চলিকতার পার্থক্য এখানে নেই। ধর্মীয় বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা ও শান্তিতে তারা সবাই এক জাতি।

ইসলামধর্ম জ্ঞান ও অগ্রগতির ধর্ম। ইসলামি শরিয়ত একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা; এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, অধিকার ও কর্তব্যের প্রেরণা পাওয়া যায়। বংশ, জাতি ও বর্ণের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নির্ণয় ছাড়াই মানুষের মধ্যে ন্যায় ও সমতার শিক্ষা দেয় ইসলাম। একই সাথে আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতি আহ্বান জানায়। শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমনের নির্দেশ দেয়। হকের ঝাণ্ডা উঁচু করে তুলে ধরা এবং নির্যাতিতদের পক্ষে কথা বলার আহ্বান জানায়। এই নীতিগুলো চিরন্তন ইসলামের দাওয়াতের মূল ভিত্তি।

এশিয়া

খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে লেভান্ট (শাম-দেশ), ইরাক ও পারস্যে ইসলামের বিস্তার লাভ করে। এরপর মা-ওয়ারাউন নাহার ও উত্তর ভারতে উমাইয়া-যুগে বিশেষত খলিফা আল-ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের শাসনকালে ইসলামের সুবাস ছড়ায়। তার খিলাফতকালে বিখ্যাত সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম বাহিলির হাতে বিজিত হয় ট্রান্সঅক্সিয়ানা। তিনি সেখানকার পৌত্তলিকদের মূর্তিগুলো ধ্বংস করেন এবং বোখারা, সমরকন্দ ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। মুসলমানদের

মাধ্যমে চিনেও পৌঁছে যায় ইসলামের আওয়াজ। মুহাম্মদ বিন কাসিম সাকাফির নেতৃত্বে মুসলমানরা সিন্ধুপ্রদেশ জয় করে। তারা দেবল শহর (বর্তমান করাচি) ও মুলতান শহরের পৌত্তলিক মন্দিরগুলোর মূর্তি ধ্বংস করে এবং ইসলামের রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করে।

আব্বাসীয়দের যুগে ইসলামি বিজয়-অভিযান অব্যাহত ছিলো। খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের প্রেরিত ইসলামি সেনাবাহিনী কর্তৃক বিজিত হয় নতুন বহু এলাকা, যা কাশ্মির পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ-সব এলাকায় ইসলামের বিকাশ ও প্রচার ঘটে।

ইসলামি সাম্রাজ্যের যুগে পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে গজনিতে ও ভারতের উত্তরের প্রদেশগুলোতেও ইসলামের বিস্তার ঘটে এবং এর প্রভাব সে-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে একসময় ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় মোঘল-সাম্রাজ্য; যার অধীনে ভারত-পাকিস্তানের সর্বত্র ইসলামের সুশীতল বায়ু বয়ে যায়।

এ-দিকে, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে চিনে মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীরা চিনের বন্দরগুলোতে তাদের বহনকৃত পণ্য নিয়ে আসেন। অনেক মুসলমান এখানে বসতি স্থাপন করে। সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং বিপুল সংখ্যক চিনা নাগরিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

গোটা ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম দৃঢ়ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম পর্যায়ে মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তা সুমাত্রা ও জাভার দ্বীপগুলোর উপকূলে বসতি স্থাপনকারীদের কাছে প্রবেশ করে। তারপর তাদের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে তা ছড়িয়ে পড়ে সপ্তম হিজরি শতাব্দী তথা ত্রয়োদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে।

তারপর তারা ইসলাম-প্রচারকদেরকে ইসলামি শিক্ষা শেখানোর জন্য নিয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়া থেকে বহু দল ফিকহ ও উসুলে দ্বীন অধ্যয়ন করার জন্য মক্কা আসে এবং তারা তাদের দেশে ফিরে দ্বীন প্রচারে অবদান রাখে।

চিন ও সুমাত্রার বন্দর এলাকায় বসতি স্থাপনকারী ইসলাম-প্রচারকদের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করে। এখানে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের ব্যবসা শক্তিশালী হয়েছে। তারা দেশের মানুষের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছে।

আফ্রিকা

মিশর ও উত্তর আফ্রিকার (আরব মাগরিব) মাধ্যমে আফ্রিকায় ইসলাম প্রবেশ করে। মুসলিম শাসকদের দাওয়াতি কার্যক্রম, সে দেশের মানুষের সাথে তাদের সংমিশ্রণ, আরব ও মুসলিম বারবারদের অভিবাসন এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ফলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এই মহাদেশে।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর দিকে পশ্চিম আফ্রিকা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। এখানে বারবার উপজাতিরা বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানান্তরিত হয়, যারা সেনেগালে ইসলামের বিস্তারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলো।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে (একাদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দী) মরক্কোর মুরাবিতিন শাসকগণ পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলাম বিস্তার ও ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তারা নাইজার নদীর তীরে তিম্বকতু শহর প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ইসলামের শিক্ষা তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ইসলাম-প্রচারকদের মাধ্যমে নাইজেরিয়াও ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের দাওয়াত। সেখানকার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ইমান গ্রহণ করে।

মিশর থেকে সুদানে ইসলাম প্রবেশ করে। এখানে বেশ কয়েকটি আরব-উপজাতি বসতি স্থাপন করেছিলো। হিজরি অষ্টম শতাব্দীতে দারফুরের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের দেশে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। এ-দিকে, পূর্ব আফ্রিকায়—বিশেষত হাবশায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকে ইসলাম প্রবেশ করেছে। কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির লক্ষ্যে হাবশা (আবিসিনিয়া) অভিমুখে হিজরত করেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম ﷺ।

হিজরি সপ্তম শতাব্দীর সময় এই দেশে আল্লাহর দ্বীনের বিস্তার ঘটে। আরব-উপদ্বীপের উপকূলীয় গোষ্ঠীসমূহের যাতায়াত এবং বিশ্বাসগত চিন্তাধারা মতবিনিময়ের ফলে হাবশার বহু মানুষকে ইসলাম আপন পথ দেখায়।

সোমালিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকান উপকূলীয় দেশগুলোতে প্রাচীনকাল থেকে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন এবং মুসলিম আলেমগণ অভিবাসিত হয়েছেন। তাদের এই অভিবাসনের ফলে এখানে ইসলামের সুবাতাস ছড়িয়ে পড়ে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁয় ইসলামি সভ্যতা

ইসলামের অমিয় শান্তির বার্তা ও তার অনন্য সামাজিক ব্যবস্থার বদৌলতে আরবরা এশিয়া মহাদেশ, ভূমধ্য দ্বীপ, উত্তর-আফ্রিকা এবং আন্দালুসিয়ার বৃহত্তম অংশ বিজয় করে এবং একটি অনন্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করে। পৃথিবীর বহু জাতি-গোষ্ঠী প্রভাবিত হয় ইসলামের উত্থান ও মুসলমানদের চলনে।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম দিকে আরবরা যখন স্পেন জয় করেছিলো, তখন তারা এটিকে একটি বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ এবং ইসলামি বিজ্ঞানাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আন্দালুসিয়া ও সিসিলির মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতা থেকে আহরিত সম্পদ দ্বারা ইউরোপের বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভাবিত হয়। এরা এখান থেকে ব্যাপক উপকার ভোগ করে এবং এভাবে একটি আধুনিক রেনেসাঁ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ মুসলিম পণ্ডিত ও দার্শনিকদের তত্ত্ব ও তথ্য ব্যবহার করে। মুসলমান বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের কাজগুলো ল্যাটিন, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি, জার্মান, রাশিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ান ইত্যাদিতে অনুবাদ করা হয়।

রেনেসাঁয় প্রভাববিস্তারী মুসলিম-মনীষা

মুহাম্মাদ বিন মূসা আল-খাওয়ারিজমি হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী) একজন বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তার লেখা বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত বইগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিলো এবং তা ইউরোপের ইনস্টিটিউটগুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তন্মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ম্যাপের এবং বীজগণিতের সূত্রবিষয়ক বইটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খ্রিস্টীয় নবম শতকে গণিত ও জ্যামিতি-শাস্ত্রের সূত্র সংস্কারে সাবিত বিন কুররার [৩৩৬] অবদান অপরিসীম। গণিত ও জ্যামিতি-বিষয়ক বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে তার।

জাবির বিন হাইয়ান হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর রাসায়নিক বিজ্ঞানী। তিনি কেবরিটেক এসিড ও নাইট্রিক এসিডের সংশ্লেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। আর-রাহমাহ নামে তার একটি বইও রয়েছে; যার মধ্যে ধাতব রূপান্তর পদ্ধতি এবং স্বর্ণ ও রুপা ইত্যাদি গলানোর কলাকৌশলের বিবরণ রয়েছে।

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর আরব দার্শনিক ছিলেন আবু ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিনদি। ঔষধ, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতের বেশ কয়েকটি বই রয়েছে তার। গ্রিক ভাষাতেও স্বচ্ছন্দ ছিলেন এবং গ্রিক বিজ্ঞানীদের কিছু বইয়ের অনুবাদও তিনি করেছিলেন, যা পরে ল্যাটিন রূপান্তর করা হয়েছিলো।

আবু নাসর আল-ফারাবি খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন সেরা বিজ্ঞানী। গ্রিকের অ্যারিস্টটলের পরে তাকেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সমাজবিজ্ঞান, ঔষধ, ইসলামি দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ লিখেছেন।

খ্রিস্টীয় এগারো শতকের প্রথমার্ধে ইবনে সিনা 'প্রিন্স অফ সায়েন্স' উপাধিতে ভূষিত হন। ঔষধ, দর্শন, প্রকৃতি এবং গণিতের তার বিভিন্ন বই রয়েছে। তার চিকিৎসা-সংক্রান্ত বই আল-কানুন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ।

মুহম্মাদ বিন যাকারিয়া আল-রাযি দশম শতাব্দীর মেডিসিনশাস্ত্রের একজন খ্যাতনামা পথিকৃত। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আল-হাবি নামে তার একটি বিশ্বকোষ আছে, যা ত্রিশটি ভলিউমে সমাপ্য; বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তা মুদ্রিত হয়েছে।

খ্রিস্টীয় এগারো শতকের একজন মহান ইসলামি দার্শনিক হলেন আবু হামিদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাযালি। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সুফি। তার বহু গ্রন্থ রয়েছে, যা ল্যাটিন, জার্মান এবং স্লাভিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আরব, মরক্কো এবং আন্দালুসিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে যারা আরব ও ইসলামি সভ্যতায় অবদান রেখেছেন এবং ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে যাদের রচনাসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে, তারা হলেন:

[৩৩৬] তিনি ছিলেন তারকাপূজারী (আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া) - *সিয়ারু আলামিন নুবালা।*

খ্রিস্টীয় এগারো শতকের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক আলি বিন হাযাম। তিনি আন্দালুসিয়ার কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাস, ধর্ম, যুক্তি, দর্শন ও কবিতা-বিষয়ক তার কয়েক ডজন বই রয়েছে; তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নাহল।

আবু আবদুল্লাহ আল-ইদ্রিসি। হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) বিশিষ্ট ভূগোলবিদ। তিনি ছিলেন আন্দালুসিয়ান। তিনি রৌপ্যের একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন; তাতে সেই সময়ে পরিচিত সমস্ত দেশের ছবি আঁকা ছিলো।

আরব-দার্শনিক ইবনে রুশদ বুদ্ধিজীবী দাশনিক হিসেবে সমধিক খ্যাত ছিলেন। তিনি ১১২৬ সালে কর্ডোভাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের বইয়ের ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। তার বহু গ্রন্থ তিন শতাব্দী ধরে পড়ানো হয় ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। রুশদের মতে, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে দুটি যুক্তিই যথেষ্ট।

একটি হচ্ছে, দূরদর্শিতার যুক্তি। পৃথিবীর সব কিছুই আদতে মানুষের ব্যবহারের জন্যই সৃষ্টি। চাঁদ, সূর্য, গাছপালা, পশুপাখি, মাটি, পানি, বায়ু এবং দেখা-অদেখা সব কিছুই যেন এক চূড়ান্ত সুরের মূর্ছনায় প্রতিনিয়ত বিমোহিত করে চলেছে মানবজাতিকে। এমন নিখুঁত সুর যেহেতু অস্তিত্ববান, তা হলে এর সুরকার তো কেউ একজন অবশ্যই আছেন!

দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে, উদ্ভাবনের যুক্তি। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত আমরা যা দেখি বা ব্যবহার করি, সব কিছুই কারও না কারও দ্বারা উৎপাদিত। ঠিক তেমনি মানুষ বা পশুপাখিও এমনি এমনি পৃথিবীতে চলে আসেনি। কেউ একজন সেগুলো তৈরি করেছেন অবশ্যই। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আল্লাহ।

ইবনে খালদুন ১৩৩২ সালে তিউনিশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৌদ্দ শতকের একজন মুসলিম ইতিহাসবেত্তা, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং সর্বোপরি একজন দার্শনিক। তাকে আধুনিক ইতিহাস-রচনা, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির অন্যতম একজন জনক বলা হয়। মুকাদ্দিমাহ নামের যে-অমর বইটি তিনি রচনা করছিলেন সে-মধ্যযুগে বসে, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনে খালদুনকে আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। কেননা, তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সামাজিক বিজ্ঞানের একেবারে নতুন একটি ধারা, 'সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান'-এর সূচনা করেন। অন্য দিকে মানব-সমাজের

উন্নয়নের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সীমা নির্ধারণে রয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আবার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি অভূতপূর্ব দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজনই কেবল ইতিহাস লেখাকে নির্ভুল করার জন্য এর উৎসের ওপর জোর দিয়েছিলেন। ইবনে খালদুন তাদের মধ্যে একেবারে উপরের দিকেই থাকবেন।

স্পেনে শাশ্বত ইসলামি পয়গামের আলোকে আরবদের দ্বারা গৃহীত সংস্কৃতি ও সভ্যতার মশাল ইউরোপে নবজাগরণের উত্থানের পথ তৈরি করেছে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। আন্দালুসিয়ায় তারা জয়লাভ করে। তেরো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্রানাডায় এবং ১৪৯২ সাল পর্যন্ত সিসিলিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন ও শরিয়া-বিভাগ গঠন করে। আরব-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সেই সময়ে গোটা ইউরোপ থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করেছিলো। তাদের মাধ্যমে সে-সব দেশে শিল্প, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ উন্মোচিত হয়।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি আরব-বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালীয়, রাশিয়ান এবং স্লাভিক ভাষার গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূগোল-বিজ্ঞানের পরিভাষার সাথে আরবি শব্দগুলো সুসামঞ্জস্য দ্বারা এর প্রমাণ জোরালো হয়।

আরবরা এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পদের পাশাপাশি কাগজ, স্থাপত্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য ইসলামি শিল্পকলায় ইউরোপের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলো। মোটকথা, ইসলাম জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর ধর্ম বলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বসভ্যতাকে নতুন সাজে সজ্জিত করেছে।

খ্রিস্টীয় এগারো শতক হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানচর্চার অপরাধে পাশ্চাত্য যেখানে ৩৫ হাজার মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, সেখানে অষ্টম শতক হতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ছিলো মুসলমানদের বিজ্ঞানচর্চা ও আবিষ্কারের স্বর্ণযুগ। আমাদের আলোচ্য মুসলিম বিজ্ঞানীরা যখন পৃথিবীকে আলো ছড়াচ্ছিলো, তখন সে-আলোতে স্নাত হচ্ছিলো অন্ধকার ও ঘুমন্ত ইউরোপ। ইউরোপীয় ছাত্ররা তখন স্পেন ও বাগদাদের মুসলিম-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের পদতলে

দলে জ্ঞান আহরণ করছিলো। মুসলিম বিজ্ঞানীদের এই ইউরোপীয় ছাত্ররাই জ্ঞানের আলোক নিয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

১৩৫০ সালের পর মুসলমানদের বিজ্ঞানচর্চায় গৌরবময় সূর্য অস্তমিত হয় এবং পাশ্চাত্যের কাছে হারতে শুরু করে মুসলমানরা। অবশ্য এর পরেও মুসলমানদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চমক কখনো কখনো দেখা গেছে। তবে বিজ্ঞানে ছয়শো বছরের যে-মুসলিম অবদান, তা ছিলো আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং বিজ্ঞান-রেনেসাঁর উৎসমুখ।

মুসলমানরা ছিলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষারও জনক। গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নও ইসলামি সভ্যতার অবদান। মুসলিম-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিলো লাখো গ্রন্থ ঠাসা। ব্যক্তিগত লাইব্রেরির তখন ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিলো। মুসলিম-বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারসমূহ ছিলো বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সূতিকাগৃহ।

বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ছিলো মুসলমানদের গৌরবজনক বিচরণ। গণিত শাস্ত্রে রয়েছে মুসলমানদের মৌলিক অবদান। মুসলিম বিজ্ঞানীরাই চিকিৎসাবিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞানে রূপ দান করেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরাই চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের কক্ষ নির্ধারণ করেন।

অতি গুরুত্বপূর্ণ কম্পাস যন্ত্র মুসলিম বিজ্ঞানীর আবিষ্কার। মুসলমানরা নকশার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য এবং শিল্প-কৌশলের পূর্ণতা বিধানে ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতির কাজে তারা ছিলো দক্ষ। বস্ত্র-শিল্পে এখনো মুসলমানদের কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।

উত্তম কাচ, কালি, মাটির পাত্র, নানা প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করা-সহ রং পাকা করার কৌশল ও চর্ম সংস্কারের বহুবিধ পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলিম কৌশলীরা ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। তাদের এ-সব কাজ ইউরোপে খুব জনপ্রিয় ছিলো।

সিরাপ ও সুগন্ধি দ্রব্য তৈরিতে মুসলমানদের ছিলো একাধিপত্য। মুসলমানদের কৃষিপদ্ধতি ছিলো খুবই উন্নত। তারা স্পেনে যে-কৃষিপদ্ধতির প্রচলন করেন, ইউরোপের জন্য তা তখনও বিস্ময়। তাদের ছিলো উৎকৃষ্ট পানিসেচ-পদ্ধতি। মাটির গুণাগুণ বিচার করে তারা ফসল বপণ করতেন। সারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা জানতেন। ‘কলম’ করার ও নানা প্রকার ফল-ফুলের উৎপাদন কৌশল-উদ্ভাবনে তারা ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ।

[illegible] শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা বাণিজ্য-জগতের ছিলো একচ্ছত্র সম্রাট। নৌযুদ্ধে তারা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তারা ছিলেন অতুলনীয় সমুদ্রচারী। তাদের জাহাজ ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত সাগর ও চীন সাগরে একক ভাবে চষে ফিরতো। মুসলিম নাবিকদের ছাত্র হিসেবেই ইউরোপীয়রা গভীর সমুদ্রে প্রথম পদচারণা করে। মুসলমানদের যুদ্ধপদ্ধতি ও যুদ্ধবিদ্যাও ইউরোপকে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করে। ইউরোপের স্পেনীয় মুসলিম-বাহিনীর অনুকরণ।

মোটকথা, বলা যায়, মুসলমান ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় যে অবদান রাখেন, তা এক নতুন সভ্যতার জন্ম দেয়; বিশ্ব-সভ্যতাকে করে নতুন এক রূপে রূপময় করে, যা চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, জীবন যাপন এমনকি জীবনোপোকরণ—সব দিক দিয়েই আধুনিক।[৩৩৭]

[৩৩৭] দ্রষ্টব্য—S. Khuda Bakhsh. M.A. BCL. Bar-at-Law প্রণীত *Arab civiliztion* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬; *A general History of Europe*, Vol-১, Page-১৭২; Mayers, *Mediaeval and Modern History* Page-৫৪

আধুনিক যুগে মুসলিম-বিশ্ব

মুসলমান জনসংখ্যা বলতে বিশ্বে ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বোঝায়। ২০০৯-এ পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ মুসলমান। এ-গবেষণা অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৭৫৫ কোটি; যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১৫৭ কোটি—অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ মুসলমান।

এ-দিকে, 'আধুনিক বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান' প্রতিবেদনে ড. আহমদ আবদুল কাদের বলেছেন, বর্তমানে ১৭০ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে মুসলিম উম্মাহ গড়ে উঠেছে। এ-সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার ২৩.৪ শতাংশ। অঞ্চলবিচারে এশিয়া-ওশিনিয়ায় ২৪.৪ শতাংশ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর-আফ্রিকায় ৯১.২ শতাংশ, সাব-সাহারা অঞ্চলে ২৯.৬ শতাংশ, ইউরোপে ৬ শতাংশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ০.৬ শতাংশ মুসলিম রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৫২টি মুসলিম-রাষ্ট্র (সংখ্যাগরিষ্ঠ) রয়েছে। এই ৫২টি দেশ ছাড়াও এমন কিছু মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল রয়েছে, যেগুলো এখনো অমুসলিম দেশের অধীনে রয়েছে। তা ছাড়া বেশ কিছু দেশে মুসলিম-জনসংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বর্তমান পৃথিবীতে ৫২টি মুসলিম-দেশ রয়েছে। এর মধ্যে ৪৯টি দেশ স্বাধীন, তিনটি দেশের অবস্থান অস্পষ্ট; তা ছাড়া কয়েকটি অঞ্চল পরাধীন বা অন্য দেশের অধীনে আছে। সে-সব দেশের নাম উল্লেখ করা হলো:

স্বাধীন মুসলিম-রাষ্ট্র

- আফগানিস্তান
- আলবেনিয়া
- আলজেরিয়া
- আজারবাইজান

- বাহরাইন
- বাংলাদেশ
- ব্রুনাই
- বারকিনা ফাসো/আপার ভোল্টা
- চাদ
- কমোরুস
- জিবুতি
- ইজিপ্ত/মিশর
- গাম্বিয়া
- গিনি
- গিনি বিসাও
- ইন্দোনেশিয়া
- ইরান
- ইরাক
- জর্দান
- কাজাকিস্তান
- কুয়েত
- কিরগিজিস্তান
- লেবানন
- লিবিয়া
- মালয়েশিয়া
- মালদ্বীপ
- মালি

- মরক্কো
- নাইজার
- ওমান
- পাকিস্তান
- প্যালেস্টাইন/ফিলিস্তিন
- কাতার
- সৌদি আরব
- সেনেগাল
- সিয়েরালিওন
- সোমালিয়া
- সুদান
- সিরিয়া
- তাজাকিস্তান
- তুর্কিমেনিস্তান
- তিউনিশিয়া
- তুরস্ক
- সংযুক্ত আরব আমিরাত
- উজবেকিস্তান
- ইয়েমেন
- মৌরিতানিয়া
- কসোভো
- নাইজেরিয়া।

কসোভো সার্বিয়ার বাইরে এসে ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সার্বিয়া এখনো কসোভোকে তার অধীন বলে দাবি করে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের ৯৯টি রাষ্ট্র কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

নাইজেরিয়া মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ কি না এ-ব্যাপারে মতান্তর আছে। এখানে খ্রিস্টান ও মুসলিম-জনসংখ্যা প্রায় সমান। সিআইএ ফ্যাক্ট বুকের তথ্য মতে, প্রায় ৫০ শতাংশ মুসলিম, ৪০ শতাংশ খ্রিস্টান। পিউ গবেষণা কেন্দ্রের মতে, নাইজেরিয়ার খ্রিস্টান-জনসংখ্যা মুসলিম-জনসংখ্যার চেয়ে সামান্য বেশি। তবে উত্তর নাইজেরিয়া মুসলিম-অধ্যুষিত আর দক্ষিণ নাইজেরিয়া খ্রিস্টান-অধ্যুষিত। নাইজেরিয়ার ২৪টি প্রদেশের মধ্যে ১২টিতে শরিয়া-আইন চালু রয়েছে।

'অস্পষ্ট' দেশগুলো

তিনটি দেশের আইনগত অবস্থান এখনো বিতর্কিত বা অস্পষ্ট। সেগুলো হচ্ছে:

- মায়োটি: মায়োটি ভৌগোলিক দিক দিয়ে কমোরস দ্বীপপুঞ্জের অংশ; কিন্তু রাজনৈতিকভাবে পৃথক। জাতিসংঘ ও আফ্রিকান ইউনিয়ন মায়োটিকে কমোরসের অংশ বলে বিবেচনা করে। মায়োটির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য গণভোটের উদ্যোগ বহুবারই স্থগিত করা হয়েছে। মায়োটির আইনগত অবস্থান এখনো অনির্ধারিত। তবে এটি এখন পর্যন্ত ফরাসির বৈদেশিক বিভাগের অধীনে আছে।

- উত্তর সাইপ্রাস: উত্তর সাইপ্রাস ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা করে; কিন্তু একমাত্র তুরস্কই তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্যরা এখনো তাকে স্বীকৃতি দেয়নি।

- পশ্চিম সাহারা: ১৯৬৩ সাল থেকে এটি জাতিসংঘের 'আত্মশাসনাধীন অঞ্চল নয়'—এমন তালিকায় আছে। এর বর্তমান অবস্থা বিতর্কিত। পাশের সব কয়টি দেশই এর দাবিদার। জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম সাহারার আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়; কিন্তু নানা অজুহাতে গণভোটটি আজও অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

পরাধীন দেশ/অঞ্চলগুলো

কিছু অঞ্চল/দেশ অমুসলিম-রাষ্ট্রের অধীন বা অধিকৃত। অধিকৃত বা অমুসলিম-দেশের অধীনে যে-সব দেশ আছে, সেগুলো হচ্ছে চিনের অধীন উইঘুর বা জিনজিয়াং; রাশিয়ার অধীন উত্তর ককেশীয় এলাকা—দাগিস্তান, ইঙ্গুশেতিয়া, চেচেনিয়া, তাতারস্তান ইত্যাদি; ভারত-অধিকৃত কাশ্মির; ফিলিপাইনের অধীন মিন্দানাও; থাইল্যান্ডের অধীন পাতানি এবং ইসরাইলের অধিকৃত ফিলিস্তিন ইত্যাদি।

জিনজিয়াং/উইঘুর

চিনের একটি অধিকৃত অঞ্চল। এটি একটি বিরাট মুসলিম-অঞ্চল। এর আয়তন প্রায় সাড়ে ছয় লাখ বর্গমাইল, যা চিনের মোট আয়তনের এক-ষষ্ঠাংশ। জনসংখ্যা ২.১৮ কোটি, মুসলিম-জনসংখ্যা ৫৭ শতাংশ। সেখানে দীর্ঘ দিন ধরে সংগ্রাম চলছে।

উত্তর ককেশীয় অঞ্চল

এ-অঞ্চলটি ঐতিহাসিকভাবে সাধারণভাবে মুসলিম-এলাকা। এ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে চেচেন প্রজাতন্ত্র, দাগিস্তান প্রজাতন্ত্র, ইঙ্গুশিয়া প্রজাতন্ত্র, তাতারিস্তান প্রজাতন্ত্র, কাবারডিনু-বালকারিয়া প্রজাতন্ত্র। অষ্টাদশ শতকে এগুলো ছিলো ককেশীয় আমিরাতের অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ার আশপাশের অঞ্চল কমিউনিস্ট রাশিয়া শক্তি প্রয়োগ করে সোভিয়েতভুক্ত করে। কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর একে একে সে-সব দেশ স্বাধীন হতে শুরু করলে উত্তর ককেশীয় এলাকার রাজ্যগুলোও স্বাধীনতার ডাক দেয় এবং আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। বিশেষ করে চেচেনিয়া, দাগিস্তান, তাতারিস্তান, ইঙ্গুশিয়া ও কাবারডিনু-বালকারিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চেচেন প্রজাতন্ত্রের আয়তন হচ্ছে ১৫ হাজার বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা ১৪ লাখ, মুসলিম ৯৬ শতাংশ। ১৯৯১ সালে চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়; কিন্তু ১৯৯৪ সালে রুশবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নেয়। শুরু হয় দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র যুদ্ধ। বর্তমানে এটি রুশ ফেডারেশনের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র।

দাগিস্তানের আয়তন হচ্ছে ৫০ হাজার বর্গকিলোমিটারের বেশি। লোকসংখ্যা ২৯ লাখের বেশি। এর মধ্যে ৮৩ শতাংশ মুসলিম। ১৯৯৯ সালে দাগিস্তানকে একটি

স্বাধীন ও ইসলামি রাষ্ট্র করার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলন সংঘাতে রূপ নেয় এবং তা ২০১২ সাল পর্যন্ত চলে। এখনো দাগিস্তান অশান্ত।

তাতারিস্তানের আয়তন ৬৮ হাজার বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৯ লাখ। এর মধ্যে মুসলিম ৫৫ শতাংশ। তারা ২০০৮ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘের কাছে স্বীকৃতির জন্য আবেদনও করে; কিন্তু স্বীকৃতি মেলেনি।

ইঙ্গুশেতিয়ার আয়তন ৩ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লাখ। সেখানেও স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন, সংঘাত, সংঘর্ষ চলে দীর্ঘ দিন ধরে। কাবারদিনু-বালকারিয়ার আয়তন ১২.৫ হাজার বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় ৯ লাখ। ৬০ শতাংশ মুসলিম। এখানেও স্বাধীনতার দাবি উঠেছে।

কাশ্মির

ভারতের একটি অধিকৃত অঞ্চল। এখানে ১৯৪৮ সাল থেকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলছে।

মরো/মিন্দানাও

ফিলিপাইনের একটি অধিকৃত অঞ্চল। দীর্ঘ দিন ধরে এখানে মরো জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের (এমএনএলএফ) নেতৃত্বে মুক্তির সংগ্রাম চলছে।

পাতানি

থাইল্যান্ডের অধীন একটি মুসলিম-অঞ্চল। একসময় সেটি ছিলো পাতানি আমিরাতের অন্তর্ভুক্ত। এখানেও স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন ও সংগ্রাম চলছে।

ফিলিস্তিন

এখানে পরাশক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র ও মদদে ফিলিস্তিনের জনগণকে উৎখাত করে বিদেশাগত ইহুদিদের একটি রাষ্ট্র—ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা ফিলিস্তিনের প্রায় সবটুকুই দখল করে নিয়েছে। সামান্য কিছু জায়গা ছাড়া সবটুকুই অবৈধ ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত। ফিলিস্তিনিরা দীর্ঘ দিন ধরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে।

দ্বিতীয় মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলো

প্রায় ২১টি রাষ্ট্রে মুসলিম-জনসংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেগুলো হচ্ছে:

- বসনিয়া হার্জেগোভিনা (৪৫%)
- ইরিত্রিয়া (৩৬.৫-৪৮%)
- আইভরিকোস্ট (৪০%)
- মেসিডোনিয়া (৩৪.৯%)
- তানজানিয়া (৩৫%)
- ইথিওপিয়া (৩৪%)
- বেনিন (২৪.৫%)
- মোজাম্বিক (২২.৮%)
- ক্যামেরুন (২০.৯%)
- টোগো (২০%)
- মন্টিনেগ্রো (১৯.১১)
- ঘানা (১৮%)
- লাইবেরিয়া (১২.৮%)
- মরিশাস (১৭.৮%)
- মালাবি (১২.৮%)
- বুলগেরিয়া (১১-১৩.৭%)
- ভারত (১৪.২%)
- সাইপ্রাস (২৭.৭%)
- ইসরাইল (১৭.২%)
- উগান্ডা (১২%)
- রাশিয়া (৬.৫-১১.৭%)।

এদের মধ্যে বসনিয়া-হারজেগোভিনা, ইরিত্রিয়া, আইভরিকোস্ট, মেসিডোনিয়া, তানজানিয়া ও ইথিওপিয়া এই ছয়টি দেশে বিপুলসংখ্যক মুসলিম (৩০%-৪৮%) রয়েছে। ইউরোপে ৬% মুসলমান হলেও তারা দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠী।

ভারতে মুসলিম-জনসংখ্যা ১৪.২ শতাংশ হলেও সেখানে মোট মুসলমানের সংখ্যা ১৭ কোটি ৭০ লাখ, যা ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পরই তৃতীয় স্থানে। বৃহত্তর চিনের (তিব্বত, হংকং ও ম্যাকাওসহ) মুসলিম-জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি।

মুসলিম-দেশগুলোর মধ্যে ২৩টি দেশ এমন রয়েছে, যাদের জনসংখ্যা এক কোটি থেকে ২০.৫ কোটি। ২০টি দেশের জনসংখ্যা ১১ লাখ থেকে এক কোটি পর্যন্ত। এমন সাতটি দেশ রয়েছে, যাদের মুসলিম-জনসংখ্যা ১০ লাখের কম। ৯৮-১০০ শতাংশ মুসলিম-অধ্যুষিত দেশ ১৮টি। মোট ৩৫টি দেশের মুসলিম-জনসংখ্যা ৯০ শতাংশ বা এর চেয়ে বেশি। পাঁচটি দেশের জনসংখ্যা হচ্ছে ৮৫-৮৯ শতাংশ, তিনটি দেশের জনসংখ্যা হচ্ছে ৭০-৭৯ শতাংশ আর সাতটি দেশের মুসলিম-জনসংখ্যা ৫০-৬২ শতাংশ ভাগের মধ্যে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলিম-জনসংখ্যা ৫-১০ শতাংশ পর্যন্ত।

সারা বিশ্বেই মুসলিম উম্মাহ প্রসারমান। পিউ গবেষণা কেন্দ্রের হিসাব মতে, আগামী পঁয়ত্রিশ বছরে ইউরোপের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ হবে মুসলিম, যা দ্বিতীয় বৃহত্তর ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। যুক্তরাষ্ট্রেও মুসলিমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। আগামী পঁয়ত্রিশ বছরে ভারতের মুসলিম-জনসংখ্যা সব দেশের চেয়ে বেশি হবে, যা প্রায় ৩০ কোটি। আফ্রিকা মহাদেশেও মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই যাবে।

আগামী শতকে অর্থাৎ ২১০০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ হবে মুসলিম এবং ইসলাম হবে সর্বাধিক মানুষের ধর্ম। ইহুদিধর্ম, বৌদ্ধ, হিন্দু ও নাস্তিক্যবাদের বিশ্বাসীদের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও শতকরা হার কমে আসবে।

মাকতাবাতুল আসলাফ কর্তৃক

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	বই	লেখক
১	সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৭৯৫ হি.)
২	সালাফদের দৃষ্টিতে আহলে হাদীস	আবদুল্লাহ আল মাসউদ
৩	তাজওইদ	যাইনাব আল-গাযী
৪	রুকইয়াহ	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
৫	দুঃখের পরে সুখ	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
৬	কুররাতু আইয়ুন : যে জীবন জুড়ায় নয়ন	ডা. শামসুল আরেফীন
৭	শয়তানের চক্রান্ত	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
৮	গুরাবা	আবু বকর আল-আজুররী রহ. (মৃত্যু ৩৬০ হি.)
৯	নবীজীর সংসার ﷺ	শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ
১০	নবীজীর দিনলিপি ﷺ	শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু নাসির আত-তুরাইরি
১১	সালাফের দরবারবিমুখতা	ইমাম আবু বকর মাররূযী রহ. (মৃত্যু: ২৭৫ হি.)
১২	গুনাহ মাফের আমল	ড. সায়্যিদ বিন হুসাইন আফফানী
১৩	ইসলামের ইতিহাস : নববী যুগ থেকে বর্তমান	ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি
১৪	কুররাতু আইয়ুন - ২	ডা. শামসুল আরেফীন
১৫	ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ : নববী যুগ থেকে বর্তমান	সাদিক ফারহান
১৬	যিকিরে-ফিকিরে কুরআন	শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ
১৭	সান্নিধ্যের সৌরভে	ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)

'ইতিহাস' - চার অক্ষরের একটি শব্দ। কিন্তু এর ব্যাপ্তি ও বিশালতা পরিমাপ করা কঠিন। ইতিহাস আমাদের অতীত সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। ইতিহাসের আলোকে আমরা বর্তমানকে বিচার করতে পারি। অতীতের ভুলভ্রান্তি ইতিহাসের মাধ্যমেই সংশোধন করে নেয় মানুষ। সংগ্রহ করে আগামী দিনের চলার পাথেয়।

ইতিহাস যেখানে জাতির পথ-প্রদর্শক, সেখানে ইতিহাস রচনার গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনেক বেশি। এই দায়িত্ববোধ থেকে আরবের বিখ্যাত আলিম শায়খ ইবরাহিম আশ-শারিকি রচনা করেছেন 'আততারিখুল ইসলামি' বা ইসলামের ইতিহাস যাতে সংক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

আরবদেশ, আরবদেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও এর অধিবাসী সম্পর্কিত আলোচনা শেষে মোটাদাগে বিধৃত হয়েছে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্ম হতে ওফাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা। এরপর বিশুদ্ধ তথ্যের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে খিলাফতে রাশিদা, খিলাফতে বনু উমাইয়া, আব্বাসীয় খিলাফত ও উসমানিয় খিলাফতের ইতিহাস। এর পাশাপাশি উঠে এসেছে আন্দালুসে উমাইয়াদের রাজত্ব, আন্দালুসের সোনালি যুগ, ইদরিসি, আল-মুরাবিত ও আল-মুহাদ রাজবংশের ইতিহাস, তুলুনি, আগলাবি, ইখশিদি, ফাতেমি, হামদানি, গযনভি, বুওয়াইহিয়্যাহ, সেলজুক, আইয়ুবি এবং মামলুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস। ক্রুসেড যুদ্ধের কারণসমূহ আলোচনার পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে এর প্রভাব। বিবৃত হয়েছে মঙ্গোল আক্রমণের আদ্যোপান্ত। শেষ দিকে, আলোকপাত করা হয়েছে মুঘল ইসলামি সাম্রাজ্য, নজদে মহাসংস্কার আন্দোলন এবং বিশ্বে ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে।
ইসলামের ইতিহাস শুধু ছাত্রজীবনেই নয়, যেকোনো শিক্ষিত মানুষেরই ইতিহাস আবশ্যপাঠ্য বিষয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস- 'ইসলামের ইতিহাস' গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকের ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক তৃষ্ণা নিবারণে ভূমিকা রাখবে।
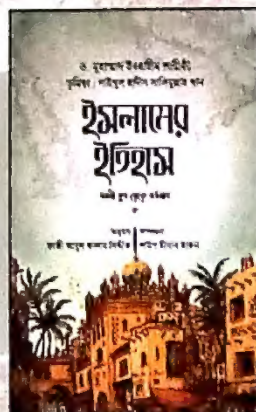
Cover: Abul Fatah : : 01914783567